এই অরণ্য এই নদী এই দেশ

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সাহিত্য সংস্থা ১৪এ টেমার লেন কলিকাতা—৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ টেমার লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৫৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
গণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
সনৎকুমার দত্ত
জুপিটার প্রিন্টিং
৮এ নবীন পাল লেন
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১ বি রাজা লেন
কলিকাতা—৯

এথেনা মজুমদারকে দিলাম

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

রাজনগর

নয়নতারা

শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি

হলং মানসাই উপকথা

কেউ বলে নদ, কারো মতে নদী। কেউ বলে এটা একটা বড় নদীর ফ্যাকড়া যা এক বন্যার ভাঙনে তৈরি হয়েছিল; বর্ষায় বর্ষায় ভূমিক্ষয়ে সেই খাত বেড়ে, অন্য আর এক বড় নদীর ভূমিক্ষয়ের সুযোগে তার সঙ্গে মিশেছে। কেউ বলে আদৌ তা নয়। এটাও পাহাড় থেকে নেমে এসেছে; হয়তো বরফগলা জল নয়, কিন্তু উত্তরের পাহাড়ে যে ঘন বন আর বনের নিচে লাল মাটি, সেই লাল মাটি চুঁইয়ে যে জল তা এক সময়ে ঝর্ণা, পরে দেখবে এই নদী, যে একা একা দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমিতে গুটি গুটি এগিয়ে গিয়েছে। প্রমাণ? দুই পাশের দুই নদী থেকে এটির জল আলাদা রঙের, বর্ষায় সব নদীর জল বাড়ে, এরও বাড়ে; কিন্তু অন্য দুই নদীতে যখন প্লাবন, দেখবে এর জল শান্ত আর নীল। কেউ বলে এর নাম যে হলং তাই প্রমাণ করে এটা বন্যার ভাঙনে তৈরি হয়েছিল। হলাম আমি—এই মাত্র পরিচয়। কেউ বলে, আদৌ নয়। পাহাড়ে গিয়ে দেখো পাহাড়ীরা এটাকে কি বলে। এ নামটা তাদের দেয়া নামের অপভ্রংশ। উত্তরে এরকম বলতে শোনা গিয়েছে, সেই ভোট-পাহাড়ীরাই পরে এসেছে, পাঁচশ' বছরও হবে না। তারও আগে যারা এসেছিল, বাংলাভাষা তৈরি করেছিল প্রাকৃত বলা লোকদের সঙ্গে মিলে মিশে, এ নামটা তাদের দেয়া। ভোটদেশের বনে এর নাম যা শোন তা এখানকার দেয়া নামের বিকৃতি।

আসল কথা কি ভূগোল, কি ইতিহাস নিয়ে বেশ গোলমালই আছে। কেন বারবার উত্তর থেকে যাযাবররা দক্ষিণেই নেমে এসেছে, দক্ষিণে যারা আগে পৌঁছেছিলো তাদের যুদ্ধে কোণঠাসা করেছে, ইতিহাসের গতি লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে, তা বোধহয় বলা যায় না। এমন কি হ'তে পারে, পৃথিবীটাই তার মেরুদণ্ডে অন্য মাপের কোণে হেলে যাওয়ায় তৃণভূমি, অরণ্য তুন্দ্রা আর বরফের মরু হ'য়ে যাচ্ছিল? অথবা কোন ভূকম্পনে পামিরে গোলমাল হওয়াতে, সে অঞ্চলের উত্তরবাহী হিমবাহগুলি ক্রমশ শুকিয়ে গোবি মরু তৈরি করছিল? ফলে সে সব মানুষ দক্ষিণে রওনা হয়েছে, সভ্যতা, সমাজ সব বদলে দিয়েছে?

এই হলংই বা কিসে কম। হ'তে পারে, যেখানে সব চাইতে বেশি চওড়া, সেখানেও সিকি মাইল হয় কি না হয়, হ'তে পারে কোনও জায়গায় এপার থেকে ঢিল ছুঁড়ে মারা যায়, মারতে জানলে তীর পৌঁছে দেয়া যায়; কিন্তু যেহেতু নদী, মানুষ কবে থেকেই তার পাড়ে পাড়ে গ্রাম তৈরি করেছে। তার গতি বদলালে গ্রামের অবস্থান নড়েচড়ে

গিয়েছে, সরে বসেছে গ্রাম। কোন-কোন সময়ে একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছে কোনও ছোট গ্রাম, কালক্রমে সেখানে বন হয়েছে আবার। আর নদীর ধারে যেমন হয়, এ গ্রাম ও গ্রাম যোগ করে পায়ে চলা পথ, যে পথের কোনও কোনও অংশে গরুগাড়ি চলতে পারতো। নদী পার হওয়ার কোন দুশ্চিন্তা হয় নি! সাঁকোর কথা কেউ ভাবতো না। নদী যখন, পার হতে হয় কেন? আর তেমন যদি দরকারই, হেঁটে পার হও, সাঁতরে পার হও, দেখো, উজিয়ে বা ভাটিয়ে কোন গ্রামে সখ করে খেয়া রাখে কিনা।

এখন অবশ্য নদীর ধারে নতুন করে বন হতে পায় না। তেমন খালি জায়গা কোথায় আর, যে গ্রাম সরে বসবে? তাছাড়া, বলা হয়, গ্রামের হাবভাবও বদলেছে! এখন গ্রামের মানুষগুলি আর নদীর সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরা করতে চায় না, বনকে বেশি জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা অল্প জায়গা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। এখন এসব গ্রামে দক্ষিণের সেসব লোকও অনেক, যারা নিজেদের বাঙালী ছাড়া আর কিছু বলতে চায় না। যারা হলং নাম দিয়েছিল, কিংবা বড নদীটার নাম রেখেছিল মানসাই, তারাই যেন সংখ্যায় কম। কিংবা নিজেদের নানা নামে পরিচয় দিয়ে ভাগ করে' ফেলে নিজেদের সংখ্যাটা বুঝতে পারে না। হয়তো একই জনগোষ্ঠী, কিন্তু কখনও কোচ, কখনও রাভা, কখনও রাজবংশী বলে নিজেদের। অথবা তারা একত্র হয়েছিলো এমন ভিন্ন ভিন্ন উত্তরের জনগোষ্ঠী হ'তে পারে।

সে যাই হোক, সেই বাঙালীদের সঙ্গে এদের বোধহয় এই মৌল পার্থক্য, যে এরা নদী ধ'রে চলতো, আর সেই বাঙালীরা চলে সড়ক ধ'রে। আর সে কি সড়ক!

কেউ কেউ বলে, অন্তত আগে বলতো, আগুন আর গরম এনেছে বাঙালীরা। আগুন আগেও ছিল, শীতে হাত-পা তাপাতে, খাদ্যকে সুস্বাদ করতে, কখনও বনকে দখলে নিতে। আর এরা যেন আগুনের প্রবাহেই বাস করে, মাছ যেমন জলে। মাটি পুড়িয়ে ইট, এমন সে পোড়ানি যে মাটির হয় আগুনে রং। সেই ইট হলেই হল? পাথর পুড়িয়ে চুন, পাথর পুড়িয়ে সিরমেট। তাই দিয়ে সড়ক, বাড়ি-ঘর। শুধু কি তাই? সেই ইটের সড়কের উপরে ধোঁযা ওঠা আগুনে গরম সেই এক, যাকে কালো আগুনও বলতে পারো।

আশ্চর্য কি, যদি এত গরম বেড়ে থাকে? পথের মোলায়েম ঠাণ্ডা কখনও ছোঁয়া যায় না পায়ে, বনের ঠাণ্ডা ভাব কখনও গায়ে লাগে না। এটা অবশ্য বাড়িয়ে বলা মনে হ'তে পারে। আর তাছাড়া, পিচের সড়ককেই যদি ততো গরম বলা হ'য়ে যায়, সেই পথে ছোটা ফুটন্ত পেট্রলের বাসের আর আকাশের গায়ে বসানো ইলেকট্রিক তারের উত্তাপ

বোঝাতে কোন শব্দই অবশিষ্ট থাকবে না। এদিকেও দেখা যেতে পারে, সভ্যতা আর আগুন কি প্রায় সমার্থক নয়? সুতরাং বাঙালীদের আগুন কি কোচ, কি রাজবংশীতেও ঢুকে পড়ছে।

উপায়ই বা কি? এখন গ্রামগুলো নদী বরাবর বসে না, বসে সড়ক বরাবর আর যদিবা নদীর কাছে আসে সে সড়ক, তবে তো কথাই নেই, যে গ্রামের মাঝ দিয়ে সে সড়ক সে গ্রাম তো ফুলে ফেঁপে শহর। আর, তাছাড়া, আগে গ্রাম ছাড়তে হ'লে, ঝগড়ার জন্য তা দরকারও হতো, বন ছিল স'রে স'রে দূরে দূরে যেতে, এখন বন কোথায়? সুতরাং গ্রামে দাঁড়িয়েই ঝগড়ার সিদ্ধান্ত করতে হয়।

হলং-এর কথা বলছিলাম। হলং, সে যে নদ তা প্রমাণ করতেই যেন, মাঝে মাঝেই মানসাইকে ছোঁবার জন্য, তাতে মিশে যাওয়ার জন্য, ডুবে যাওয়ার জন্য দিক বদলায়। তার প্রমাণ পাওয়া কঠিন নয়। তার পুরনো খাত এখানে ওখানে পদ্ম শাপলা নিয়ে ঝিলবিল হয়ে আছে। তার অপ্রচলিত খাতে, সড়ক-ওয়ালাদের তৈরি পরিত্যক্ত সাঁকো ব্রিজের মোটামোটা খুঁটি পোঁতা দেখতে পাওয়া যাবে। হলং যেখানে বরং মানসাই-এর খুব কাছাকাছি, সেখানে একটা গ্রামের নাম উখুণ্ডি।

দেখতে দেখতে সে গ্রাম শহর হ'য়ে ওঠার ঝোঁক নিয়ে বসল। কারণ একটাই, সড়কটা দিক বদলে হলং-এর দিকেই বেশ খানিকটা সরে এসেছিল, যেহেতু মানসাই চড়া ফেলে দু-তিন মাইল সরে গিয়েছে, সড়ক থেকে খেয়াঘাটে যেতে ততটা চর ভাঙতে হয়। হলং আর সড়কের মধ্যে যে গ্রাম তা সড়কের অন্য পাড়েও ছড়ালো। সড়ক বরাবর লম্বায় তিনপোয়া মাইল, হলং আর সড়কের মধ্যে আধ মাইল, আর সড়ক ডিঙিয়ে চারশ' গজ এক শহরই যেন হ'য়ে উঠবে। সড়ক বরাবর দু'পাশেই দোকান, সাইকেল সারাই, রিক্সা মেরামৎ, মনোহারি, আর বিশ-ত্রিশ হাত পর পর চা-এর দোকান। দেখতে দেখতে গ্রামের চাষের জমিতে করাতকল, ধানকল, গম ভাঙানোর কলের চাকি বসে গেল; ছোট ছোট বয়লার তাদের। আর পরের পরে ইলেকশন হতে থাকলে, একটা স্কুল পঞ্চায়েত অফিস, পুলিসের পাকাপোক্ত তাম্বু, একটা হেল্‌থ সেন্টার। উখুণ্ডির এই এক সুবিধা হয়েছিল, ১৫ বছরে অন্যত্র তিন বার ইলেকশন হলে বাই-ইলেকশন ধরে, এ অঞ্চলে তা চার বার। এরকম বলা হয়, ধানকলের পাশ দিয়ে হাট থেকে বেরোনোর গলিটার শেষ মাথায় তিন ঘরের এক বেশ্যা-পল্লীও হয়েছে।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বেশ পুরনো শহরের চেহারা নিচ্ছে উখুণ্ডি। স্কুলের ঘরগুলোর মধ্যে যেটা পাকা আর চুনকাম করা ছিল, তার গায়ে এখন বেশ শ্যাওলা। হেল্‌থ সেন্টারের ডিসপেনসারি, ডাক্তার, নার্সের, বা কম্পাউণ্ডারের কোয়ার্টারের বেঁটে

বৈঁটে গড়নের বাড়িগুলোর গেরুয়া রং প্রায় কালচে। পনেরো বছরে উখুণ্ডি যদি বেড়ে থাকে, গত দু-তিন বছর থমকে আছে, যদিও বরং উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। কারণ ইলেকট্রিক এসেছে, প্রথমেই হেল্‌থ সেণ্টার আর স্কুলে তা দেওয়াই হয়েছে।

থমকে যাওয়ার কারণ, বোধহয়, আবার সেই হলংই। উখুণ্ডির মধ্যে সেই সড়কের মোচড় খাওয়ার উপায় ছিল না। দুপাশের দোকান আর বাড়িগুলো তো তাকে চেপে ধরে রেখেছে, কিন্তু পশ্চিম সে সড়ক গত পনেরো বছরে বার তিনেক মোচড় খেয়েছে। কখনও হলং তার কাঠের সাঁকোর পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, কখনও মানসাই চর ডুবিয়ে সরে এসে সড়ককে বিপন্ন করেছে। সড়ক সরলে দেখা যায় এক মাইল আধ মাইল বাঁধানো সডক পড়ে থাকল, আর নতুন সড়ক আর পুরনো সড়কের মধ্যে বন-জঙ্গল তৈরি হচ্ছে। পি ডব্লু ডির খাস করা জমি, নদীর পুরনো খাত, কাজেই সেখানে চাষী নেই, বসতি নেই। নতুন সড়কের কোল থেকে শুরু করে মানসাই-এর খাত পর্যন্ত পুরনো সড়কগুলোর উঁচু-নিচু জমি ঢেকে, মানসাই-এর পুরনো খাত ঢেকে একটা ছোট-খাট বনই তো। এখন শোনা যাচ্ছে, সব ব্যবস্থা আমূল বদলাবে। পাকাপোক্ত করা যাকে বলে। বারবার মানসাই আর হলং-এর এসব বিরক্তিকর কাণ্ডকারখানা সহ্য করা ভাল নয়। মানসাই-এর উপরে ব্রিজ হবে। সড়কটা অনেক দূর থেকে অনেক উঁচু হ'য়ে, অনেকটা বাঁক নিয়ে ব্রিজ ছুঁয়ে, উখুণ্ডির মাইল দু-এক দূর দিয়ে চলে যাবে। এরকম ধরনের, এত চওড়া, এত উঁচু সড়ক এ অঞ্চলে কেন অনেক অঞ্চলেই নেই।

পাঁচ বছর ধরে কাজ হচ্ছে। খুব সহজ নয়, প্রতিবছর যে খাত বদলায়, সেই মানসাইকে ব্রিজে বেঁধে ফেলা। উপরন্তু, আপাত উদাসীন হলং কখন কোনদিকে ঝুঁকবে বলা যায় না। সড়ক তৈরি হচ্ছে, মাটি ফেলে আকাশ সমান উঁচু করা হচ্ছে, কখনও ব্রিজের পিলার বসছে, কখনও সব কাজ এক সঙ্গে চলেছে। উখুণ্ডির জীবনের ভারসাম্য ইতিমধ্যে নষ্ট হ'তে বসেছে। অনেক চায়ের দোকানদার, মনোহারি দোকানদার, সাইকেল মেরামত করনেওয়ালারা নতুন সড়ক আর ব্রিজের সাইটের কাছাকাছি উঠে গিয়েছে। সেখানে যে মানুষজনের ভিড় তার সংখ্যা উখুণ্ডির জনসংখ্যার পাঁচ ছয় গুণ তো হবেই। হুড়হুড় ক'রে একটা শহরই গড়ে উঠছে, অনেকের কাছে যেমন চন্দানির কাছেও অবাক করা ব্যাপার, যেখানে সব মানুষ যেন একই টানে কাজ করতে ছুটে চলেছে, অথচ কেউ কাউকে চেনে না। এখানে এই আজব ধরনের শহর আর তার থেকে মাইল দুয়েক পিছিয়ে সেই পরিত্যক্ত সড়কগুলোকে ঘিরে সেই বন। এটাও ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, হারিয়ে যাওয়ার পক্ষে দুটোই কাজে লাগতে পারে যদি কারো হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, এই বন আর এই শহর।

কি বলা হবে, এই বন অথবা এই শহরকে? নাম দেয়া হবে কি? নাম দেয়া সুবিধারই বটে। যেখানে নতুন সড়ক উঁচু হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে, তা থেকে মাইল দেড়-দুই পিছিয়ে গেলে, পুরনো সড়কগুলোর এপারে ওপারে, মানসাই এর চড়াপড়া কাশের জঙ্গলে ঢাকা পুরনো খাত ধরে যে বন—এতখানি না বলে তাকে 'হলং বন' ব'লে উল্লেখ করা সহজ। অথবা যেখানে ব্রিজের কাজ হচ্ছে, যার এদিক ওদিক এক দুই বর্গমাইল জুড়ে বাঁশ, খড়, কাঠ, টিন, ত্রিপাল দিয়ে যে মানুষ গিজগিজ করা শহর গড়ে উঠছে, এতখানি না ব'লে তার নাম এক কথায় মানসাইঘাট বলা ভাল হয়। হিন্দুস্থান বলাটাও, অযুক্তির নয়। ওখানে যাদের সংখ্যা বেশি, তারা সাধারণভাবে হিন্দী বলতে অভ্যস্ত, তা মজুর হোক, মিস্ত্রি হোক, কিংবা ট্রাক ড্রাইভার, বা ক্রেন ড্রাইভার।

এখন, সব বিষয়েই সকলে একমত হবে এমন কথা নেই। হলং বন সম্বন্ধেও এরকম বলা হয়, বনটাই আদিম। মানসাই যাতে ভূমিক্ষয়ের সাহায্যে উত্তরে সরতে না পারে সেজন্যই বনটাকে রাখা হয়েছিল। বনের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা ছিল। পরে বাসট্রাকের সড়ক করতে গিয়েই বন কাটা হচ্ছিল বারে বারে সড়ক সরতেই বন আবার তার পুরনো জমি দখল করছিল। এ সেই হলং বনই, যেখানে বাঘ, গণ্ডার, হরিণ থাকতো। লাল বাঁদর থাকতো বুনো ফল খেতে, বুনো ফলের বাগান ছড়াতে। হ্যাঁ বাঘও। গরু-গাড়ির গাড়োয়ানরা, এক সময়, সেই কাঁচা পথের উপরে বাঘকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। এমনকি ১৯৬০-এও এক বাসযাত্রী, পিচের কালো পথের উপরে, হেডলাইটের আলোয়, পুরো একটা ডোরাদার পুরুষ বাঘকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

যেমন উখুণ্ডি সম্বন্ধে অন্যমত। যেমন চন্দানি বিশ্বাস করে, উখুণ্ডির বেড়ে ওঠার কারণ গ্রাম ঘেঁষে পাকা সড়ক চলে যাওয়া নয়' বরং উখুণ্ডির সব বাড়বাড়ন্তর মূলে সেই হলুদ রঙের বাড়িগুলো যাকে 'আসপাতাল' 'হেলতসিণ্টার' এসব বলা হয়। সে জন্যই এগ্রাম সে-গ্রাম থেকে মানুষজন উখুণ্ডিতে আসতে শুরু করে। চারিদিকেই তো রোগ আর রোগ। কে না-চায় রোগমুক্তি। আর গ্রামের যে পতন শুরু হল তাও সেই হেলথ সেণ্টারের পতন থেকেই। সড়ক কি করতে পারে? সড়কের জন্য যদি গ্রাম লম্বা-চওড়া হয়েছিল, নতুন সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে গ্রামটাতো আরও চওড়া হতে পারতো।

* * *

সেই হেল্থ সেণ্টারের বাড়িগুলো এখন আর হলুদ নয়। শ্যাওলা পড়ে পড়ে কালচে। ভিতরে গেলে আরও দেখা যায় মেঝেতে এখানে ওখানে ফাটল। ছাদ দিয়ে বর্ষার জল পড়ে, দেয়ালগুলো প্রথমে সবুজ, পরে নীল, এখন কালো। যে ঘরে ওষুধ থাকতো,

কম্পাউণ্ডারের ঘর, সেখানে টেবিলটার একটা পায়া অনেক আগে থাকতে ভাঙা বলে বাঁশের চটা আর দড়ি দিয়ে বাঁধা। বার্ণিশ কবে উঠে গিয়েছে কেউ জানে না। দেয়াল ঘেঁষে বড় র‍্যাকটায় কয়েকটা বড় বড় বোতল ও কৌটো। আলমারিটার কাঁচের পাল্লার অন্তত তিনটে কাঁচ ভাঙা, মনে হয় তাতে কিছু ওষুধ থাকবে। আসলে তা নয়। বছরে একবার কিছু ওষুধ আসে, যা দু তিন মাস পরে থাকে না। তারপরে ওষুধ থাকা না-থাকা ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের ভাগ্য আর হাতযশ। সদরে গিয়ে দরবার করে হেলথ অফিস থেকে আনতে হয়। অপারেশনের ঘর ছিল। এখনও আছে। টেবিলের এনামেল চটে গিয়ে লোহা বেরিয়ে পড়েছে এখানে ওখানে। একটা বড় ঘরে চারটে বেড ছিল। লোহার খাটগুলো নড়বড়ে হলেও আছে এখনও। গদি-তোষক, চাদর, কম্বল আছে কিংবা নয় বলা শক্ত। সেগুলোকে রাখবার জায়গা নেই বলে কিছু কম্পাউণ্ডার, কিছু নার্সের কোয়ার্টারে রাখা হত। তা সত্ত্বেও রোগী আসে। দূর দূর থেকে মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে আসে ডাক্তারের ছোঁয়া পাবে বলে। আর বেশি আসে যেন বিপন্ন প্রসূতিরা। ওই যখন অপারেশন টেবিলের অবস্থা কি হয় সেখানে? আর এখন তো ডাক্তারও নেই। অন্য রোগীর বেলা কম্পাউণ্ডার ওষুধ দেওয়ার ভান করে। প্রসূতিদের বেলায় নার্সই ভরসা। আর ছুটিছাটার দিন হলে নার্সের মেয়েও তাকে সাহায্য করে। যেটুকু বা ছিল' 'হেলথসেণ্টার', ডাক্তার চলে যাওয়ার পর তাকে আর সেরকম কিছু বলা যায় না। দোষ নাকি ডাক্তারের। তারা শহরের লোক এসব গ্রামে থাকতে চায়না। এসব গ্রামে পড়ে থাকার চাইতে সরকারি চাকরির মোহ ছাড়াই ভাল।

অন্যমতও আছে, যেমন সেই বেঁটে খাটো আধামন্ত্রী তার ছোট ছোট আঙুলগুলোকে নেড়ে, কখনও বা টকাস ক'রে তুড়ি দিয়ে, কখনও গোড়ালিতে কখনও আঙুলের ডগায় দাঁড়িয়ে বলেছিলো ইলেকশন করতে এসে। গোড়া থেকেই গোলমাল। এই হেলথ সেন্টার হওয়া উচিত ছিলো আরও উত্তরে, না হয় আরও দক্ষিণে। সেই দশশাল আগে ভোটের মুখে সেই জোতদার পার্টির এম. এল. এ জোরজার করে এই গ্রামে ভিত্তির পাথর পুঁতে যায়। তার এরিয়ার মধ্যে রেফুজি প্রধান এই গ্রাম নাকি তেড়া ছিলো। তেড়াতো হবেই। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ বাঙালি, আর তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিলো এবং আছেও যে তাদের দুঃখ কষ্টের মূলে সেই জোতদার দলেরই রাজনীতি যারা দেশটাকে ভাগ করেছিলো। তখন তখন সেই এম. এল. এর লাভ হয়েছিলো ভোটে, সেবার তো বটেই, তার পরেও দুবার। কিন্তু তারপর? আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন ব্যাপারটা কি। ওই জোতদার পার্টি জানতো তারা থাকবে না,

তাদের পরে আমরাই আসব। সে জন্য যাতে আমাদের অসুবিধা তাই ক'রে গেছে। সে জন্যই এখানে আর এমন সব ভিন্নগ্রামে তারা হেলথ সেণ্টার ক'রে গেছে। বর্ষায় যেখানে পথ চলা যায় না, যেখানে কোনদিনেই ডাক্তার পাঠানো যাবে না সেই সব গ্রামে হসপিট্যাল তৈরি ক'রে আমাদের জব্দ করার ব্যবস্থা করেছিলো। এখন তারাই বলে বেড়াচ্ছে হেলথ সেণ্টারে ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই। তার উপরে নেপটিজমও আছে তার। এই নার্স নাকি এ দেশের। চেহারাতেই প্রমাণ। এখন বয়সে গায়ের রং পুড়ে গেলেও, তার মেয়েকে দেখলে বুঝবে এক সময়ে কি রকম ছিলো। বেশ হলুদে রং যেমন নাকি বর্মন, কার্যি:দের কারো কারো ঘরে হয়। মানে রাজবংশী। এতেই বোঝেন চাকরিটা কেন হয়। তাই বা কেন? ইতিহাসটাইতো জানা আছে। সদরের হাসপাতালে আয়ার কাজ করতো। যোগ্যতা না থাকলেও তাকে দিয়ে নার্সের কাজ করাতো, টেম্পারারি রাখতে রাখতে ছমাসের কি একটা পাস করিয়ে এনে তাকে পাকা করেছিলো। ওদিকে আবার সেই এম. এল. এর স্বজাতীয়ও ন'কি। আর করাপশানও। কম্পাউণ্ডারের এই গ্রামেই এক ওষুধের দোকান আছে, আপনারা সকলেই জানেন। দরকার হ'লে সেখান থে:ক ওষুধ আনে রোগীরা। হ'তে পারে, কম্পাউণ্ডার শহর থেকেই ওষুধ কিনে আনে সে জন্যই সরকারি বিনা পয়সার ওষুধ আনতে গা নেই। না হ'লে, বেতন ঠিক মতো না পেলেও কম্পাউণ্ডার চাকরি কামড়ে পড়ে থাকে। আধামন্ত্রীর বক্তৃতা চটাপট চটাপট হাততালির মধ্যে শেষ হয়েছিলো।

এ বিষয়ে অন্যমত যে শেষ ডাক্তারের হঠাৎ ছুটির নাম ক'রে চ'লে যাওয়া, আর তারপর তার না ফেরা অন্য কোন বদলি ডাক্তার না আসা, তা কিন্তু শেষ কথা নয়। ডাক্তারের যাওয়া তো ঠিকই। কিন্তু সবের মূলেই একটিই ঘটনা, গজেন ঢালির যেভাবে সরকারের শক্তির প্রতীক হ'যে গ্রামে ফিরে আসা, যেমন চন্দানি নিজে বিশ্বাস করে।

* * *

কালো রং, লোহার জালিতে আটকানো জানলা দরজা, সেই নতুন ধরনের বাস, যা তার আগে উখুণ্ডির কেউ চোখে দেখেনি, সেটা বড় সড়ক দিয়ে বেশ জোরে, তেজের সঙ্গেই বলা যায়, উখুণ্ডির প্রান্তে এসে থামলে সংবাদটা উৎকণ্ঠার মত ছড়াতে লাগল। গাড়ি বোঝাই পুলিস, এমনকি ড্রাইভারটিরও তেমন পোশাক। পুলিস এখানে আগেও এসেছে সে তো একজন দুজন মাত্র। আর তারা এলে, ভোটের সময়ে ছাড়া, কাউকে না কাউকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর সেই গাড়িটা উখুণ্ডির নিজস্ব গলিপথগুলো ধরে এঁকে বেঁকে, পাশের ঝোপ-ঝাড়, খানাখন্দ, চায়ের দোকানের ঝাঁপ এসব এড়িয়ে চলতে লাগল। কোথায় যায় সেই গাড়ি, তাও আবার এই সকালের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সময়ে।

অবশেষে গাড়িটা বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকে একটা পড়ো বাড়ির সামনে দাঁড়াল। খড়ের ছাদ পুরনো হয়ে এখানে ওখানে খসে পড়েছে, বাঁশের ধারার দেওয়াল ভেঙে পড়ার দাখিল। গাড়িটা তো বেশ ধীরে ধীরেই এগোচ্ছিল, কাজেই গাড়ির কিছু দূরে থেকে, বেশ কয়েকজন ছেলে ছোকরা, দু একজন মাঝবয়সী, এমনকি এক বুড়োও গাড়িটার পিছন পিছন আসছিল। এখন, অবশ্য, সে বাড়িটা সে রকম নেই। সেই কালো গাড়ির আসার পাঁচ বছরে তা বেশ এক রঙীন কোঠাবাড়ি, যার সামনের ছোট মাঠটায় দুখানা ট্রাক প্রায় সব সময়েই থাকে। তা, গাড়িটা সেদিন সেখানেই ব্রেক কষে থেমে দাঁড়ালো। প্রথমে যে নামল তার কোমরে যা তা নিশ্চয় পিস্তল। তার ঝকঝকে খাঁকি পোশাকের কাঁধে পিতলের তারা তারা ফুল ফুল। সে নামল ড্রাইভারের পাশ থেকে। তারপর সেই কালো বাসের পিছনের দরজাটা খুলল, একে দুয়ে ছজন সিপাহী নামল যাদের প্রত্যেকের হাতে সঙ্গীন পরানো বন্দুক। আর তাদের মধ্যে··· গ্রামের লোকরা কি ভূত দেখছে? চিনতে কেন অসুবিধা হবে? চার-পাঁচ বছরে কি পরিচিত মুখ কেউ ভোলে? চার-পাঁচ বছরে স্বাস্থ্যটা ভালোই হয়েছে, বাইশ থেকে সাতাশে তা হয়। আগে মুখে বাসি দাড়ি থাকত, পরনের সাদা পায়জামা আর হলুদে টি-সার্টে অতি ব্যবহারের বিবর্ণতা থাকত। এখন পরিষ্কার দাড়ি কামানো, পরনে কালো প্যাণ্টের উপরে টকটকে লাল সার্ট। আর সে লাল এমন উজ্জ্বল যে সগু জমতে শুরু করেছে এমন রক্ত বলে মনে হয়। ভূত কি করে হবে? পুলিস দিনে-দুপুরে ভূত নিয়ে বেড়ায় না। ফাঁসি হয়নি তাহলে? কিন্তু একথা কি মনে মনে ছাড়া বলা যায়? তবে! অন্তত সারা জীবনের ফাটক হয়েছিল তা তো ঠিকই? রাগের মাথায়, বচসা করতে করতে, শ্লোগান দিতে দিতে রক্ত গরম হয়ে গেলে কেউ যদি কাউকে কুকরী দিয়ে একবার নয়, একবার, দুবার, তিনবার কোপ মারে, তাহলে সাইকো-লজিস্ট জজ কাউকে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন করে দিতে পারে বোধহয়। যেমন ডাক্তারবাবু বলেছিল সব শুনে। আর গোপনেও বলেনি। এরকমভাবেই কথা বলত হেল্থ সেণ্টারের সেই ডাক্তারবাবু, যার পরে আর কোন ডাক্তার আসে নি। সে চন্দানির সামনে, লেদু মিঞার সামনে এসব বলেছিল। লেদু মিঞা জিজ্ঞাসা করেছিল, কি লজিস্ট জজ্ বললেন?

অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। একদিন নয় অন্তত দু-এক মাস অবাক হওয়ার গল্পটা এ ওকে ব'লে চলেছিল। তবে একটু সতর্কভাবে, লোক বুঝে, আগুভাব কতখানি তা বুঝে। সেই কালো প্যাণ্ট, লাল সার্ট, কালো চকচকে জুতো পরা, (স্যাণ্ডেল ছাড়া জুতো আবার কবে পরতে দেখেছে?) সে বাসের পাশ দিয়ে হেঁটে সেই পুলিস-

দারোগার কাছাকাছি যেতেই, দারোগা নিজেই খটাস্ করে জুতোয় শব্দ করে স্যালুট করল, ঠিক তেমনই যেমন তারা করে, ডান হাত কনুই-এর কাছে ভাঁজ ক'রে হাতের আঙুলগুলো টুপির নিচে কপালের দিকে এনে। বলেছিল, এটাই আপনার বাড়ি, সার? গ্রামের লোকেরা স্পষ্ট সার বলতে শুনেছিল দারোগাকে, আর তা বলেছিল সেই গজেন ঢালিকে। এ সবই স্পষ্টাস্পষ্টি ব্যাপার। হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া কিছু নয়। গজেনের বাড়ির সামনে সেই কালো গাড়ি থেকে তাঁবু সোলদারি নেমেছিল। সিপাহীরা তাঁবু খাটিয়েছিল। দারোগাকে নিয়ে গাড়ি ফিরে গেলেও একজন হাওলদার আর পাঁচজন সিপাহী সেই তাঁবুতে চার-পাঁচ মাস ছিল।

আর তার পরপরই হেল্‌থ সেণ্টারের সেই ডাক্তারবাবু, যার পরে আর কোন ডাক্তার আসেনি, সে চলে গিয়েছিল। আর তারপরই হেল্‌থ সেণ্টার হু হু করে পড়ে যাচ্ছে। এখন সদর থেকে ওষুধও আসে না। ডাক্তার নেই তো ওষুধ। হেল্‌থ সেণ্টার যদি হয় তবে অন্য গ্রামে, আর এটাকে ভেঙে ফেলার পরে। কম্পাউণ্ডারই চিকিৎসা করে, তখন, তার দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে। কয়েক মাস বেতনও বন্ধ ছিল। তারপর আবার সদরে গিয়ে বেতন এনে দিয়েছে কম্পাউণ্ডারের, নার্সের, গজেনই।

*　　　*　　　*　　　*

চন্দানি ফাতনার দিকে চেয়েছিল। ফাতনার উপরে যেখানে হলদেটে রোদ খানিকটা, সেখা.ন একটা ফড়িং ঘুরছে, বসতে চাইছে। চারিদিকে ছায়া ছায়া অন্ধকার, তার মধ্যে ওই আলোটুকু। সেখানে লাল সুতো জড়ানো সাদা ফাতনাটা দেখে কি আর একটা ফড়িং মনে করছে? আশ্চর্য! পৃথিবীর সবকিছু কি ওই ব্যাপার? তুমি অংশু বলতে পারো না, ফড়িংটা পুরুষ কিনা।

আঁউম আঁউম আঁ আঁ আঁ। চন্দানি ডুবন্ত ফাতনা দেখেও ছিপ টানতে ভুলে গেল। ছটফট করে উঠে পিঠের সঙ্গে বাঁধা তার ছয় মাসের সন্তানটিকে দেখে নিল হাত বুলিয়ে। আট দশ হাত দূরে তার দু বছরের সন্তানটি একটা ঝোপের সামনে ঘুমচ্ছে দেখে নিল। বাঁ হাতের দিকে হাত কুড়ি দূরে হলংনাগা। সে চন্দানির দিকে চেয়েছিল। তারা কেউ নড়ল না। বাঘ তো বটেই। এই প্রথম বিকেলেই। তবে বোধহয় নালাটার ওপারে হবে। হলং তার মুখে হাত চাপা দিলে চন্দানিও তা করল। কিছুমাত্র নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে বসে রইল তারা। চন্দানির পরনের খাটো বাদামি শাড়ি তার গায়ের গম-হলুদ রঙ থেকে কিছু বেশি লালচে। জলের উপরে আলোটা একটা মাছরাঙার ধাক্কায় কাঁপতে শুরু করায় তার গায়ে চাকা চাকা দাগ ঝিলমিল করছে।

উলঙ্গ হলং পুরনো ভূমিক্ষয়ের খাদে বসেছে, তার চারিদিকের লালচে মাটির রঙের সঙ্গে তার রঙ-এ অল্পই তফাৎ। আর কেউ ডাকল না। কিংবা দ্বিতীয়বার এত দূরে গিয়ে ডেকেছে যে সে ডাক এখানে এল না। তিনচার মিনিট এভাবে চারদিকের বনের সঙ্গে মিশে থেকে চন্দানি শব্দ না করে তার ছিপটাকে টানল। ফাতনা ডুবছে দেখেও সময় মত তা না টানায় হয় তো টোপে যে ঠোকরাচ্ছিল সে বঁড়শিটাকে জঙ্গলে ঠুসে দিয়েছে। নতুন টোপ পরাতে হয়। বঁড়শিটা ভার হলেও উঠে এল। তার সঙ্গে ইঞ্চি বারো লম্বা পেটমোটা একটা মাগুর। মাগুরটাকে খুলে, জলে ডুবিয়ে রাখা মুখবন্ধ চাঁচারির বড় খালুইটার মধ্যে রেখে, বঁড়শিতে নতুন টোপ পরিয়ে, আবার জলে ফেলল সে। জলের উপরে আলোটা আর বৃত্তাকারে কাঁপছে না বলে, তার গায়ের চাকাচাকা দাগগুলোও মিলিয়ে গেল।

সেই কালো গাড়িটা উখুণ্ডিতে ঢুকবার পর পরই ডাক্তার ছুটিতে গিয়েছিল, তারপরে আর ফেরেনি। অথচ তখনও দিনে আট-দশটা করে রোগী তো চিকিৎসার জন্য আসতোই। দু'তিনজন রোগী তো তখনও সেই লোহার খাটগুলোতে থাকছে। যেমন, ডাক্তার যেদিন চলে গেল, তার আগের দিন, এখন যাকে হলং নাগা বলছ সে এসেছিল ডাংদরকে খবর দিতে। তখনও মাথার চুলগুলো এমন জটজট। পরনে ময়লা গেরুয়া, আর গলায় কালো কালো একরকম গুটি আর রুদ্রাক্ষ মিলিয়ে মালা। চন্দানির বেশ মনে আছে, তখন স্কুলে যাওয়ার বাস ধরতে তার সড়কের ধারে গিয়ে দাঁড়ানোর সময়, দাঁড়িয়ে শুনবার সময় নয়। সেই ফরসা চেহারার অল্পবয়সী দাড়ি গোফ নেই ছাইমাখা সন্ন্যাসীটা, (সন্ন্যাসী বইএর ছবির বাইরে সেই প্রথম দেখেছিল) কি বলছে তা শোনার আগ্রহ থাকলেও। পরে সন্ধ্যায় ফিরে সে ডাক্তারের কাছেই শুনেছিল, সন্ন্যাসীটা খুব বিপদে পড়ে এসেছিল। সত্যিকারের সন্ন্যাসী হোক না হোক, একরকমের ব্যবসাদারই হয়ত, যারা ষাঁড়ের সাহায্যে মানুষের ভাগ্য বলে দেয়। দুটো বড় বড় ষাঁড় নিয়ে ওরা চারজন সেই কামরূপ, না কোথা, থেকে হাঁটতে শুরু করেছে। এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে (শহরেই লোকে ভাগ্য গোণাতে বেশি টাকা পয়সা দেয়), এরা হেঁটে হেঁটে যায়, এক গ্রাম পার হয়ে অন্য গ্রামে। তারা নয় রেলগাড়ি বা বাসে উঠল, কিন্তু ষাঁড দুটো? ডাক্তারবাবু এই ভাবেই বলতেন, কিছু বলার ইচ্ছা থাকলে। তো ডাক্তারবাবু বুঝেছিলেন, দু'তিনটে গ্রাম আগে পথের ধারে হলংনাগার সেই দলের যে কর্তা, তার আর তার এক সাগরেদের কলেরা হয়েছে। ডাক্তারবাবু পৌঁছানোর আগেই দলের বুড়োটা মরেছে। সাগরেদের প্রাণ আছে বটে, বাঁচাতে হলে হসপিট্যালে নেয়া দরকার। অবশেষে এই হলংকেই একটা ষাঁড়ের পিঠে বসিয়ে রোগীকে আনতে বলে, ডাক্তারবাবু

ফিরে এসেছিলেন। অন্য সন্ন্যাসী ও অন্য ষাঁড়টার কি হল হলংনাগা আজও তা জানে না। অমন এক টা পোষা, খেলা দেখানোর ষাঁড়ের দাম আছে, তা নিয়ে সেই অন্য সন্ন্যাসী ভেগে থাকবে। হলং ষাঁড়ের পিঠে বাঁধা এক সন্ন্যাসীকে নিয়ে দুপুরেই 'হেল্থ সেণ্টারে' পৌঁছেছিল বটে। কিন্তু তাকে নামানোর পরে ডাক্তার আর কিছু করতে পারে নি তার। ডাক্তার একটা কাজ করেছিল। হলংকে বলেছিল (তখন তার অন্য কি একটা নামও ছিল, আর খট্‌মট্‌ হিন্দিতে কথা বলত) তুমি বাপু, এখানে দুদিন রহনা। রোগটা তোমাকে ধ'রে থাকলে চিকিৎসা করা যাবে। হলং আর ত'র ষাঁড় তিন-চারদিন হেল্থ সেণ্টারের সামনের মাঠে ছিল। একদিন বেসামাল হ'য়ে অজ্ঞান হযে পরে সামলে নিয়েছিল। সে সময়ে নার্স তাকে খেতে দিত। বোঝা যাচ্ছে, হেল্থ সেণ্টারের খাতায় সে ইনডোর রোগী। কিন্তু তখন সত্যিকারের ইনডোর রোগীও ছিল। হাঁপানির রোগী সেই চায়ের দোকানের বুড়ো, আর সেই যার হাত-পা ফুলে গিয়েছে ছেলেমেয়ে হওয়ার সময়ের চার পাঁচ মাস আগেই। আর লেদু মিঞাও।

নাম তো বাপ মা-ই সখ করে দেয়, তারা হয়তো তাকে ভাল নামই দিয়েছিল, জয়নাল আবেদিন বা শেখ সাদীও হতে পারে, কিন্তু যাদের মধ্যে বেড়ে উঠেছে সেই মাটিঘেঁষা চাষীরা যেন তার দ্বিতীয়বার নাম রেখে থাকবে লেদু, ল্যাদা। বোধহয় বোকা বোকা অলস প্রকৃতির জন্য। ডাক্তারবাবুরই এরকম মত ছিল। সে ছিল এক ইনডোর পেশেণ্ট, যে দু বছরের উপর সেই হেলথ সেণ্টারে। দুবছর তেমনভাবে সে রকম এক রোগীকে নিশ্চয় রাখা যায় না। সেজন্য কিছুদিন পর থেকেই সে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের সব পিছনের দিকে ঘরখানায় থাকত। সেদিকে ছন কাশের পড়ো জমি সাফ করে সে পেঁপে, পেয়ারা, কলা, এমন কি নারকেল গাছ পর্যন্ত লাগাতো। ডাক্তারবাবু এই গ্রামে আসার পরপরই, জ্বর আর কাশি নিয়ে লেদু মিঞা এসেছিল হেলথ সেণ্টারে। ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পরও ডাক্তারবাবু ফিরবে বলে সেই খালি কোয়ার্টারে থেকে গিয়েছিল লেদু মিঞা। ডাক্তারবাবু থাকতেই পেঁপে আর কলা বিক্রি করে নিজের দুবেলার ভাত যোগাড় করতে পারতো, কিন্তু ডাক্তারবাবু তা হতে দেয়নি। ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পরে লেদু মিঞা অবশ্যই সে ভাবেই হেল্থ সেণ্টারে থেকে গিয়েছিল। তখন তার পেঁপে ফল যথেষ্ট, কলা ফলছে। হেল্থ সেণ্টারে কম্পাউণ্ডারবাবুকে দিয়ে চিকিৎসা করাতেও যদি কোনও রোগী অগত্যা আসতো, লেদু মিঞা তো তাকেও দু-চারটে ফল দিত। লোকে জানত, লেদু মিঞা ডাক্তারবাবুর বিনে পয়সার চাকর। কিন্তু পরে কম্পাউণ্ডার বললো, লেদু ডাক্তারবাবুর ছেলে। তা অবশ্যই হয় না। সাতাশ-আটাশ বছরের কোনও ডাক্তারের কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে

থাকতে পারে না। এরকম বলার মত ঘটনা হয়েছিল। লেহু মিঞা চিকিৎসার প্রথম দু-মাস হেল্‌থ সেণ্টারের খাটেই থাকতো। পরে ডাক্তারবাবু অন্য রোগীদের থেকে সরিয়ে তাকে নিজের কোয়ার্টারে পাঠিয়েছিলেন। মাস ছয়েক পরে লেহু মিঞা তখন ডাক্তারের কিনে দেওয়া তফন আর গেঞ্জি পরে হেলথ সেণ্টারের চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তখন একদিন ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, তোমার রোগ আর নেই, বাড়ি-ঘরে ফিরে যেতে পার, মাস দু-তিন চার পরে এসে বরং দেখিয়ে গেলে হয়। পরদিন সকালেই জানা গেল, লেহু মিঞা পালিয়েছে। বাড়ি চলে গিয়েছেও বলা যায়। কিন্তু মাস ছয়েক যেতে না যেতে, আবার লেহু মিঞা ফিরে এসেছিল। জ্বর, কাশি, খেতে পায়নি বোধহয়, এমন রোগা। ডাক্তারবাবু দেখলেন, বসালেন, ইনজেকশন দিলেন। পরে বললেন, এক কাজ করো, রান্না ঘরে দুধ পাবে আর মুড়ি। বাথরুমে জল থাকবে। হাত, মুখ, মাথা ধুয়ে নিয়ে দুধ মুড়ি খাওগে পেট ভরে। টিপকলে পাম্প করতে যেয়ো না। এই বলে লেহু মিঞাকে ঘরের চাবি দিয়েছিল ডাক্তারবাবু। এর পরেই কম্পাউণ্ডার বলেছিল, লেহু মিঞা ডাক্তারবাবুর ছেলে। তা হয় না, যদি না ডাক্তারবাবু লেহু মিঞার বুড়ি মাকে ঘর ঢোকা বিয়ে না করে থাকে। তা আরও হয় না এজন্য যে সেই গাঙ্গুলী ডাক্তারবাবু লেহু মিঞার বুড়িমাকে কখনই ঘরে নেবে না সেই বুড়ি মার যদি দু'এক পাটী জমিও থাকে, যদিবা সেই বুড়ি এখনও রোয়া-গাড়ার কাজ করতে পারে।

চন্দানি আবার ছিপ টানলো হাসি হাসি মুখে। এবারও মাগুর। আকারে আগেরটার চাইতে ছোট, কিন্তু ডিমে বোঝাই পেট। সেই ডাক্তারবাবু সেই কালো পুলিসের গাড়িটা গ্রামে আসার পরে পরেই ছুটিতে চলে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। তার একটা কারণও দেয়া যায়। যে খুনীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কোর্টে সাক্ষী দিয়েছ, প্রধান সাক্ষীই তো, তার যাবজ্জীবন দণ্ডও যদি মুকুব হয়ে যায়, তা হলেই যথেষ্ট অস্বস্তি হওয়ার কথা। উপরন্তু সে যদি সম্মানিত অতিথির মত সেই গ্রামেই ফিরে আসে, তা হলে হতাশা হতেই পারে তোমার সাক্ষ্য যতই সত্যনির্ভর হোক। গ্রামেও যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তারাও ভাবতে পারেনি এরকমটা ঘটতে পারে। চোখের সামনে যে খুন করেছে সে তেমন করে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ঘরে ফিরবে। ডাক্তার আর নার্স তো আহতের সম্বন্ধে সব চাইতে স্পষ্ট জানতে পারে আঘাত-টাঘাতের কথা। ভাগ্যে চন্দানি সেদিন স্কুলে যায়নি। অন্যান্য দিন যে বাসে সে ফিরে আসে, যে বাস স্টপে নামে, সেই বাসস্টপে সেই বাসে উঠবার সময়ে সাহাদের ছেলে সরিৎ খুন হয়ে গিয়েছিল। সেই বাস স্টপে অনেকেই ছিল। তার সামনেই তো উখুণ্ডির সব চাইতে বড় দোকান গালা মালের, আর তার অদূরে সেই স্কুল, যেখানে আধঘণ্টা আগে ভোট নেয়া শেষ করে, ভোটের

সাহেবরা তাদের ভোটের বাক্স নিয়ে ট্রাকে করে চলে গিয়েছে। ট্রাকটা চলে যাওয়ার পরেপরেই বাসটা এসেছিল, একটু দেরিই করেছিল আসতে। বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যার দিকে সময়। সরিৎ-এর ভাগ্য যে সে বাড়িতে না ফিরে সদরে যেতে চেষ্টা করছিল। কি উদ্দেশ্য ছিল, তা এখন আর বলা যাবে ন। সে যখন বাসে উঠছে, তখন গজেন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে একটা কুকরী দিয়ে তিনবার মেরেছিল সরিৎকে। বাসটা দাঁড়ায় নি। তার কনডাক্টর ড্রাইভার হয়তো সুবুদ্ধির কাজই করেছিল, অতগুলো যাত্রীকে তেমন মারামারির মধ্যে না-রেখে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে। সেদিন তারা তো সর্তকই।

তাদের পথের ধারে বেশ কয়েকটি ভোটের বুথ, মারামারি লাগলেই হল। যোগা-যোগের ফলে সরিৎকে যেখানে মারা হচ্ছিল তার কাছাকাছি ছিল নার্স। যোগাযোগ না বললেও চলে। বিকেলের দিকে নার্স মাঝেমাঝেই এ-পথে ও-পথে বেড়াতে কখনও বা এটা ওটা কিনতে পথে বেরতো। সেদিন তো ভোটের বুথই সব চাইতে উত্তেজনার বিষয়। বুথের থেকে কি করে ভোট বাক্স চালান যাচ্ছে, তা দেখতে সে বাস স্টপ আর স্কুলটার মাঝামাঝি জায়গায় ছিল এসময়ে। নার্সের রক্তপাতটাত দেখা অভ্যাস থাকায় আর সকলের আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, আর ডাক্তারকে খবর দেয়ার কথা, হেল্‌থ সেন্টারে নেয়ার কথা বলতে পেরেছিল। সেখানে নেয়ার পরে ঘণ্টা খানেক বেঁচেছিল সরিৎ। নার্স সাক্ষী দিয়েছিল, তার সামনে ডাক্তারকে সরিৎ গজেন ঢালির নাম বলেছিল।

কাজেই ডাক্তারকে পালাতে হল। তার স্বভাবটা তেমন ছিল। সে এখানকার বাঙালীদের মধ্যেও ভাষার দরুন পৃথক ছিল। দক্ষিণের ভাষায় জোরে জোরে কথা বলতো। একটু বেশি যেন স্ফূর্তিবাজ ছিল। কোন রোগী খুব করুণ করে তার কষ্টের কথা বললে, এরকম ভাব দেখাতো, সেসব কিছু না। রোগীর অভিভাবকরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলতো, গা লাগাতে চায় না। কিন্তু চিকিৎসা ক'রে সারাতো। ওষুধ কোথায় যে তা দেবে। যেন থাবড়ে থুবড়ে ধাক্কা দিয়ে রোগ তাড়াবে। আরোগ্য হ'লে রোগী বা তার অভিভাবক ধন্যবাদ দিতে এলে, এরকম ভাব দেখাতো তার কথা বলার সময় নয়। উখুণ্ডির বয়স্ক মানুষদের ধারণা হয়েছিল, লোকটা অত্যন্ত দাম্ভিক। তার সব সময়েই যেন মনে থাকতো সে শহরের মানুষ। এই কোন কিছুতে গুরুত্ব না-দেয়া, অথচ সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা, (ডাক্তার যে প্রাণ বাঁচাতে পারে, বাঁচায় কিনা সে আলাদা কথা—তার মতো গুরুত্বপূর্ণ আর কে?) চেহারায় বেশ লম্বা হওয়া, একটু ঝুঁকে, দুলে দুলে, লম্বা পা ফেলে চলা, যেন সব পথই কাদায় ভ্যাড়ভ্যাড় করছে—

এসবের ফলে তাকে কাছের মানুষ মনে হতো না, আমাদের কেউ নয় মনে হতো, কিন্তু অস্বীকার করাও যেত না।

তো, সে হেল্‌থ সেণ্টারকে ডুবিয়ে দিয়ে, আগুনে পোড়ার পরে যেমন বাড়ির কঙ্কাল পড়ে থাকে, তেমন করে দিয়ে চলে গেল—আর তা কাউকে না বলে। তবে বোঝা উচিত ছিল অন্তত কম্পাউণ্ডারের। ডাক্তার তো তাকেই সকলের সামনেই যে কজন রোগী তখন ইনডোরে তাদের চিকিৎসার কথা বলেছিল। তারপরে বলেছিল, লেহ্‌ মিঞার যদি আবার জ্বর আর কাশি হয়, তা হ'লে কি ইনজেকশন দিতে বলতে হবে, কি ওষুধ খাওয়াতে হবে। কম্পাউণ্ডারের দোকানে যে স্যাম্পল ফাইলগুলো আছে তা আগামী এক বছর ঠিক থাকবে। আর সেগুলো যেন লেহ্‌ ছাড়া আর কারোকে না-দেয়া হয়। আর লেহ্‌ তো বাগান করছেই আমার, তাই করতে থাক। কলা আসছে গাছে, পেয়ারা আগামী সিজনে ফলবে, পেঁপে তো হচ্ছেই। আর কপি, ডাঁটা এসব ফলিয়ে সে তার খাওয়ার যোগাড় করে নিতে পারবে বোধহয়, অন্তত যতদিন ডাক্তার না-ফেরে। বোঝা উচিত ছিল, এটা লেহুর জন্য একটা অসম্ভব সাময়িক ব্যবস্থা করা, যেখানে কোনও ব্যবস্থা করার কোনও ফন্দি ছিল না, আর তা দীর্ঘদিনের জন্য।

* * *

হলং-এর ছিপে গায়ে কালচে ছোপ লাগা হাত দেড়েক লম্বা একটা বোয়াল উঠল। চন্দানির ছিপে টোপ খেয়ে গিয়েছে কোনও বড় মাছ। এটা সেই শোলটা হতে পারে যার দাঁতে ধার আছে। এ ডোবাটায় প্রথমদিন এসেই সে শোল মাছটাকে দেখেছিল। ডোবাটা এবারই তৈরি হয়েছে, এবারই তো প্রথম বর্ষায় অন্য ডোবা ছাপিয়ে এটায় জল এলে, কিম্বা এটার জমা জলের সঙ্গে যখন পুরনো মানসাই-এর মজা খাতের জল একাকার হয়েছিল, তখনই মাছগুলো এসে থাকবে, কাজেই মাছগুলো এতটুকু চালাক হতে সময় পায়নি, সহজে ধরা পড়ে, কূলে মানুষ থাকলেও, তারা কথাবার্তা বলতে থাকলেও, জলে গা ভাসিয়ে চলে। কাজেই নিঃশঙ্ক সেই শোলমাছটা কিনারার একেবারে কাছে, অল্পজলে স্থির হয়েছিল, সামনের পাখনা দুটো নাড়ছিল শুধু। কিন্তু ধরতে গিয়ে চন্দানি থমকে গিয়েছিল। আলোতে যেমন ধুলোকণা ভাসে, মাছটার চারদিকে অসংখ্য পোনা তেমন খেলা করছে। মাছরা মা-এর দুধের ধার ধারে না, কিন্তু বোধহয় অন্য মাছের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মায়ের চারিদিকে গা ঘেঁষে থাকে। শোলটাকে ধরা হয়নি। অতগুলো প্রাণী মরবে এটা চন্দানির ভাল লাগে না, হলংও তাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ওরা তো মরবেই। এই ডোবাটা থেকে নালী কেটে মানসাই-এর পুরনো খাত পর্যন্ত জল

চলার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে, শোলটা হয়তো পোনা নিয়ে পালাতে পারতো। কিন্তু একবার সেরকম কথা মনে হলেও, নালী কাটার চেষ্টা করাও পাগলামি হ'তো।'

মরবেই ওরা। চন্দানি বিমর্ষ বোধ করল। বড় জোর আর পাঁচ সাতদিন তার পরই বর্ষার জলের এই ডোবার তলায় পাঁক ছাড়া আর কিছু থাকবে না। তখন সেই কাদায় কুচা আর সাঠি ডুবে কোনরকমে টিকে থাকার চেষ্টা করতে পারে হয়তো, আর কোনও মাছই বাঁচবে না।

কিন্তু সেজন্যই ডোবাটায় মাছ পাওয়া এত সহজ হচ্ছে। হাত দশেক লম্বায় আর চওড়ায় হাত সাত-আট জলের পরিসর। প্রাণের দায়ে মাছগুলো তার মধ্যে এসে জমেছে। ওদের যদি বুদ্ধি থাকে, তবে হয়তো বুঝতে পারছে, আর কদিনেরই বা এই আশ্রয়।

চন্দানির ঠিক পিছনে এক সারি পাহাড়ী গাছ কিছু দূরে দূরে। গাছগুলো বেশ বড়। শীতকালে ফুল হয়। তারও শ'দুয়েক গজ দূরে এক সারি ইউক্যালিপটাস। ইউক্যালিপটাস সারি পাহাড়ী গাছগুলোর চাইতে উঁচু জমিতে। ফলে পাহাড়ী গাছ-গুলোর চাইতে উচ্চতায় কম হলেও, তাদের মাথা আর পাহাড়ী গাছগুলোর মাথা সমান সমান উচ্চতার মনে হয় এপাশ থেকে। এই দু সারি গাছের মধ্যে কাশ, ছন, লতাকুল তো বটেই, পাহাড়ী কলা এসব গাছও আছে, কাজেই বেশ বন বলেই মনে হয়।

ওই বনের মধ্যে ঢুকে গেলে বোঝা যায় এটা পাহাড়ের গা নয়। সব চাইতে উঁচু ইউক্যালিপটাসের সারিব ওপারে, সব চাইতে পরে পরিত্যক্ত রাস্তাটার খানিকটা খানিকটা যেমন চোখে পড়ে, পাহাড়ী গাছগুলোর সারির ওপারেও, তেমন ভাবে আগে পরিত্যক্ত, আর একটা সড়কের, কোথাও যা অটুট, এমন ধ্বংসাবশেষ আছে। আর চন্দানির সামনের ডোবাটার ওপারেও, তার চাইতে পুরনো একটা পথ যে ছিল তার প্রমাণ সেখানকার বালিমাটির মধ্যে ডুবে থাকা, মাঝে মাঝে পায়ে লাগে এমন পাথরের টুকরো, আর এখানে ওখানে, লতাকুল বনের মধ্যে মাথা জাগিয়ে থাকা এক একটা আম বা কাঁঠাল গাছ।

সব চাইতে পুরনো সবার আগে পরিত্যক্ত এই তৃতীয় পথটা যখন তৈরি হয়েছিল, তখন হয়তো গরু-গাড়ির পথই ছিল, তখন তার ধারে কেউ আম-কাঁঠাল, বট ইত্যাদি লাগানোর কথা ভেবেছিল! এরকম কল্পনা করা যায়, মানসাই-এর পুরনো কাশবনের চড়ার তলায় আরও পুরনো ইট খোয়ার তৈরি কোনও পথের ধ্বংসাবশেষ থাকতেও পারে। এই পরিত্যক্ত পথ গুলো একটার থেকে অন্যটি উঁচু। কিন্তু উচ্চতা সব জায়গায় সমান নয়। কোথাও তা পাঁচ সাত ফুট, কোথাও বিশ-ত্রিশ ফুট। পথগুলো মোটামুটি

সমান্তরাল বলা যায়, যদিও তা আদৌ ঠিক বলা হয় না, কারণ পথগুলোর মধ্যে তফাৎ কোথায় দশ-বিশ হাত কোথাও বা আধ মাইল। একবার যে হলং পথ বদলাতে বাধ্য করেছিল তা বোঝা যায়। সব চাইতে নিচের আর সব চাইতে উপরের পথরেখার মাঝেরটির উপরে কাঠের সাঁকো ছিল। কালো হ'য়ে যাওয়া মোটা শালের খোঁটা কয়েকটা আছে এখনও। কিন্তু সাঁকোটা হলং-এর ভাঙনে মাঝখানে পড়ে ছিল নদীর। তার প্রমাণ সাঁকোর অবস্থানের দুপারেই এখন অনেকটা করে ভাঙা সেই পথ। তার কাছাকাছি জায়গায়, হলং যে সব নিচের পথটাকে ধসিয়ে নিয়ে ভূমিক্ষয় করতে করতে মানসাই-এর দিকে ছুটতো, তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ভারী বর্ষায় সেই পথে জল এসেই এই ডোবাটা তৈরি করেছে, বলা যায় সব চাইতে নিচের পথের মাথায় আর তার উপরের পথের গোড়ায়।

এইটুকু এই বন কি আর দুর্গম হতে পারে। পুরনো পথগুলোর যে কোনটিকে ধরে ভাঙা চোরা অংশের সাপখোপ লতাকুলের কাঁটার জঙ্গল পার হয়ে বেপরোয়া মানুষদের বনে ঢুকতে কতক্ষণ। ভাগ্যে তারা আন্দাজ করেনি হলং-এর পুরনো খাতের জল এসে এই ডোবা করেছে আর তাতে মাছ আছে। ভাগ্যে কলাবনটা সব উপরের পথটা থেকে তেমন চোখে পড়ে না যে মোচার খোঁজে মানুষ আসবে। সে দিক দিয়ে ভাবতে গেলে, ডোবাটা যত তাড়াতাড়ি শুকোয় ততো ভাল। এদিকে কেউ একবার এসে পড়লে হঠাৎ, মাছের লোভে বারবার আসবে। প্রায় সারাদিন ব'সে সে জন্য চন্দানি মাছগুলোকে শেষ করে ফেলতে চায়। তা ছাড়া হলংই বা কতদিন মাছ বিক্রি করবে? বুদ্ধিটা চন্দানির। ভোর রাতে উঠে, মাছের খালুই কাঁধে, নতুন যে সড়ক হচ্ছে তার এ মাথায় ডাইভার্শানের কাছে হলং দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ রাতের ট্রাকওয়ালাদের অনুনয় বিনয় করে হলং কোনোটা না কোনোটায় চেপে ফালাকাটা, ধূপগুড়ি এইসব দূরের শহরে চলে যায়। সে সব জায়গায় হাট ছাড়াও প্রতিদিনের ছোট ছোট বাজার আছে, বাবুরা আছে যারা মাছ কিনে খেতে পারে। তখন কিন্তু হলংকে অভিনয় করতে হয়। একটা রংকরা গেঞ্জি গায়ে দেয় সে, একটা বড় গামছা কোঁচা না দিয়েও কাপড়ের মতো করে পরে। অভিনয় করা তার অনেকদিনের অভ্যাস। ষাঁড়ের মাথা নাড়ানো, হাঁটতে শুরু করা, বাঁ পা অথবা ডান পা শূন্যে তোলার চেষ্টা, তা থেকে মানুষের ভাগ্য ব'লে দেয়াও অভিনয়। তা তো সে করতই। এখনই বরং করে না। চন্দানি একটা বেশ বড়সড়ো শোলের বাচ্চা ধরল বেশ সাবধানে দু হাতে চেপে ধরে খালুই-এ রাখল সে সেটাকে। এসব মাছই কাল সকালে বাজারে যাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকা চাই।

* * *

ভয় তো অন্ধকারের মত ব্যাপারই, কিছুক্ষণের মধ্যে যা ঘনিয়ে আসবে। বনের বাইরে একেবারে নতুন সড়কে, এমনকি সব চাইতে উঁচু পরিত্যক্ত সড়কটার কাছে বনের সীমান্তে হয়তো আলো থাকবে, কিন্তু এখানে বেশ অন্ধকার হয়ে যায় তখনই। বরং বেশ রাত হলে, পশ্চিম আকাশে তারা, চাঁদ এসব দেখা দিলে কিছু আলো হয়। নতুবা সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে যে অন্ধকার, যাতে গাছপালা ঝোপ ঝাড় কিছু দেখা যায়, বেশিটা অন্ধকারে গলে যেতে থাকে মেঘে মেঘ মেশার মত। সূর্য নামতে থাকলে সব চাইতে উঁচু সড়কটাকে ডিঙিয়ে আলো এপারে নামতে পারে না। চন্দানি নতুন করে হিপ না-ফেলে, পিঠের সন্তানটিকে পিঠ থেকে বুকে নিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। সে আজকাল বেশিক্ষণ উবু হয়ে বসতে পারে না। জোড়াসনে ব'সে সেই ছয়মাসের শিশুটিকে মাই দিয়ে দিয়ে তাকে নির্ভয় করল যেন। তেমন করতে করতে মুখ ঘুরিয়ে তার ঝোপের সামনে বসে থাকা ছেলেটিকেও দেখে নিল। কিছুক্ষণ আগেই তাকে ঘুম থেকে তুলে জলে ভিজানো চিঁড়ে খাইয়ে দিয়েছে। সে মৃদু গলায় ছেলেটিকে বলল, 'শো, ঘুমি থাক।' ছেলেটি উঠে এসে চন্দানির কাছাকাছি মাটিতে শুয়ে পড়ল। চন্দানি হাত বাড়িয়ে তাকে একবার ছুঁয়ে নিল।

ভয় নানা রকমের নানা মানুষের হতে পারে। হলং-এর ভয়ের কথা যেমন। চার-জনের দল ছিল। দুজন কলেরায় মরল। একজন পালাল। চতুর্থ আর অবশিষ্ট সে অচেনা জায়গাকে এত ভয় পায়, যে একা সে এ অঞ্চলটা ছেড়ে যেতে দু তিন বছরেও সাহস ক'রে উঠতে পারল না। যে গ্রামে তাদের সেই দলপতি মরেছিল আর হলংবন, তার মধ্যে যে গ্রামের পথগুলো, অথবা তার সীমার মধ্যেই বড় ব্রিজ তৈরি করার জন্য কুলি, মিস্ত্রি, মাটিকাটা মানুষদের কুঁড়ে ঘর আর তাঁবুর যে শহর, এসবের মধ্যে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ এই বনে রাতে দিনে, বাঘ ডাকা সত্বেও সে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাখী যেমন বনে থাকে! বনে পাখীর ভয় নেই এমন নয়। দুর্বল পাখীকে সবল পাখী আক্রমণ করতে পারে, সাপ আছে, বনবিড়াল আছে, শিয়াল আছে। তা বলে পাখী বন থেকে বেশি দূরে যায় না।

সে, চন্দানি, বছরখানিক আগে যেমন এই হলংকেই ভয় পেয়েছিল। তখন চন্দানির বড় ছেলেটি এক বছরের হবে। শীতকাল। তখন সে সেই মানসাইঘাট সেই হাজার কুলির বস্তির এক পাশে তাদের মত একটা খড়ো ঘরেই থাকে। তার ঘরটা ছিল তেমাথা ঘেঁষে। আর তার সুবিধায় ঘরের বাইরে একটা বাঁশের লম্বা মাচার উপরে চার পাঁচটা কাঁচের গ্লাস সাজিয়ে, সে একটা চায়ের দোকান দিয়েছিলো। সে মাচায় বসে তার দোকানে এসে, শীতের সকাল আর বিকেলে যারা চা খেত, তাদের সংখ্যা কোন

কোনদিন পঞ্চাশ ষাটও হয়ে যেত। তাদের মধ্যে ট্রাক থামিয়েছে তেমাথায় এমন ট্রাক-ড্রাইভারও থাকতো। আর দুপুরে কোন-কোনদিন, কোন-কোন কুলি তার দোকানে বসে ছাতু খেত, রুটি-তরকারি খাওয়ার বায়না তুলতো। এটাই ছিল উপজীবিকা তখন। অতবড় ব্রিজের কাজ, কাঠে মিস্ত্রিরাও অনেক, তাদের দিনরাত হাত চলতো। উনুনের জন্য কাঠকুঠ কুড়িয়ে আনতে অসুবিধা হতো না। কিন্তু তা শেষ রাতে বেরিয়ে পাঁচ-সাড়ে পাঁচটায় তার ঘরের সামনে উনান ধোঁয়াতে শুরু করলেই চা খাওয়ার প্রথম দল সেই আগুন ঘেঁষে বসার লোভে, গরম চায়ের লোভে আসতে শুরু করতো। ততো ভোরে আর কেউ দোকান খুলতো না।

ভোর হতে না হতেই, কাঠ কুড়িয়ে, ঘুঁটে কুড়িয়ে স্নান করে ফিরে আসতে হতো চন্দানিকে। শীতে সংকীর্ণ মানসাই-এর একটা নির্জন অংশ খুঁজে নিয়েছিল সে। সেখানে নেকড়ায় চোকড়ায় জড়ানো ছেলেকে বালির উপরে শুইয়ে, এমনকি নিজের কাপড়-চোপড়েও তাকে চাপা দিয়ে সে স্নান করতে নামতো। নির্জন ভোররাতে স্নানে নামতে ক্রমশ সে উলঙ্গ হতে শিখেছিল। স্নান শেষে যা পরবে, সে সব দিয়ে ঘুমন্ত ছেলেটাকে বরং বেশি আরামে রাখা যায়। এক উরু জলে দাঁড়িয়ে সে স্নান করত। ছেলের থেকে নতুবা বেশি দূরে যেতে হয়। সেদিনের ভোরে তার মনে হচ্ছিল বোধহয় অন্যদিনের চাইতে আগেই এসেছে। সূর্য ওঠার সময়, সূর্য উঠছে না, অথচ আলো আলো যেন। সূর্যটার ঠিক মুখের উপরে মেঘ, তা সে বুঝতে পারছিল না। বোধহয় মেঘ সরার ব্যাপার নয়, সূর্যেরই আর কয়েক ডিগ্রি উপরে ওঠার ব্যাপার, হঠাৎ সেই মেঘলা কুয়াসা অন্ধকারের মধ্যে চওড়া এক ফালি আলো নদীর ছোট ছোট ঢেউগুলিকে সোনা সোনা করতে করতে, তার ভিজে গায়ে রাংতার মত ঝলমল করতে করতে তীরের দিকে চলে গেল। তা যেন তার ছেলের দিকে এগোনো একটা ঢেউ। অবর্ণনীয়, অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় পিছন ফিরতে গিয়ে সে ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো। তার ছেলে তো কিছু দূরে, জলের কিনারায় বরং সেই আলোর মধ্যে, যেন তামার তৈরি, এক উলঙ্গ পুরুষ মূর্তি। আর সে যেন চন্দানি আর সূর্যকে একই সঙ্গে দেখছে। ভয়ে, সেই শীতের ভোরে, চন্দানির স্নান করা গায়ে বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সাহস করতে হয়েছিল চন্দানিকে। সে এখনও জানে না, কিন্তু পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে কয়েকবার, ছেলের বিপদ মনে পড়লে তার ভয় একদম থাকে না। খুব ভয়ের কারণ ঘটলে ছেলেদের কোলে করলে সে তখন ভয় পাওয়া অন্য মানুষ। সে এখন জানে সাহস ভর করেছিলো তার শরীরে। সে ছেলের কাছে পৌঁছানোর জন্য জল থেকে উঠে সেই উলঙ্গ মূর্তিটার পাশ দিয়েই দৌড়ে গিয়েছিল। গায়ে কাপড় তুলে, ছেলেকে

বুকে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ভয় কেটেছিল। দিনের আলো ফুটেছিল পাঁচ মিনিটে, আর তখন সে মূর্তিটাকে ভালো করে দেখে উখুণ্ডিতে দেখা অল্প বয়সের সেই সন্ন্যাসী বলে চিনতে পেরেছিল।

অন্য রকম ভয়ও আছে। ডাক্তার যে ভয়ে চলে গিয়েছিল, সেটা না হয় বোঝা যায়। সেই নার্স তিন মাস মাইনা না পেয়ে, সদরে গিয়ে যখন শুনল, আগে তদন্ত হবে পরে মাইনা, তখন সে তো ভয়ে দিশাহারাই হয়েছিল। তার সেই চল্লিশ বছর বয়সে চাকরি, পেনসান সবই যায় যদি, তার মেয়ের লেখাপড়া দূরে থাক, তাকে পাস করা নার্স করা দূরে থাক, মাথার উপরে ছাদ, দুজনের একবেলা রুটি আর একবেলা ভাতই বা কোথা থেকে আসবে? দু-বেলা ভাত দূরে থাক। কিন্তু সেটা একেবারে অন্য রকমের ভয় যা সরিৎকে পেত গজেন। ডাক্তারবাবু বলেছিল। চন্দানি কিংবা নার্স কেউই বুঝতে পারেনি, লেডু মিঞা মাথা নাড়লেও নিশ্চয়ই এক বর্ণ ও বোঝে নি। বুঝবে কি? তখনও তো তার কথার জড়তাই কাটেনি। তার কথাগুলোর মধ্যে কটা বাঙালী শব্দ, আর কটা রাজবংশী শব্দ, তা বোঝা কঠিন ছিল। মনে হ'ত, সে বাঙালীদের অনুকরণের চেষ্টা করছে। ডাক্তারবাবু বলেছিল, আসলে গজেনের সেটা সাহসের পরিচয় নয় সেই কুকরী দিয়ে মারা। বেশ কিছুদিন থেকে গজেন ঢালি সরিৎকে ভয় করত!

এ কথাটার কোন অর্থই চন্দানি খুঁজে পায় নি। কেন ভয় পাবে? দুজনে সমান রোগা পটকা ছিল এখন চন্দানি বুঝতে পারে; যদিও স্কুলে পড়ার সময়ে, (সেই উখুণ্ডির গ্রামে ছেলেদের আর মেয়েদের একই তো স্কুল) তারা দুজনেই বয়সে বড় হওয়ার জন্য চন্দানিদের চাইতে মাথায় লম্বা ছিল, এক রকম সমীহের বিষয় ছিল। ওদের মধ্যে গজেনই বরং ভয়ের বিষয় হতে পারে। তারা যখন ক্লাস এইটে, চন্দানিরা ক্লাস সিক্সে। সেবার স্কুলে সরস্বতী পূজার সময়েই প্রথম ব্যাপারটা হয়েছিল। সে বছরই স্কুলে শহর থেকে দুজন মাস্টার এসেছিল, একজন বি এ পাশ, অন্যজন তার বেশি, বলা হত বি এস সি মাস্টার। তারা সরস্বতী পূজার উৎসবে স্কুলে আবৃত্তি অভিনয় এসবের ব্যবস্থা করেছিল। আর সেবারই প্রথম গজেন আবৃত্তি করেছিল। বি এস সি মাস্টার পিছন থেকে বলে বলে দিচ্ছিল, আর গজেন আবৃত্তি করেছিল 'আফ্রিকা' নামে এক কবিতা। গজেনকে বোধহয় কালো রঙ মাখানো হয়েছিল। সে চিৎকার করে, দাঁত কিড়মিড় করে, হাত মুঠ করে, থেকে থেকে সেই মুঠ করা হাত ঝটকা দিয়ে মাথার উপরে তুলে, যখন আবৃত্তি করল তখন স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সেদিন তারপরে সরিৎও আবৃত্তি করেছিল। সে এক মিনমিনে ব্যাপার। না, সে আবৃত্তির কথা এক বর্ণও মনে নেই চন্দানির। বরং গজেন তার পরেও নানা উপলক্ষ্যে

যে 'পিড়্থিবি' আবৃত্তি করত তার স্বর এখনও মনে পড়ে। সেই 'ড়োদ্‌ড়া' 'ভহীষ'ণ।' এসব যখন গজেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলত, তখন ভয় ভয় ক'রে উঠত। আর চন্দানিরা যখন ক্লাস এইটে উঠেছে, (গজেন তখনও ক্লাস এইটেই) তখন চন্দানির চার পাঁচজন সঙ্গিনীর প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে, গজেন পাশ দিয়ে গেলে গা শিরশির করে ওঠে। ক্লাস এইটে সরিৎ আর গজেন দুজনেই ফেল করেছিল। পরের বছর সরিৎ পাস করল, গজেন পারলোনা। আর সেবারই স্কুলে ক্লাস নাইন খোলা হল। লোকে বলেছিল ক্লাস নাইন খোলা হবে জানলে গজেনও পাস করে নিত। সরিৎ ক্লাস নাইন আর টেন পাস করেছিল, কলেজে নাকি পড়বে। গজেন স্কুল ছেড়ে দিল। সেইবারই মেয়েদের প্রথম ব্যাচ ক্লাস নাইনে উঠবে তো।

সব মানুষের গুণ একরকমের হয় না। সরিৎ হায়ার সেকেণ্ডারি পড়ার জন্য মহকুমা সদরে যায় বাসে। ততদিনে গজেন উখুণ্ডি ড্রামাটিক ক্লাব খুলে ফেলছে। যে সব ছেলেমেয়েরা ক্লাস এইটে উঠে আর পড়ার কথা ভাবছিল না, তাদের কাছে গজেন বেশ প্রাধান্য পাচ্ছিল তখন। ছেলেরা কি বলত তা সব সময়ে জানা কঠিন, মেয়েদের মধ্যে দু-একজন, যারা কোনও না-কোন সময়ে সদরে গিয়ে সিনেমা দেখে এসেছে, বলতো গজেনকে আমজাদ খানের মত দেখায়। স্কুল ছাড়ার পর গজেন বেশ মোটা হ'য়ে যাচ্ছিল. সরিৎ বরং সেই লম্বা সিড়িঙেই থেকে যাচ্ছিল।

কোথা থেকে মানুষ কি শোনে বলা যায় না। সেই বি এস সি মাস্টার তো ছিলই। সেবার মহকুমা সদরে মৃন্ময়ী অপেরা পার্টি এসেছিল। তারা গোটা মহকুমাটাকেই পাগল করে তুলেছিল তাদের পালাগানে। কে যায় নি সে পালাগান শুনতে? লেদু মিঞাকে কোয়ার্টার পাহারায় রেখে চন্দানিরাও গিয়েছিল। অদ্ভুত অভিনয় সব, হিটলার, স্তালিনগ্রাদের দুর্গ, হোচিমিনের সড়ক। একেবারে নতুন। সে তোমার সেই সব সুরথ উদ্ধার, ধ্রুব, এমনকি সেই-কি-যেন দীঘিও নয়। সেই পালায় যারা অভিনয় করত তাদের মধ্যে যে সবসেরা, যে হিটলার সাজতো, গিয়াপ সাজতো সেই নাকি গজেনের একটা খাতায় তার 'আফ্‌ড়িকা' আবৃত্তি শুনে লিখে দিয়েছে, তোমার হবেই। তারপর থেকেই গজেনের ড্রামাটিক ক্লাব। এর পরে দুপুর খুব নিস্তব্ধ হলে, কিংবা রাত আট-নটা হলেই উখুণ্ডি নিস্তব্ধ হতে থাকলেই, ড্রামাটিক ক্লাবের চিৎকার করা রিহার্শাল শোনা যেত। এর মধ্যে গজেনের সরিৎকে ভয় পাওয়ার কি আছে?

বরং অন্যলোকের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছিল না গজেন? ক্লাস এইটের মেয়েরা তো গা শিরশির করার কথা বলতোই। ধর্মেন্দ্র খান্না ইত্যাদির সঙ্গে, নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময়ে, গজেনের তুলনা দিত। আর চন্দানিরা যখন ক্লাস নাইনে, তখনই

সতীকে (হয়তো সতীর গড়ন একটু বাড়ন্ত, মোটাসোটা ছিল) আর গজেনকে দু-একবার অনেক রাতে, অন্ধকারে, হলং পারের সেই পুরনো ইটভাঁটার পরিত্যক্ত গদিঘর থেকে বেরোতে দেখা গিয়েছিল।

কবাক কবাক কবাক। চন্দানি যেন অবাক হয়ে গেল। সে ভাবতে চেষ্টা করল এ তো আছেই। জঙ্গলে সব সময়েই শব্দ হচ্ছে। তুমি তা শোনার মতো মন নিয়ে চলতে থাকলে শোন, অন্য সময়ে একঘেয়ে সেই শব্দ তোমার কানে আসে না। নদীর ধারে কুলকুল শব্দ কি সব সময়ে শোন? মাঝে মাঝেই ডাকছে ডাহুকরা নিশ্চয়। ডোবাটার ওপারে কাশের জঙ্গলে, মেয়েগুলোই বেশি। কত আর ডিম পাড়বে? কোনটার বা ঘনিয়ে আসা এই সন্ধ্যায় ডাকতে ইচ্ছা হল। চন্দানি চোখ তুলেছিল আর সেই মুহূর্তে হলদের উপরে হাল্কা ডুরি জন্তুটা ফঁ্যাস করে উঠল। ঠিক লাফ দিয়েছে। চন্দানির চোখের সামনে জন্তুটা একটা ডাহুকীর গলা কামড়ে ধরে আবার এক লাফে কাশবনে ঢুকল। বনবিড়াল।

চন্দানি সেইসব ডাকাডাকিতে, শব্দে, চমকে উঠেছিল, তার বুকের মধ্যে রাখা ছেলেটাও চমকে উঠেছিল, এমন কি তার নিচে পেটের মধ্যেও কেউ নড়ল। একটু হাঁপাতে লাগল চন্দানি। ছেলেটাকে চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে দিতে সে মনে মনে বলল, এ তো আছেই।

সে বরং যে কাপড়ে পিঠের সঙ্গে ছেলেটি বাঁধা ছিল, সেটাকে খুলে মাটিতে বিছিয়ে, তার উপরে বুকের ছেলেটিকে শুইয়ে দিয়ে, বড় ছেলেটিকেও মাটি থেকে তুলে তার ওপর শুইয়ে দিল।

এখন তাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। এক ঘণ্টায় এমন অন্ধকার হবে, ফাতনা চোখে পড়বে না আর। সে বঁড়শিতে টোপ পরিয়ে সন্তর্পণে জলে ফেলল। ওখানে বনবিড়ালের মুখে নির্জীবভাবে ঝুলন্ত ডাহুকীটাকে আর দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সেদিকে চোরা চোখে চেয়ে সে ফাতনার দিকে চোখ স্থির করল। তার ঠোঁট দুটো, সে জানে না, একটু ফাঁক হয়ে আছে। দেরি করা একেবারে চলবে না। দুদিনে যদি জলটা শুকিয়ে যায়, তার আগেই মাছগুলো ধরে নিতে হবে। আর জলটা তাড়াতাড়ি শুকোনোই দরকার। জলের খোঁজ পেলে মাছের লোভে মানুষ আসতে আরম্ভ করবে। আর তখন ছেলে দুটিকে নিয়ে কোথায় যাবে চন্দানি?

হলং ছিপ টানল। ছিপটা ধনুকের মতো হল। বঁড়শি সমেত মাছটাকে কিনারে এনে, ঝপ করে হাঁটু-জলে নেমে, মাছটাকে দুহাতে চেপে ধরে ডাঙায় তুলল সে। অবাক অবাক। হলং-এর দু হাতের মধ্যে মাছটার মাথা ধরা। সেদিকটায় দেখা না গেলেও

লেজের দিকটার ছটফটানি, বাঁকচোর খাওয়া, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠা এ সবেই বুঝতে পারা গেল এটা সেই শোলটা, যেটা তার পোনাগুলোকে নিয়ে ভেসে বেড়ায়। আহা বলতে যাচ্ছিল চন্দানি। কিন্তু জল শুকোনোর গরমটা যেন অনুভব করল সে। মরতে হতই, পোনা সমেত। কতটুকু বা ডোবা! আর এ বনে মানুষ আসলেই বা কি করে চলে? এই বনটাই বা কতটুকু? জলের বাইরে এসে যেমন বনের বাইরে গেলেও কাউকে না কাউকে মরতেই হয়, আর ত পোনা সমেতই। একজনের বদলে আর একজন। কতটুকুই বা সময়? এখনই সন্ধ্যা নামবে, অন্ধকারে পথ দেখা যাবে না, ফাতনা দেখা যাবে না।

*　　　*　　　*

অভিনয়ের কথা যদি বল, কেউ কম যায় না। শুধু গজেন কেন? বোকাসোকা, ল্যাদাড়ে, লেদু মিঞা, এই পরের বোঝা বওয়া হল'নাগা বেশ অভিনয় করতে পারে। বরং গজেনের ভাইপো ফাল্টু অভিনয় করতে জানতো না। তার কষ্ট, কান্না, ভয়, রাগ সব স্পষ্ট আর খাঁটি ছিল। বোধহয় খুব কম বয়স হওয়ার ফল। চন্দানির চাইতেও বছর দুয়েকের ছোট ছিল। চন্দানির যদি একুশ-বাইশ হয়, ফাল্টুর তবে এতদিনে উনিশ-কুড়ি হতো। সেক্ষেত্রে গজেনের পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ হবে। লেদু মিঞার ত্রিশও হতে পারে, বাইশ হলেই বা কে আটকাচ্ছে। হল'ই এ বিষয়ে সবচেয়ে সেরা, এক এক সময়ে তার বয়স এক এক রকম মনে হবে। এটাও তার অভিনয়ের অংশ বলা যায়। জটায় চল্লিশ মনে হলেও, নাগা শরীর দেখে বোঝা যায় না ষোল সতেরো হলো কিনা। কত বয়স থেকে যে সে অভিনয় করছে তাও বলা যাবে না। সে নিজেই চন্দানিকে বলেছে এখন তার মনে হয় জন্ম থেকেই সে এ রকম সন্ন্যাসী। সে সারা ভারতবর্ষ হেঁটে বেড়িয়েছে সন্ন্যাসী হয়ে।

সব চাইতে উঁচু পথের উপরে বনের ধার ঘেঁষে তার সেই কুঁড়ে, যাকে সে এখনও কুঠিয়া বলে। যেন সে হিমালয়ে আছে আর সেখানে সাধনা করে। সেই কুঁড়ে তুলেছে সে মাস ছয়েক আগে। আর কঠিনও হয়নি তোলা। ছন আর কাশের অভাব নেই জঙ্গলে, এমনকি উত্তর প্রান্তে একটা বাঁশ ঝোপও আছে। সেই কুঁড়ের সামনে তার ষাঁড়টা ঘুরে বেড়ায়। যেখানে কুঁড়ে সেখানটায় শেষ পরিত্যক্ত পথটার ফুট পঞ্চাশ চওড়া একশ ফুট লম্বা অংশ এখনও পিচে বাঁধানো। এই অংশটার দক্ষিণে সড়কটা কিভাবে ভেঙেছিল, সেখানে ইতিমধ্যে একটা বন গজিয়েছে। এই বাঁধানো জায়গা ধরে কুঁড়েটার ফুট ত্রিশেক গেলেই বোঝা যায়, কোনো এক বছরের বন্যায় সড়কটাকে সেদিকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিল। সড়কটা সেখানে ফুটফাটা। এক অংশ থেকে অন্য অংশ উঁচু, ফাটলে ঝোপজঙ্গল।

এই কুঁড়ে থেকে কুয়াসা ঢাকা ভোরে একজন গ্রাম্য জেলের মতোই বাঁকের দু-মাথায় দুটো চুবড়ি ঝুলিয়ে সে বর্তমানের সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বেরিয়েছে। এই সময়েই খালি ট্রাকগুলো শিলিগুড়িতে যায় পাহাড়ী তরকারি আনাজের চালান আনতে। চুবড়িগুলো কয়েকদিনের চেষ্টাতেই জল ধরে রাখার উপযুক্ত হয়েছে, গোবর মাটির পুরু প্রলেপ চাঁচারির বুনানির উপরে বসিয়ে। জল ধরে রাখলে ভার বেশি হয়, কিন্তু এসব মাছ বাঁচা থাকলে দাম দ্বিগুণেরও বেশি। হলং-এর পরনে কোঁচা ছাড়া কাছা এঁটে পরা গামছা, গায়ে জলকাদার দাগ লাগা গেঞ্জি। সে ফালাকাটার বাজারই বেশি পছন্দ করে। আধ ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। ফিরতি পথে সে পয়সা বাঁচানোর জন্য খানিকটা হাঁটে, খানিকটা বাসে আসে। সন্ধ্যার আগে ফিরলেই হল। যেন এদিককারই কোন কৃষক যে নিজের ধানক্ষেতে মাছ পেয়ে বিক্রি করে ফিরছে। মাথার জট যেন বা মানতের চুল। শুধু কথার টানে বোঝা যায় পশ্চিমের লোক হলেও হতে পারে। কথায় এখনও ছ-আনা মতো সন্ন্যাসীদের হিন্দি শব্দ আছে বিশেষ ক্রিয়াপদগুলোয়। বাকিটা সে দু-তিন বছরে এ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছে। সে সংগ্রহে যে রাজবংশী আর বাঙালী ভাষা জট পাকিয়ে আছে তা সে জানে না।

পয়সা সে চেনে আর পয়সার জন্যই অভিনয়। প্রথম যখন সে উখুণ্ডির হেলথ-সেন্টারে এসেছিল, তখন সারা গায়ে ছাই মাখা, মাথায় ছোটখাটো একটা জটার চুড়ো, পরনে গেরুয়া ল্যাঙ্গট। সঙ্গে সেই অসুস্থ সঙ্গী। পরে যখন একা এসেছিল নিজেই ষাঁড়ের পিঠে, যেমন রাখালরা মোষের পিঠে চড়ে ঘোরে। সেদিন জটটা কাঁধে বুকে ছড়ানো ছিল। গায়ে ভস্ম ছিল না। ফরসা মুখে উঁচু নাকের দুপাশে বড় বড় চোখ দুটো অসুখে, উদ্বেগে, রাত জাগার ফলে বসে গেছে।

তারপর সে হেলথসেন্টার থেকে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে গিয়ে এই অঞ্চলেই ঘুরে বেড়িয়েছে এই কয়েক বছর। সঙ্গী ছাড়া হয়ে যেন সে পথ চিনতে পারছেনা। কিংবা নিজের মনের কোন গোলকধাঁধায় পড়েছে যা থেকে বেরোতে পারা যায় না। তাতে একদিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। বাঁধানো সড়কটা তো ন্যাশনাল হাইওয়ে, তা এ অঞ্চলের সব শহরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়েছে। ষাঁড়টা বিশেষ শিক্ষিত, সে নিজেও ছাই মেখে সন্ন্যাসী সাজতে বেশ সহজেই পারে। সন্ন্যাসীর মতো চেহারার একজন লোক ভাগ্য গণে দিচ্ছে এমন সুযোগ সহজে আসে না। সে তো বলেই, উকিল, ডাক্তার, বিদইয়ার্থী, শেঠ শেঠানী তার কাছে ভাগ্য গণিয়ে টাকা দেয়।

অন্যভাবেও তার পয়সা উপার্জন হয়। বিশেষ করে সিধে লাভের ব্যাপারে। বিশেষ করে শেঠানীদের খুব পীড়াপীড়ি থাকলে। ভক্তিমতীরা, বিধবা সঙ্গিনী থাকলে ক্ষতি

নেই, নিভৃতে উপস্থিত হলে প্রকৃত নাঙ্গানাগা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে সে। আর সে তার ব্যবসা সম্বন্ধে এত ওয়াকিবহাল যে সহজেই বুঝতে পারে সে অভিনয়টা কোথায় প্রয়োগ করতে পারা যায়।

চন্দানি নিজেই ভুক্তভোগী, সে নিজেই জানে। সেদিন সকালের চায়ের দোকান পাট মিটিয়ে, সে নিজেদের জন্য সেই উনানেই ভাত ফুটোচ্ছে, এখন থেকে আট-ন মাস আগে হবে। অনেক ধোঁয়া উনানে। বাতাস দিয়ে ফুঁ দিয়ে ভাতটা ফুটিয়ে নিতে হবে। ধোঁয়ায় জ্বালা করা চোখ তুলে সে অবাক, ভীত, ত্রস্ত। তার দুহাতের মধ্যে দাঁড়ানো সেই সন্ন্যাসী। নিপট নাগা। দু'পায়ের জোড়ে কিছু রোম, আর কিছু নেই। কিংবা, আরও একবার চোরা চোখে চেয়ে যেমন চন্দানি বুঝেছিল, শিশুর মতো এতটুকু শিশ্ন, মুষ্ক আছে কি নেই। ফুটন্ত ভাতের দিকে তার তীব্রভাবে তাকানো দেখে চন্দানি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'খায়েগা?' উত্তরে সেই নাগা তার হাতের কালো রঙ করা নৌকা আকৃতি পাত্রটা এগিয়ে ধরেছিল। ধোঁযা ওঠা ভাত আর সিদ্ধ হয়ে ওঠা আনাজগুলি চন্দানি সেই পাত্রে ঢেলে দিলে সেই নাগা, 'পুত্রবতী হো!' বলে নিস্তব্ধ দুপুরে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। চন্দানি ভেবেছিল, এখন এই নিস্তব্ধ দুপুর, কুলি, মিস্ত্রিদের কাজ থেকে ফিরতে এখনও ঘণ্টা খানেক দেরি আছে, এই সময়েই কি এই নাগা রান্নাকরা ভাত সংগ্রহ করে এভাবে। এইভাবে নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতায কুলিদের বউদের সামনে?

কিন্তু সেদিন হলংনাগার তুলনায় চন্দানিই ভিতেছিল। নাগা তাকে চিনতে পারে নি কিন্তু চন্দানি, সে চলে যেতে থাকলে তার দিকে চেয়ে, বুঝতে পেরেছিল এ সেই ষাঁড়ের পিঠের সন্ন্যাসী, যাকে এক ঘোর রাতে নদীর ধারেও দেখে থাকবে।

* * *

জঙ্গলের আড়াল থেকে হলংকে ট্রাক থামিযে ট্রাকে উঠতে দেখে নিয়ে, চন্দানি হলং-এর কুঁড়েতে ফিরে এল। ছোট ছেলেটা তো পিঠে বাঁধাই ছিল, বড় ছেলেটাকে ঘুম থেকে তুলে খাইযে নিল সে। এখন সে নিজের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। সারা দিনমানের জন্য কিছু খেয়ে নিতে হবে। রান্না তো সন্ধ্যার পরে হলং ফিরলে। কিন্তু মুস্কিল এই, আজকাল যেন বেশি ক্ষুধা পায়। তা, আজ সে কাগজে লিখে দিয়েছে, দুই আউন্স আইডিন আর চার আউন্স তুলো। আজই দরকাবে লাগছে না বলে কি আর এসব জিনিস যোগাড় করে রাখতে হয না? এই বনে, না হলে, দরকারের সময়ে কোথায় পাওয়া যাবে? একটা বড গামলা কিনতে হবে। একটা বেশ ভাল ধারালো কাঁচিও দরকার। তুলো আরও লাগতে পারে। আস্তে আস্তে এই বনে এসব যোগাড় ক'রে যেতে হয়। এটাতো উখুণ্ডি নয় যে হেলথসেন্টার থাকবে।

সেবারই সেই হেলথসেন্টারে, তখন তো গায়ের ছাই মুছিয়ে দিয়ে ময়লা কপনি পাল্টে সেই সন্ন্যাসীকে হেলথসেন্টারের কাপড়ে চাদরে জড়িয়ে বেডে শোয়ানো হচ্ছে, ডাক্তারবাবু বলেছিল, এ যে দেখছি মানুষের শয়তানি। এরপরে আবার সন্ন্যাসী আরোগ্য পেয়ে চলে গেল, ডাক্তারবাবু ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে বলেছিল, ভাবা যায়? কাঁচা হাতের অপারেশনের দাগ আছে এখনও। মানুষ কি ষাঁড যে এভাবে তাকে বলদ করা হবে!

চন্দানি খানিকটা চিঁড়ে ভিজিয়ে খেল। ঘটিতে বেশ খানিকটা জলের মধ্যে আরও খানিকটা চিঁড়ে ভিজিয়ে রাখল, বড় ছেলেটাকে সারাদিন ধরে খাওয়াতে হবে। তাছাড়া আজ ঠিক করতে হবে কোথায় আজ স্নানটান করা যায়। সে কোমরে ভাঁজ করা কাটারিটা গুঁজলো, ট্যাঁকের কাপড়ে দেশলাই নিল। বনে এ দুটো ছাড়া চলা যায় না। বড় ছেলেটাকে পিঠে ঝুলিয়ে বেঁধে নিল। ছোট ছেলেটাকে এক হাতে বুকে সাপটে ধরে, অন্য হাতে দড়িতে বাঁধা চিঁড়ে জলের ঘটিটা ঝুলিয়ে, সে ধীরে ধীরে উঁচু পথটা থেকে নামতে শুরু করল। বনে চলতে সাবধানে আর নিঃশব্দে যে পা ফেলে সেই বাঁচে।

তা ওটাতো আশ্চর্য কথাই। লেদু মিঞাকে ডাক্তারবাবু যা বলেছিল। দেখ তো, লেদু, মানুষ চেনার কি শেষ আছে? বড লোক দেখেছ, গরিব লোক দেখেছ। বড় লোকের শয়তানি দেখেছ নিশ্চয। দেখ গরিবদের মধ্যেও টাকার লোভ কি রকম। একটা ছেলেকে চুরি করে এনে তাকে কি ভাবে বিকৃত করেছে। স্রেফ ব্যবসার জন্য। এদেশে এরকম এক ধারণা আছে, যা সহজে প্রকাশ করে না কেউ, বড় ধর্ম-সাধক হলে তার পুরুষাঙ্গ লোপ পায়। ওকে সেই অভিনয করায়।

এক কাজ করা যায়, ভাবল চন্দানি, হলং-এর সেই পুরনো ব্রিজের তলায পৌছে তার সেই বন্যার খাতের দিকে এগোলে হয়। সেখানে অনেকটা দূর পর্যন্ত বালি স্তরের উপর দিয়ে জল চলতে দেখা গিয়েছিল। অবশ্যই সাবধানে নামতে হবে, চোরাবালি না-হয়। স্নান করে শুকনো নালা দিয়ে চলতে চলতে দ্বিতীয় পথের উপরে চালতা গাছটার তলায় বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে দুপুরে। সেখানে বেত ঝোপের জন্য উপরের পথ থেকে কিছুই চোখে পড়ে না। সেখানে বসলে, পায়ের কাছে ঘন লতাকুলের ঝোপ। লেদু মিঞা বলেছিল, 'জায়গাটা তোমার দুর্গের মতো দেখং।'

লেদু মিঞা কিন্তু অভিনয় করতো না। সে বলতো সে মনে প্রাণে লেদু মিঞা হতে চায়। 'দেখেন নাই তোমরা, মাটি ছানবার ভালো পাই।'

চন্দানি দেখল পথের ধারে ফুল ফুটে আছে। হলুদ আর বেশ বড় বড় ফুল। সে

অবাক হতে হতে ফুলের বনটা পার হয়ে গেল। তার যেন অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল, একদিন সে চুলে ফুল দিয়েছিল এই বনে।

অবশেষে সে দেখতে পেল, সে যে জায়গাটায় এসেছে যেখানে সব উঁচু পথ আর মাঝারি উঁচু পথ মিশেছে, কিংবা যখন মাঝারি উঁচু পথকে ছেড়ে দেওয়ার কথা স্থির করা হয়েছে, সব উঁচু পথ তখনও বাস চলার মতো হয়নি, এখানে হয়তো তখন ডাইভার্শান তৈরি হয়েছিল। অনেকটা জায়গা এখানে সমতল। ছোট ছোপ ঝোপ এখানে ওখানে। সে স্থির করল, এখানে তার বড় ছেলেটা দৌড়াতে শিখুক। ওর ওটাও কিন্তু শেখা দরকার ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলতে শেখা। অনেক শিখতে হবে। চলতে চলতে ঝোপের কাছে এসে হঠাৎ বাঁদিকের পথটা ছেড়ে ডান দিকে চলে যেতে হবে উপরে। সেখান থেকে দেখতে হবে কতক্ষণে ছেলেটা বুঝতে পারে সঙ্গে মা নেই, দেখতে হবে কতক্ষণেই বা আবার মাকে খুঁজে বার করে, কি ভাবে তা করে। তখন বোধ হয় সেই ঝোপটা যেখানে লুকোচুরি শুরু, সেখানে ফিরে গিয়ে দেখার মতো হয়ে দাঁড়ানো ভালো, যাতে ছেলেটার অভ্যাস হয়—যেখানে পথ হারিয়েছে সেখানে ফিরে এসে চারিদিকে দেখে নিয়ে ঠিক পথ ধর। আর চুপ করে থাকাও শিখতে হবে। মুখ বুজে চলতে হয় না? কোনটা কাঁটা ঝোপ, কোনটা বেত, কোনটা কুল তা জানতে হয়। গাছের গায়ে শুঁয়ো পোকা ছেয়ে থাকে ত, থেকে দূরে থাকা শিখতে হয়।

ত, কিন্তু এখন নয়। স্নানটান সারতে হয়। আজ যেখানে সে যাবে, তার চারিদিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। এমন কি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দূরের মাঠে কৃষককে চাষ দিতে দেখা যায়। কুয়াসা কেটে যাওয়ার আগে সেই জলের ধারে পৌঁছে যেতে হবে। ফিরে এসে ছটুকে কাপড়ের দোলনায় গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে বটুর সঙ্গে খেলা করবে।

শেখাতে তো হবেই। এমনিতেই কাঁদে না, কথা কম বলে। তা এখানে পাখী বল, পোকা বল, বনবিড়াল বল, কিছুই বিনা দরকারে শব্দ করে না। যে আক্রমণ করছে, যাকে ভয় পাচ্ছি, তাকে ভয় দেখাতে শব্দ করা হয়। আর সেই অন্য এক সময়ে, যখন ডাকতে ইচ্ছা করে, কথা বলতে ইচ্ছা হয়।

চন্দানি দাঁড়িয়ে হাত বদলে নিল। চিঁড়ে জলের ঘটিটা ডান হাতে নিয়ে ছটুকে বাঁ হাতে বুকে সাপ্টে নিল। পিঠের উপরে বটুও বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

এখন সময়টা একদিকে ভালো। বড় বড় গাছগুলোর নিচে কুয়াসা কুয়াসা, অন্য জায়গাগুলোতে আলো। তার গায়ে নিশ্চয় ছায়া পড়ছে। এটাও বটুকে শেখানো দরকার। সেও মাত্র কয়েকদিন আগে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। হলংকে দেখেই

সে বুঝেছে। হলং বোধ হয় বুঝতে পারেনি। হলং আসছিল। ঝোপগুলোর যেদিকে সূর্য তার উল্টোপাশে হাঁটছিল হলং। ছায়া পড়ছিল তার গায়ে নানা আকারের। সেদিকে চোখ থাকলেও চন্দানি বুঝতে পারেনি কেউ তার দিকে আসছে, যতক্ষণ না হলং আটদশ হাতের মধ্যে এসে গিয়েছিল। হলংকে বলতে হবে ছায়ার ডোরা ডুরি গায়ে থাকা ভালো।

সেই রকমভাবে গায়ে ছায়া মেখে মেখে এগোতে এগোতে ভাবল চন্দানি হলং-এর এটা কি তা কিন্তু বোঝা যায় না। কেন সে এই বনে? মাছ ধরা আর তা বিক্রি করা সে তো বড় জোর আর আট-দশ দিনের ব্যাপার। নাকি তার ষাঁড় দিয়ে ভাগ্য গণে দেয়া এখন এ অঞ্চলে এত পুরনো, যে গণনা যাদের মেলেনি তাদের সংখ্যাই বেশি হওয়াতে, আর কেউ গণিয়ে পয়সা দেবে না? আর শেঠানিদের সামনে, কোনো কোনো অন্ধবিশ্বাসী পুরুষের সামনে, একেবারে নাঙ্গা হয়ে দাঁড়ানোর মধ্যে আর চমকানি নেই। তার সেই বিশেষ ব্যাপারের গল্প মেয়েদের এ কান ও কান হতে হতে পুরুষদেরও অনেকে জেনে ফেলেছে। ওর ব্যবসাটা আর নেই, তবু কেন এ অঞ্চল ছেড়ে যেতে পারছে না? পথ হারানোর কথার কোন মানে হয় না। তার কি কোথাও যাওয়ার আছে? সব পথই তা হলে সমান হয় না? তা না হলে বলতে হয়, সে নিজের মনের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে? সেখান থেকে বেরোতে পারছে না? সেই অবস্থাকেই কি উদাস হওয়া বলে? ভয় নয়, কষ্ট নয়, অনেক ভয় পেয়ে, কষ্ট পেয়ে যে অবস্থা হয়, তাকেই কি উদাসীন বলে?

উদাস কথাটাই চন্দানিকে উদাস করে দিল। কিম্বা তাকে কুয়াসার মধ্যে মধ্যে কিছু চকচকে আলোর স্বচ্ছতাও বলে বোধ হয়।

এটা অন্তত অভিনয় নয় হলং-এর। আর ভয়ও নয়। অভিনয় তো সেই উথুণ্ডি ড্রামাটিক ক্লাবের, যার অভিনেতা গজেন। তখন তো সে সড়ক দিয়ে চলা ট্রাক বাস থামিয়ে, বিয়ের শোভাযাত্রার ট্যাক্সি আটকে, তার ড্রামাটিক ক্লাবের জন্য টাকা আদায় করছে সে। আব তারই নাকি আবার ভয়, তাও সরিতের মতো রোগা চেহারার এক মানুষকে।

সতী একদিন টিফিন পিরিয়াডে, টিপকলের জল খেতে গিয়ে, চন্দানিকে ডেকে নিয়ে অন্যদের থেকে দূরে সরে গিয়ে, বলেছিল, 'সরিৎ নাকি বলেছে ও নাটক কাকে বলে তাই জানে না। চেঁচানো নাকি নাটক নয়। তা ছাড়া ওই বেঁটে কালো রঙে কৃষ্ণ হওয়া চলতো, কিন্তু অত কর্কশ গলায় তা হয় না। বেঁটে, নাক মোটা, ওর পক্ষে নাটক করতে এখন লেনিন, গিয়াপ, হিটলার এসব সাজাই ভালো। তা ও বলেছে সরিৎকে বুঝিয়ে দেবে নাটক করা কাকে বলে। তুই কি বলিস?'

সতীর কথা তখনও শেষ হয়নি। সে কাঁদো কাঁদো মুখে বলেছিল, 'লোকে নাকি অনেক রাতে ওকে আর আমাকে পুরনো ইটভাটায় দেখেছে। সে তো নাটকের—'

চন্দ্রানি তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'আমি জানি না।'

সতী হঠাৎ রেগে গিয়ে বলেছিল, 'ভারি দেমাক তোর, না? চরিত্র বুঝি?'

সতীর ভাব দেখে মনে হয়েছিল, এর পর থেকে সতী ড্রামাটিক ক্লাবের রিহার্সালে রাত কাটাতে, আপত্তি করবে না। স্থূল মনে হচ্ছিলো তাকে।

কিন্তু সেই ড্রামাটিক ক্লাব ভালো করে, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ইলেকশন এসে গিয়েছিল। আর ভোটের দিনই গজেন সরিংকে বুঝিয়ে দিয়েছিল নাটক কাকে বলে।

দূরে বালিই চক্‌চক্‌ করছে। আর বালির মধ্যে বেশ বড় বড় কয়েকটা পাথর। সেই কত বছর আগে কে জানে, বন্যা থেকে সব চাইতে নিচের পথটাকে বাঁচাতে বোধ হয় পাথরের বাঁধ দিয়েছিল। ছোটগুলো কোথায় ভেসে গিয়ে বালির কত নিচে তলিয়ে গিয়েছে কে জানে। এই বড় কয়েকটাকে সেই জলের ধাক্কাও নড়াতে পারে নি। এগুলোর কাছাকাছি জল থাকলে বেশ ভালো হয়, তা মানসাই কিংবা হলং-এর হোক।

পাথরগুলোকে লক্ষ্য করে সে ধীরে ধীরে ঘোরাপথে নামতে লাগল। এরকমই বোধ হয়, সব ব্যাপারেই হয়ে থাকে। খুব শক্ত বাঁধেরও শুধু কয়েকটা শক্ত পাথর অবশিষ্ট থাকে। উদাস হয়ে মুখ তুলল চন্দ্রানি দূরের সেই বালির দিকে, যেখানে যেন একটা প্রাকৃতিক ঘাট।

আর ঠিক তখনই একটা গাছের ছায়া যেন কালো হয়ে তার গায়ে পড়ল। দুর্গন্ধে নাড়ি যেন উলটে আসবে। সে যেন দেখতে পেল স্পষ্ট, একটা কাছিম চিত হয়ে মরে আছে, আর তার পেটের কাছে অনেকখানি খুবলে খাওয়া। ভন্ ভন্ করে যে মাছি উড়ছে, তার কয়েকটা যেন উড়ে এসে তার গায়ে পড়ল। আঁচলে ছেলে। মুখে আঁচল চাপা দেওয়ার উপায় ছিল না। দম বন্ধ করে সে তাড়াতাড়ি বাঁধের অবশিষ্ট পাথরগুলোর দিকে হাঁটতে লাগল, চোরাবালিতে পড়বে কি না তা ভাবার সময় হল না।

সেই বড় পাথরগুলোর কাছে জল আছে বটে, পায়ের পাতা ডোবে না। আর খানিকটা বালি পেরিয়ে গেলে ছোট ছোট অনেক পাথরের মধ্যে ঝর্ণার মতো একটা মৃদু স্রোত চোখে পড়ছে বটে। চন্দ্রানির মনে হল, সত্যি ওখানে একটা চিত হয়ে থাকা কাছিমের খোলা সে দেখেছে। সে নিজে নিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, ওটা, পাথরের ধার ঘেঁষে জলের মধ্যে এখনই যেটার মাথা দেখা গেল, সেটা জলঢোঁড়া নয়, কুচলে মাছ।

কিন্তু স্নানের ব্যবস্থা না করে, সব চাইতে বড় পাথরটার উপরে সে বসে রইল। সে

ভাবল ; গজেন, গজেন ঢালি বললে বলা হয় না। সে তো মানুষের নামই। নতুন কোন নাম দিতে হয়। বাঘিলা, দুশমন্ এসব বললে তবু কিছু হয়। কিংবা শুধু 'হাঁও' বলা যেতে পারে।

তখন সেই 'হাঁও' ফিরে এসেছে পুলিশের গাড়িতে। ডাক্তার ছুটিতে চলে গিয়েছে। হেলথসেণ্টারে তখনও পৃথিবীর সব চাইতে বোকা রোগীরা দু একজন মাত্র আসছে। সদরে ওষুধ আনতে গিয়ে কম্পাউণ্ডার শুনে এল, ডাক্তার নাই, তার ওষুধ। ডাক্তার এলে ওষুধ নিতে আসবেন।' দু মাস বেতন না পেয়ে সদরে তদ্বির করতে গিয়ে নার্স শুনে এল, 'আপনাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্টে কি সব গোলমাল আছে। সেসবের তদন্ত হচ্ছে। শেষ হলে বেতনের কথা।'

ক্রমে জানা গেল উখুণ্ডি ড্রামাটিক ক্লাবের সেক্রেটারি নিজে এসে বলে গিয়েছে ওই হেলথসেণ্টারে গোড়া থেকে গলদ। যেখানে হওয়া উচিত ছিল সেখানে না হয়ে দু-তিনটি গ্রাম ডিঙিয়ে গিয়ে হয়েছে উখুণ্ডিতে। কম্পাউণ্ডার কম্পাউণ্ডিং পাস বটে, কিন্তু চোর। হেলথসেণ্টারের ওষুধ নিজের দোকানে বিক্রি করে। আর নার্স? প্রাইমারি পাস নার্স এযুগে হয়? হতে পারে, সদরে হাতে কলমে দশ বছর কাজ করেছে বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে, তারপরে উখুণ্ডির পোস্টিং। কিন্তু সদরের থেকে গ্রামে যেতে হয় কেন? পালাতে না ঢাকতে? কোন সি এম ও সুন্দর মুখ দেখে ভুলেছিল বলে, আর কোন এম এল এ-র দূর সম্পর্কের শালী বলে কি সরকারি চাকরি হয়? আরও শোনা গেল, হেলথসেণ্টারের মেরামত ইত্যাদির জন্য কোন বরাদ্দ নয়। শুনছি, এ বছর আর তার পরের বছরও উখুণ্ডিতে বেশ বড় একটা কালচার সেণ্টার হবে, ওপন এয়ার থিয়েটার-টার হবে!

চার মাস বেতন না পেয়ে, প্রথমে কম্পাউণ্ডার পরে নার্স গিয়েছিল গজেনের কাছে। নার্সকে বলেছিল সে, 'তুমি পালাও নি, ডাক্তারবেটা তো ভেগেছে। সাক্ষী দিয়েছিলে তা মনে হচ্ছে? ফাঁসি হয়ে গেলে আজকে তদ্বির করতে আসতে পারতে? মাইনা আমি বন্ধ করেছি, আমি পাইয়ে দিতে পারি। শর্ত আছে। কম্পাউণ্ডারের বাড়ি হয়েছে এখানে শুনেছি, সেখানে সে উঠে যাক। তার কোয়ার্টারে তুমি যাও। তোমার কোয়ার্টার ছেড়ে দাও, আমাদের ড্রামাটিক ক্লাব হবে।' একটু থেমে সে আবার নাকি বলেছিল, 'কিংবা তুমিও আমাদের ক্লাবে এসো না কেন। চেহারা তো বেশ মাল-মাল এখনও। বুক উঁচুই। মাদারটাঙ্গারের পার্টে মানাবে।'

নার্সের কোয়ার্টারে সেই থেকে রিহার্সাল শুরু। সত্যি সত্যি কম্পাউণ্ডার আর নার্সের বেতন এসেছিল সদর থেকে। সেই হাঁও দুশমনের ক্ষমতা বোঝ।

মাস তিনেক পরে নার্সই বলল একদিন, 'আর পড়ে কি হবে?'

'চাকরি করব।'

'চাকরি কোটে পাইস!'

'তবে?'

'বিয়াও দেই।'

নার্স বলেছিল আঠার বছর বয়স হতে চলল। চন্দানির। এখনও ম্যাট্রিক, হায়ার সেকেণ্ডারি পাস, ততদিন কি পড়ানো সম্ভব হবে? আবার বেতন বন্ধ হলেই হল।

চন্দানি হেসে বলেছিল, 'কাঁয় এমন সুপাত্র?'

নার্স বলেছিল, 'কেন গজেন ঢালি কি এমন অ-পাত্র?'

বল, এর পরে তাকে মা বলা যায়? নিজের চাকরির জন্য, নিরাপত্তার জন্য যে মেয়েকে গজেনের মতো লোকের হাতে দিতে চায়?

চন্দানি বলেছিল, 'আর একবার যদি সেই খুনীর নাম করো গলায় দড়ি দিম্। নয়তো হলংএ পানি আছে।'

কিংবা তক্ষণই হয়তো মা আর বাচ্চা, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু কিংবা ফাঁদ। পা বাড়িয়ে জলের নিচের বালির দৃঢ়তা পরীক্ষা করে নিয়ে চন্দানি বড় পাথর থেকে নামল। সেই রাতে রিহার্সাল শেষে সকলে চলে গেলে নার্স কি দরজা দিতে ভুলে গিয়েছিল,? কিংবা দরজা খুলে দিয়েও ভাবতে পারেনি সেরকমটা ঘটতে পারে? কিংবা সে কি তখন ঘরে ছিলই না, কিংবা তার প্রথম আর্ত চিৎকারে সেই নার্সের ফোঁপানি কান্না শোনা যায় নি?

পশু নয় তা বোঝা যাচ্ছিল, পশুর হাত থাকে না, ভূত নয় বোঝা যাচ্ছিল ভূতের জাপটে ধরাও তা বাতাসের ধাক্কার মতো হওয়া উচিত, তার ঘুমের মধ্যে নিজের শোবার ঘরের বিছানা থেকে যা তাকে তুলে নিচ্ছিল সে ভাবে, তা পশু, ভূত, মানুষ মিলে একটা আতঙ্ক যার সীমা থাকে না। হাত, পা, ছুঁড়ে, আঁচড়ে, কামড়ে তাকে এড়ানোর উপায় ছিল না। যারা তাকে ধরে নিচ্ছিল, ঘরের বাইরে মাঝরাতের তারার আলোতে তাদের চেনা যাচ্ছিল না। সে তখনও নিশ্চয় বাঁচাও বাঁচাও এসব বলছিল, আর তখনই ভয়ঙ্কর একটা চড় খেয়ে বোধ হয় সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সে বোধ হয় শুনেছিল— ফালটু আর চেঁচালেই গলা টিপে দিবি।

হয়তো সারারাত সে সেই অপরিচিত ঘরে অপরিচিত বিছানায় উপুড় হয়ে মারের ভয়ে দম বন্ধ করা নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শেষে চোখ মেলেছিল। ঘরে একটা হারিকেন ছিল। তা মাঝ রাতও হ'তে পারে। হঠাৎ যেন সে নতুন করে অনুভব করেছিল পাশে কারো নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল।

পালাতে পারলে হয়, দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে হয়। কিন্তু সে আবার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, কাঠে মাথা ঠুকে জ্ঞান হারাচ্ছিল সে, তারই মধ্যে বোধ হয় কাউকে কামড়ে ধরেছিল, কিন্তু সম্বিত পেতে পেতে বুঝতে পেরেছিল অসহায়ভাবে চিত হয়ে আছে সে, আর কেউ তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, খুবলে খুবলে খাচ্ছে।

চন্দানি জলের ধারে পৌঁছে দেখল জলটা সত্যি পরিষ্কার, তলায় কাদার বদলে বালিই বটে। সে কিনারায় বসে এক এক করে সেই ঠাণ্ডা জলে ছেলে দুটোকে স্নান করালো। কিনারায় বালিটা শুকনো, তার উপরে সকালের রোদ। জল থেকে কিছু দূরে ছেলে-দুটিকে বসিয়ে বটুকে বলল, ছটুর হাত ধরে রাখতে হামা দিয়ে জলে না আসে।

জলটা হাত পনেরো চওড়া, মাঝখানে এক কোমর হতে পারে। এত ভালো জল সে সাত-আট মাসের মধ্যে পায়নি। বর্ষার পরে অনেকদিন জল এত স্বচ্ছ হয় না। সে ঠিক করল আজ একটু ভালো করে স্নান করবে। শাড়ি কিনারায় রেখে সে জলে নামলো। ছেলেদের দিকেই কিন্তু মুখ রাখতে হবে। জলের কাছে তো।

পরের দিন কিংবা তার পরের দিন সকালে গঞ্জেন বাখিলা বলেছিল, 'এখন আর কোথায় দড়ি, কোথায় হলং-এর জল। এখন তো তুমিই বউই আমার। সোমবারে, তুমি রাজি হলেই, সদরে গিয়ে রেজিস্ট্রি করব। আর চন্দ্রমণি, (নাকি তোমার নাম চন্দ্রারানী ?) তুমি হবা আমার সব সেরা হিরোইন। নাকি আরও পরে রেজিস্ট্রি করবা, পেট হলে ? তুমি এত সুন্দরী তা নিজেও জানতা না।' সেই হাঁও খল খল করে হেসেছিলো।

এক কোমর জলে একবার ডুব দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে জল তুলে তুলে গা ঘষতে লাগল সে। সাত আট মাস সে সাবান ব্যবহার করছে না। আয়নাও তখন থেকেই একবারও মুখের সামনে ধরে নি। সে হেঁট হয়ে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে চেষ্টা করল। গায়ের রং পিতলের মতো হয়েছে। মুখটা একটু শুকনো। চুল খয়রা খয়রা। পেটের থেকে নিচে হাঁটু পর্যন্ত বেশ ফরসাই এখনও। বুক দুটো আবার কি একটু বেশি গোল আর বড় হচ্ছে। পেটটা, দেখ, নাভির নিচেই এরই মধ্যে উঁচু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, চন্দানির চোখের নিচেই, কেউ যেন হাত পা ছুঁড়ল! সে তাড়াতাড়ি হাতের তেলো রাখল পেটে। মনে মনে বলল, এই ঠাণ্ডা জল শীত লেগেছে। সে কম জলে সরে এসে, পেট জলের উপরে জাগে, এমন জায়গায় রোদে দাঁড়াল।

এমন সুন্দর জল আর এমন মিঠা রোদ। হলংকে বলতে হবে সে যদি স্নান করতে চায়।

স্নান শেষ করে উঠতে গিয়ে তার মনে হল, শাড়িটাকেও ধুয়ে নিলে হতো। তিনমাস

হয় কেনা হয়েছে। দু-একবার ভিজে অবস্থায় গায়ে শুকিয়েছে। কয়েকদিন আগে রাতের অন্ধকারে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়েছিল, সে কিন্তু পরিষ্কার জলে নয়। নাই থাকল সাবান। এ জলে ধুলে শাড়িটা থেকে অনেক ময়লা মাটি, অনেক ঘাম ধুয়ে যাবে। সে শাড়িটাকে জলে দাঁড়িয়ে বেশ ভালো করে কেচে নিল। পরে ভিজে চুল বুকে ফেলে, পিঠে ছটুকে গামছায় বেঁধে, কাঁধে ভিজে শাড়ি, এক হাতে বটুর হাত, অন্য হাতে জল-চিঁড়ার ঘটি ঝুলিয়ে সে বনের দিকে চলতে শুরু করল।

সেই মাছি ভন ভন দুর্গন্ধের জায়গাটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কিছু দূর থেকে হলেও সেই কাছিমের খুবলে খাওয়া তেমন খোলাটা আবার চোখে পড়ল। বরং আগের চাইতে একটু বেশি দেখল সে। খোলাটার কাছাকাছি হাড়গোড়, যেন চিবিয়ে ফেলা কাঁকড়ার খোলা। আশ্চর্য! কিন্তু বনবিড়াল ছাড়া বড় জন্তু আর কি থাকবে এই বনে? শিয়াল কি তেমন করে কাঁকড়া কাছিম খায়? থু থু ক'রে থুথু ফেললো সে।

একবার তার নিজের শরীরের দিকে চোখ পড়ল। এই নির্জন বনে পশু আর পাখী ছাড়া কি আছে যে লজ্জা হবে! তা ছাড়া বনে ঢুকে পড়তে পারলে কোমর সমান ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলার জন্য বেশি বুদ্ধি করতে হয় না। তা ছাড়া সূর্য আর একটু উঠলে, মাথার উপর থেকে ডালপালা পাতার জালি জালি ছায়া নকসা নকসা হয়ে গায়ে পড়তে থাকবে। সে কিন্তু নকসাদার শাড়ি বলে মনে হয় দূর থেকে। তা ছাড়া এখন বনে কেউ নতুন এলে, পাখ-পাখালির ডাকাডাকিতে তখনও একদিকে মন দিয়ে দেখতে পাবে না। আর মানুষের চোখে পড়ে গেলে বনের আড়ালই ছেড়ে যেতে হবে, শাড়ির আড়ালে কত লুকানো যায়। অথচ শাড়িটাকে ঝোপের উপরে মেলে শুকিয়ে নিতে পারলে, অনেকদিন পরে ধোবাবাড়িতে ধোয়া শাড়ি পরার স্বস্তিটা পাওয়া যাবে।

সে রকম করে চলতে চলতে সে একবার ভাবল, বড় পাথরটার তলার কুচলা মাছটাকে ধরে পুড়িয়ে নিলে হতো। দেশলাই আর কাটারি তো হাতের মুঠোতেই আছে। কুচলা না হয়ে জলঢোঁড়া হলেই বা ক্ষতি কি। সে একবার থুথু ফেলল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে বলল, লেছমিঞা বলেছিল, সব সময়ে পাখ-পাখালি ধরা যায় না, মাছও কি সহজে পাওয়া যায়, তখন মেটে আলু পেলে যথেষ্ট, সাপ পোড়াতে পারলেও গায়ে জোর থাকে।

এখন কিন্তু পাথরের চাতালের মত পরিষ্কার, সেই মেজ উঁচু রাস্তার টুকরোটাতে, চালতা গাছের নিচে রোদ এসে যাবে, সেখানে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে।

বনের এ মাথা থেকে ওমাথা চলে বেড়াতে পরিশ্রম হয় না ? ছেলে ছুটো ঘুমিয়ে নিতে পারবে। ছুপুরে সেই ডোবা থেকে মাছ ধরে নিলে হবে। কুচলার জন্ম দুঃখ কি ! আঁশ ছাড়া মাছ কি এক রকমের ? গোটা দুই মাগুর-সিঙ্গি পেলেই চলবে। সে যেন কল্পনাতে সেই সুস্বাদ পুষ্টিকর আহার্য দেখতে পেল। কাটারির একটানে মাছের পেট চিরে সাফ করে, মাটির প্রলেপ দিয়ে সেটাকে আগুনে ফেলে দিলেই হল। ধিকি ধিকি আগুনে পুড়ে মাটি সব দিকে লালচে হয়ে উঠলেই রান্না হল।

পথটা সমতল। বটুর হাত ছেড়ে দিয়েছিল সে। বটু কখনও পাশে হাঁটছে, কখনও ছুপা পিছনে পড়ছে। বটু পথের ছুদিকেই দেখে দেখে হাঁটছে। চন্দানির মনে হল, আজ থেকেই পথ চিনতে শিখালে হয়। সে নিজেতো এ ঝোপ থেকে ও ঝোপ লুকোচুরির ভঙ্গিতে চলেছে। বড় হওয়া দরকার নয় ? বড় হতে হলে, এখন থেকেই চেষ্টা করতে হয়। বটু বড হলে সঙ্গী হয়। এরকম একা একা চলতে হয় না। এক জোড়া চোখের বদলে দু জোড়া চোখ হয়। শত্রু দুশমনের সামনে একজন পুরুষ থাকলে সুবিধা হয়। তার কিন্তু অনেক দেরি আছে। ষোল-সতরোতেও পুরুষ হয়ে উঠতে দ্বিধা থাকে। ফালটু—

চন্দানির পাশে বটু নেই। পিছন ফিরে দেখলো, কিছু নিচে হাত দশেক পিছনে দাঁড়িয়ে সে কিছু দেখছে তার কয়েক হাত দূরের ঝোপটাতে। চন্দানি একটু লক্ষ্য করেই বুঝতে পারল, সেটা কোন জন্তুর লেজ। মৃদু মৃদু সেই পাঁশুটেতে হাল্কা ডোরা লেজটা নড়ছে। বনবিড়াল হবে। ঝোপের মধ্যে কোন পাখী আছে হয়তো। বনবিড়াল মানুষকে ভয় পায়, তা হলেও অত ছোট বটুকে তো আঁচড়েও দিতে পারে। এদিকে কিন্তু বটু খেয়াল করছে না, মা কোথায়। একটা ঢিল তুলে নিয়ে চন্দানি ঝোপে ছুঁড়ে দিল। যা আশা করেছিল তাই হল। বনবিড়ালটা লাফিয়ে উঠে, বটুর বাঁ দিক দিয়ে ছুটে পালাল। বটু ভয় পেল। আরও ভয় পেল যখন দেখল মা কাছে নেই। সে নাক বরাবর টাল-মাটাল করে ছুটে, চন্দানিকে পার হয়ে যায় আর কি, তখন চন্দানি একটা হাত বাড়িয়ে ঝোপটাকে নাড়াল। বটুর কাঁদো কাঁদো মুখে হাসি ফুটল।

এখন অবশ্য এই খেলার সময় নয়। খেলতে হলে পিঠে ছেলে রাখলে চলে না।

কিন্তু ভাবো এই বটু সঙ্গী হবে ! ফালটু ষোল সতরোতেই যেন বুঝতে পারছিল না সে পুরুষ-সঙ্গী।

* * *

আশ্চর্য কিন্তু ! চন্দানি মনে করতে পারে না সেটা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিনের বিকেল। ভাবতে গেলে একটানা এক দিনরাতের কথা মনে হয়। সে মনে করতে

পারে না, এই তিন চার দিন সে খেয়েছিল কিনা, কি খেয়েছিল। কিন্তু স্নানটান মানুষকে না খেয়ে থাকলেও করতে হয়। বোধহয় ঘুমও তাই। মাঝে মাঝেই ভেঙে গেলেও, আদৌ ঘুমাই নি এরকম মনে করলেও, মানুষ ঘুমিয়ে থাকে কিছু সময়। ফালটু বোধহয় বলতো, খাও, না-খেলে সে, সে তো মার্ খাবেই, ফালটুও বোধহয় বাঁচবে না। সেই বলে থাকবে, স্নানটান করো, নতুন কাপড় দড়িতে, পরো। ভাবো যদি তোমাকে আমাকে চাবকায়।

সেটা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দিন, বিকেল কিংবা সন্ধ্যার আগে আগে। কি ভাবছিল সে নিজে, তা এখন মনে করা যায় না। ফালটু এসে বলেছিল, (তার চোখ ফেটে বেরোচ্ছে যেন, হাঁপাচ্ছে কথা বলতে) 'পলাবে? পলাও। এ সুযোগ আব পাবা না। পলাও যদি দেবি করোনা। এক বস্ত্রে পলাও।'

কোথায় সে পালাতে পাবে? হেলথসেণ্টার? পুলিস ফাঁডি? উধুণ্ডির কোন বাড়ি? তার বোধহয় এসময়েই একবার মনে হয়েছিল, এই শরীরের বাইরে পালাতে পারলে হয়, শরীরটাই তো গজেন দখল করে রাখবে যতদূরে যাও। একা স্ত্রীলোক, একবস্ত্রে!

কিন্তু সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। আর তখন ফালটু ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, দেখো উত্তরেই যাও দক্ষিণেই, ওবা কিন্তুক বাসের পথ খুঁজবি। মাঠ বরাবর চলে যায়ে যে ইষ্টিশন, সেখানে ট্রেনে উঠো। যে ট্রেন প্রথম পাবা, উত্তরের হোক দক্ষিণের হোক।'

বাড়িটার পিছন দিকের পথ দেখিয়ে দিয়েছিল ফালটু। বলেছিল মাঠ পার হতে হতেই রেল লাইনেব উঁচু পাহাড দেখতে পাবা। লাইনে উঠে পডবা।

সে অন্ধকারে রেল লাইন বরাবব ছুটছিল। সেই সময়ে ফালটু পিছন থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে তাব কাছে পৌঁছেছিল।

ফালটু তা হলে কি নিজের পালানোব পথটাই তাকে বলে দিয়েছিল? তার পালানোটাও কম দবকার ছিল না তা হ'লে। স্টেশনে পৌঁছে প্রথম ট্রেনটা ছিল আসামের আর টিকিট কেটে তাতেই উঠে বসেছিল তারা। কোথায় যাবে, কতদূর যাবে তা নিশ্চয় ঠিক ছিল না। ফালটুর সঙ্গে ব্যাগ ছিল। তা থেকে টাকা দিয়ে সে টিকিট কিনেছিল বঁগাইগাঁও-এব। পরে বলেছিল একদিন সে, ও নামটা জিভে এসে গিয়েছিল। ব্যাগ, আর ব্যাগে টাকা দেখে বোঝা গিয়েছিল, সে পালানোর জন্য তৈরি হচ্ছিল আগে থেকেই। কিন্তু তার সাহস ফুরিয়ে আসছিল। ট্রেনের মেঝেতে বসে সে ছটফট করছিল। বঁগাইগাঁও আসতেই, সে তাড়াতাড়ি নেমে পড়েছিল। সেই ভোর ভোর রাতে সেই অজানা জায়গায় কোথায় যেতে পারে সে? চন্দানিই বা কোথায় যেতে পারে? একা এক মেয়ে?

পুলিসকে সব বলে সাহায্য চাইবে ? সেটা তো আসাম। সেখানে উখুণ্ডি ড্রামাটিক ক্লাবকে পুলিস হয়তো ততো মানে না।

সেটা কিন্তু একেবারে যোগাযোগ। চন্দানি ভাবল। এই যোগাযোগ বারবারই কিন্তু ঘটে। কোনটা ঘটনা আর কোনটা তার কারণ, এই ভেবে জীবন চলে না। কিংবা বলা যায়, সে রকমভাবেই জীবন চলে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য অনেক লোকের ভেবে চিন্তে করা কাজের স্রোতে নাকানি চোবানি খাও, নিজে ভাবার সময় পাওনা।

স্টেশনের একদিকে খুব ভিড়। সেই ভিড়ের প্রান্তে একগলা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসেছিল চন্দানি। আর ফালটু বসেছিল ভিড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে, যাতে বাইরে থেকে চট করে কেউ তাকে না দেখে। এক সময়ে ফালটু এসে বলেছিল, জানো এরা সব, এই হাজার হাজার মানুষ, পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিশু, পালাচ্ছে। ওরা বলাবলি করছে, পালিয়ে পালিয়ে এখানে এসেছিল, আবার এখান থেকেও পালাচ্ছে।

চন্দানির আর ফালটুরও সে সময়ের হতবুদ্ধি অবস্থা। এ থেকেই বোঝা যায় তারা এই অবিরত পলায়মানদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। কোথায় কবে কাদের পালানো শেষ হবে, পিছনে একটা কালো 'হাঁও'-এর ছুটে ছুটে আসা বন্ধ হবে, এ তারা ভেবে উঠতে পারে না। সেই পালানোর দলের সঙ্গে তারা আবার ট্রেনে উঠে বসেছিল। আর তাদের মধ্যে এক বছর কেটে গিয়েছিল।

সে সময়ে একদিন চন্দানি ভেবেছিল, তাকে সে ভাবে সাহায্য করার কারণ কি এই, যে ফালটু হেলথসেণ্টারে গিয়েছিল গজেনের সঙ্গে, সেই অপরাধ কমাতে চায় ? সে পালানোর দলের সঙ্গে আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে উদ্বাস্তুদের কুঁড়ে আর তাঁবুর শহরে পৌঁছে অবাক হয়েছিল চন্দানি, যখন ফালটু তার ব্যাগ থেকে চন্দানির শাড়ি আর জামা বার করেছিল। তা হ'লে তো ধরে নিতে হয়, ফালটু আশা করেছিল উখুণ্ডির কাছে সেই প্রথম রেলস্টেশনেই চন্দানির সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে। তা হ'লে কি এ রকম বুঝতে হবে, গোড়া থেকেই ফালটু তাকে নিয়ে পালাতে চাইছিল। কিন্তু কতই বা টাকা তার ব্যাগে থাকতে পারে ? নিতান্ত ছেলেমানুষ ছাড়া কেউ কি ভাবতে পারে, সহায় সম্বলহীন, উপার্জনদক্ষতাহীন দুজন মানুষের সারা জীবন ব্যাগে ক'রে লুকিয়ে আনা কয়েকটা টাকায় চলে যাবে ?

তাদের তখন সেই অবস্থা যখন ছনের বেড়ার, ছনের ছাদের, কোদালে চেঁছে ঘাস তুলে ফেলা মাটির মেঝের আট হাত লম্বা ছয় হাত চওড়া অন্ধকার ঘরের মেঝেতে, খেজুর পাতার দুখানা চাটাই সম্বল করে, সাধুসন্তদের বিলানো খিচুড়ি খেয়ে, দিন কাটানোকে আশ্রয় বোধ হচ্ছিল।

সেখানে দিন পনরো থাকার পরে ফালটু একদিন রাতে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওরা জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে আমার, আমি তোমার কে ?'

'—কি কইছ ?'

—'না কয়ে না-শোনার মতো সরে সরে যাই।'

দিন সাতেক পরে ফালটু বলেছিল আবার, 'কাল পরশু থেকে ওবা নামে নামে র‍্যাশান কাড দিবে। নাম ধাম বলা লাগবে, সম্বন্ধ বলা লাগবে। তোমাকে পড়শীরা জিজ্ঞাসা করে না ? কি কইছো ?'

না বললে ধরা পড়তে হয়, বললে ধরা পড়তে হয়। নিজের চাটাই-এর উপরে ছট্-ফট্ করতে করতে ফালটু বলেছিল, 'কি কবো ? কাকিমা হও ? কাকা গাড়ি চাপায় মরেছে।'

সে রাতে এতটুকু যদি ঘুম হয় ! ঘুম কবেই বা হতো ?

ফালটু বলেছিল ফিস্‌ফিস্ করে, 'হোক নিজের জিফ, তার পিছনের চাকার নিচে ওভাবে চাপা পড়ে গেলে কেউ বাঁচে না। ট্রাক বাস থামিয়ে চাঁদা তোলা তুলে যে টাকা তাই দিয়ে সেই জিফ। পুরনো, লজঝড়। বলে ড্রামাটিক ক্লাবের জিফ ছাড়া নাম হয় না। স্কুলে পড়ার সময়ে পালিয়ে ট্রাকের ক্লিনারিও করতো তো। তাতেই গাড়ি চালাতে শেখে। মেরামত করারও চেষ্টা করতো। সেদিন-বৈকালে কয় পিছনের চাকায় কি টাইট দেয়া লাগবে। জ্যাক দিতে কয়, জ্যাক দাঁড় করানোর জন্য ইট দিতে কয়। পুরনো জ্যাকটা ঝাঁকি খেলে সিলিপ করে, তা তো জানতোই। জ্যাক হাতে নিয়ে বোঝা যায়, সেটা নতুনটা না। ইট হাতে করলেই বোঝা যায় সেটা জলচ্যাপ্পা, চাপ পড়লে গুঁড়া হয়। তা ইট গুঁড়া হল, ঝাঁকি খেয়ে জ্যাক্ সিলিপ করে পিছনের চাকা গায়ে চেপে বসল। তখন আর মানুষ বাঁচে না।'

বেশ খানিকটা পরে ফালটু আবার বলেছিল, দেখ, ঘুমালে, কাকি ? উখুণ্ডিতে বিড়ির ফেকটারিতে লোক নেয় শুনে আসছিলাম। উন্যাক পুলিশ ধরলে বিড়ি বাঁধতাম। বিশ্বাস করে না। কয় উন্যার ফাঁসি হবে সেই ভরসায় বাড়িটার আশায় আসছিলাম। সেই রাগ। বাসন মাজতাম, রান্না করতাম, আঁইটা খাতাম। পান থেকে চুন খসলি মার। দেখবা পিঠে দু চার দাগ আছে বিড়ি বাঁধার পয়সায় জামা কিনলে, কত চুরি করছি ড্রামাটিকের টাকা। তুমি দেখো কাল, এই লাল জামাটা। এটা নতুন, কিন্তু মাঝা-মাঝি সেলাই দেখো। ছিঁড়ে দিছিল রাগ করে। সেই প্রথম রাতের পরভাত হলে তুমি চান কর নাই খাও নাই, তাও আমার দোষ ? কি মার খালাম আমি বয়সে ছোট, দুর্বল বলেই থাবা মারবি ?'

চন্দানি বলেছিল. 'ইচ্ছা করে পুরনো ইট আর পুরনো জ্যাক কি দিছেন তোমরা ?'

ফালটু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, আবার, দেখ, তুমিও বিশ্বাস করলে আমি সে সব রকম জ্যাক আর ইট দিছিলাম। আমি যদি কই, আমার তত্তো বুদ্ধি আছে কযে নিজেই বিশ্বাস করি না, তাকি পুলিস মানে ? এক কাজ কর। ব্যাগে যে টাকা সে তোমারই, কি কি কিনতে রাখছিল, ও তোমারই। তুমি রাখো। পলাই। আরও সরে থাকবা উখুণ্ডি ছাড়া, আব উখুণ্ডি যদি বন হয়, আরও বন আছে।'

দু আড়াই বছরের দূরে থাক, দু আড়াই মাসের অনুভূতির স্মৃতিই কি কারো মনে থাকে ? ঘটনা মনে রাখা আর অনুভূতি মনে রাখা এক হয় না। চন্দানি কি তখনই ভাবতে পেরেছিল, বুড়ো বাঘার সঙ্গে উঠতি বাঘার মারামারি। বোধ হয না। সে তো এই বনে আসা'র পরে শুনেছিল. এদিকের গ্রামের লোকেরা বলে, সব উঁচু পথের উপরে যেখানে নতুন সড়ক তৈরির জন্য তখনও ডাইভার্সান ছিল. সেখানে সেই মানুষ খেকো বুড়ো বাঘটার সঙ্গে অল্পবয়সী ছাগল খেকো একটার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত মারামারি হয়েছিল একটা অন্যটাকে বনে ঢুকতে দেবে না যেন। লেহু মিঞা এ গল্প বিশ্বাস করতো না কিন্তু ভয়টাকে কাজে লাগাতো। পরে বলতো, তা হলেও এই বনে মানুষ খেকোটা আর নেই। চা বাগানে সাহেবরা নিশ্চয় মেরে ফেলেছে এতদিনে। তা কিন্তু সেই লেহু মিঞার বন থেকে পাছে চলে যেতে হয়, সেই আলসেমিতেও বলা হতে পারে। চন্দানিকে ভরসা দিতেও হতে পারে।

তখন রাত ভোর হচ্ছে। মাস কয়েকের পুরনো ছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরের অন্ধকার হালকা হবে এমন মনে হচ্ছে। চন্দানি বলেছিল, 'নিজের নাম কি বলছ তোমরা ক্যাম্প সাহেবক। কাড্ করছো দেখি।'

—'ফটিক লাল।'

তারপর চন্দানি নিজেই সরে সরে ফালটুর চাটাই-এর উপরে গিয়ে ছিল। তার গায়ে হাত রেখেছিল। বলেছিল, তুমি এমন ছোট থাকবা কেন্। আমার গায়ে হাত দেও। মিনিট পনরো বিশ পরে চন্দানি বলেছিল, পারছই তো। কাডে তো বউ ব'লে লিখাতে হইছে।'

তখন ছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছে চাটাইতে। চন্দানি হেসে বলেছিল, 'এখনই আবার, ফালটু যেন অনুতাপ করবে। তখন চন্দানিই তাকে হাত ধরে টেনে নিয়েছিল।

চন্দানি লক্ষ্য করল সে সেই চালতা গাছটার কাছাকাছি এসে পড়েছে। খানিকটা সামনে গিয়ে উপরে ওঠার ঢালটা ধরলেই সেই কুলের জঙ্গল, যার আড়ালে সেই পথের

চাতাল। সে ভাবল এক কাজ করলে হয়। ছেলে দুটোকে ঘুম পাড়াতে পারলে সে একটা দুটো করে পাকা দেখে বেত কাটবে। মানসাই ঘাটে সেই একজন আসামের চালানি বেতে মোড়া বানাতো। সে বেতের নাকি অনেক দাম। তাহলে এ বেতেরও কিছু দাম হবে।

তার মনে পড়ল, হাঁ সেই মানসাইঘাটে ব্রিজ তৈরির কুলিমহল্লায় ফিরেছে তখন তারা। ফালটু বলেছিল, 'আমি তো ইচ্ছা করে খুন করি নাই। তা ছাড়া এমনও হতে পারে সে মরে নাই। কতদিন এইভাবে কুলিদের মধ্যে পালায়ে থাকা যায়। উখুণ্ডিতে বিড়ি বাঁধা ভালো।' চন্দানি ফিক করে হেসে বলেছিল—'খুব রাগ যে! খুন না হয় নাই করছো। কাকার টাকা আর তার বেটিছাওয়াক নিয়া পালাছো। সেটা কম অপরাধ?'

ঢালটা বেয়ে উঠতে দম লাগে। সে জন্য সে আস্তে আস্তে উঠছিল। সেই সকালে হলং চলে যাওয়ার পর থেকে স্নান-টান করা নিয়ে মাইল দুয়েক তো কম করেই হাঁটা হল।

ছটুকে কোল থেকে নামালো, বটুর হাত ছাড়ালো, কাঁধ থেকে ভিজে শাড়ীটাকে সেই চাতালকে এপাশে থেকে আড়াল করে যে ঝোপ তার গায়ে মেলে দিলো চন্দানি। তার গায়ে রোদের ওম লাগছে।

কিন্তু ঝোপটা পার হয়েই সে থমকে দাঁড়াল ঠিক চালতা তলায় নয়, তার কয়েক হাত দূরে রোদে গা রেখে পথের চাতালের উপরে—না না বনবিড়াল কখনও অত বড় হয় না। গলা দিয়ে যে শব্দটা বেরিয়ে আসছিল, সেটাকে গলার মধ্যে চেপে দিল সে। বাঘ? সোনা সোনা রং কিন্তু। কালো দাগই যেন কম। এরই কি ডাক শোনা গিয়েছিল কাল? আর তুমি বলেছিলে হলং-এর নালা পার হয়ে চলে গিয়েছে। এটা যদি মানুষ খেকো হয়ে থাকে। তুমি কি বলতে পার এটা মানুষ খেকোটার দলে মেশেনি।

চন্দানি কুল ঝোপটার আড়ালে সরে যেতে বসে পড়ল। গুঁড়ি মেরে মেরে সরে যেতে হবে। কিন্তু বাঘটা চন্দানির চাইতে তুখোড। যেন চন্দানি আসাতে তার রোদের উত্তাপে কিছু কমতি পড়েছিল। সে উঠে দাঁড়াল। চন্দানির গলা শুকিয়ে উঠেছিল। একমাত্র ভরসা যদি মানুষখেকো না হয়ে থাকে। লেছু মিঞা বলেছিল, বনের পশু দেখলে দৌড়াদৌড়ি না করে স্থির হয়ে যেতে হয়। চন্দানি ছেলেদুটিকে দুহাতে বুকে চেপে ধরে স্থিরের চাইতেও স্থির হয়ে গেল।

সেটা চন্দানির দিকে পিছন ফিরে বেত ঝোপটাকে বাঁচিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল, তাতেই চন্দানির আরও কাছে এসে পড়ল। সোনার মত রংটা রোদ থেকে সরে

আসায় তামা তামা হচ্ছে। পেটের লোমও দেখা যাচ্ছে। তা কিন্তু সাদা, বেশ সাদাই। আরে, চন্দ্রানি অবাক হয়ে গেল, তা হলে বাঘিনী নাকি? বোঁট-বোঁট যেন দেখা যাচ্ছে সাদা পেটের নিচে কালো কালো হয়ে। ভারও নাকি পেটটা? সেজন্যই তুলকি চাল। বাঘিনী বলেই কি গায়ে জোর নেই।

চন্দ্রানি বুঝতে পারছিলো না তার ঠোঁট দুটো খুলে আছে, তার পা দুখানা বনের মেঝেতে পুঁতে আছে, সেই শীতেও বিন বিন করে ঘামছিলো সে। সে সেই যুবতী প্রাণীর ভারিপেট আর স্পষ্ট হ'য়ে ওঠা চুচুক দেখে ভয় ভুলে বলতে যাচ্ছিলো যেন, একটু সাবধানে চলা ফেরা করা ভালো। কিন্তু ঘামের জলে বনের হাওয়া লেগে শীত করে উঠতেই সে শিউরে উঠলো। কি সর্বনাশ, ও কি এই বনটাকেই বাড়ি করলো? ওই চাতালটা ওর রোদ পোযানোর জায়গা হ'লো? তা হ'লে এখন কি হবে? তাকেই কি বনছেড়ে পালাতে হবে?

মুখের ভিতরটা এমন শুকনো যে মনেও যেন কথা তৈরী হচ্ছে না। তা ছাড়া সে তো নড়তেও পারছে না, পালানো দূরে থাক। এই এত বড় বনে সে আর বাঘিনীটা। হতে পারে এই অবস্থায় বাঘিনীরাও হয়তো লম্প ঝম্প কম করে। কিন্তু তার সম্বলতো একটা মাত্র কাটারি। ওদিকে ভারি শরীরের জন্য লম্প ঝম্প না হয় কম করলো, তাতে প্রমাণ হয় না, রাগবিদ্বেষও কম হবে। তা ছাড়া বাঘ সম্বন্ধে শোনা গল্পগুলোর মধ্যে ওটাও একটা, তারা মানুষের মতো জমির আল মাপতে জানে না, কিন্তু এক বনে অন্য আর এক বাঘকেই সহ্য করে না।

চন্দ্রানির হুঁস ছিলো না। বেলা প'ড়ে আসছে। চারদিকে চোখ রেখে রেখে তাকে এই বাঘ থেকে দূরে স'রে যেতে হবে। বিকেলের আগেই কুঁড়েটায় ঢুকতে পারলে হয়। কিন্তু এই এত ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে কোনটার মধ্যে ঢুকে ব'সে, কোনটার আড়ালে ব'সে বাঘিনীটা তাকে দেখছে তা কে বলে দেবে? একদিক দিয়ে ওর সুবিধাই, সঙ্গে বাচ্চারা নেই, হয়তো কোথাও রেখে আসতে পেরেছে। আর তার বুকের উপরে বটু আর ছটু। নিজেকে ছাড়া তাদেরও বাঁচাতে হবে। কিছু একটা ঘটেছে তা বটু ছটুও বুঝছে, কোন শব্দ না ক'রে বুকে সেঁটে আছে।

অউম্ অউম্ আঁ.........

চলতে গিয়েই দম বন্ধ ক'রে থমকে দাঁড়ালো সে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার ভয়ে মরা মুখে রক্ত ফিরতে শুরু করলো। তাহ'লে নালীটার ওপারে গেছে। বটু ছটুকে কোল থেকে নামিয়ে আধাভিজে শাড়ীটাকে ঝোঁপ থেকে তুলে কোন রকম পরে নিয়ে, সে হাঁটতে শুরু করলো। ক্রমশ তার চোখের কোন দুটো কোঁচকালো, তার

ঠোঁট দুটো মিললো। সে মনে মনে ধক্ ধক্ করা বুকের উপর দিয়ে এই চিন্তাটাকে এগিয়ে ধরলো, 'এলা তো তুই হট গেইছিস।

বাঘিনী এখানকার মতো হটেছে এই মরিয়া সাহসটা মনে আসতে আসতে তার শরীরটাকে আবার গুঁটিয়ে গুঁটিয়ে দিলো শীতে। সে স্থির করলো, এখন কিছু খাওয়া দরকার। কুঁড়েতে গিয়ে কি হবে? মাছের সেই ডোবাটায় মাগুর, শোল, বোয়ালি কিছু একটা পেলে পোড়ানো যাবে। তা ছাড়া হলং এর ফেরার সময় হয়েছে। সে তো চন্দানির জন্য সারা বন ঢুঁড়বে না। বরং ডোবাটার পারেই অপেক্ষা করবে, তাতেই কম পরিশ্রমে কাজ হয়। তাকে এই সর্বনাশের কথা বলে দিতে হবে। সে, সুতরাং, ডোবাটার দিকে চললো সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে, এদিক ওদিক চোখ রাখতে রাখতে। তখন সে তো মনে মনে সবত্রই বাঘিনীর সেই ভোরে চোখে পড়ে না এমন তামাটে-হলুদ শরীরটাকে দেখছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো।

মানসাই ঘাটে বছর খানেক আগে সার্কাসের বিজ্ঞাপন পড়েছিলো। তার চায়ের দোকানে কুলিকামিনরা চা খেতে ব'সে সার্কাসের গল্পও করতো। তখন সে সব গল্পে আর বিজ্ঞাপনে বাঘ সিংহে মিশানো একরকম বাঘের কথা থাকতো বটে। সেটাই সার্কাসের সব চাইতে বড় আকর্ষণ। এ রকমও রটেছিলো, সেই বাঘসিংহে মিশনো বাঘটা যে খেতে দিতো তাকে এক থাবড়ায় ঘায়েল ক'রে পালিয়েছে। এমন হ'তে পারে এটাও সেই বিশেষ ধরনের বাঘের হিংস্রতার, বন্যতার বিজ্ঞাপনই যা দর্শক আকর্ষণ করবে। সেই বিশেষ জাতের হিংস্রতার নাকি কারণ সে বাঘ আর সিংহ দুতরফের হিংস্রতাকে পেয়েছে। কি সব গল্প। হিংস্রতার অন্য কারণ নাকি এই বাঘের ঘর করতে বাধ্য হয়ে এক অল্পবয়সী সিংহীর যে ভীষণ অপমান হয়েছিলো সেই জ্বালা আছে সেই সিংহ্রার গায়ে। তারপর সার্কাস এদিককার মেলাগুলোকে শেষ করে চা বাগানগুলোর দিকে চলে গিয়েছিলো। তখন এক ড্রাইভার তার ট্রাক থামিয়ে চন্দানির দোকানে চা খেতে ব সে গল্প করেছিলো সেই বাঘসিংহী নাকি পালিয়েছে। কি করে পালায়? টের নিং দেয়ার সময়ে টেরনারের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে। মরে নি। মাথায় ফ্যাট্টা বেঁধে বাগানের হাসপাতালে পড়ে আছে, সে আর তার সঙ্গে সার্কাসের এক পালোয়ান।

কিন্তু তা হ'ক। সে কোথায় যাবে? ঠিক যখন সে ভাবছিলো এই বনের মধ্যে এই কুঁড়েটায় আরও কিছুদিন থেকে যেতে পারবে সে; যখন সে ভাবছিলো, এখানে বটু আর ছটুকে বোধ হয় বাঁচিয়ে রাখা যাবে, আর, হলং থাকতে, তার বুকের ভিতরেরটিও এই সবুজ সবুজ আলোতে নিরাপদে চোখ মেলতে পারবে, যখন তার

কুঁড়েটার পিছন দিকে ঝোঁপ আর কুঁড়েটার ছনের দেয়াল বেয়ে ধুঁধুল লতায় অজস্র হলুদ ফুল, এমন কি কালই, মাঝারি উঁচু পথটার বেখা ধরে পুব দিকে চললে খানিকটা দূরে দূবে দুটো গাছে উঠে পড়েছে, সাদা ফুল আর সবুজ ফলের দু তিনটে চালকুমড়োর লতা দেখেছে সে।

চন্দানিব চোখ পথের উপবে থাকছিলো না, ববং যেন কোন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর চাল বুঝতে চকিতে এদিক ওদিকে দেখে নিচ্ছিলো। অভ্যস্ত পথটাকে ছেড়ে দিয়ে সূর্যের বিপবীত দিকে ঝোপঝাড়েব আড়ালে আড়ালে চলেছিলো সে। গায়ে জালি জালি ছায়া। সংকীর্ণ কবা চোখ দুটোর মণি সহজে চোখে পড়ে না, পড়লে বরং খবেবি মনে হতো। হঠাৎ সে উ, আ, কবে বাঁ পা মাটি থেকে তুলে ল্যাংচালো। মাটিতে ব'সে পড়লো। একটা ছোট ডালে দুটো বড়ো কাঁটা, দুটোই খানিকটা ক'রে বিঁধে গিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে না-ভেঙে যায় তা লক্ষ্য রেখে সে কাঁটা দুটোকে তুললো। একই সঙ্গে খানিকটা রক্ত আর অনেকটা চোখের জল পড়লো। কেন না তার পা বাঘিনীর থাবা নয়।

যোগাযোগ আর দুর্ঘটনা। সাতদিন হয়ে গেলো। চন্দানি সাতদিন ধরে আলাদা কবার চেষ্টা করেও পাবেনি এ দুটো বিষয়কে। তাকে দোষ দেওয়া যায়না বোধহয়। কেউ কি ব্যাখ্যা করতে পেরেছে কেন দুর্ঘটনা হয়, কেন যোগাযোগ ঘটে? পৃথিবীটাই নাকি দুর্ঘটনা। বিশত্রিশ বছব ধরে যারা এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে বেড়াচ্ছে বঁগাইগাঁও-এ তাদের দলকে দেখতে পাওয়া একটা যোগাযোগ। কিন্তু তাদের বাসভূমিতে প্রথম উৎখাত হওয়া কি দুর্ঘটনা? না, তারও কোন কারণ ছিলো তাদের বাঁচাব চেষ্টার মধ্যে? সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটার ঘটনাগুলো যে ঘটলো, তাব কোন কারণ কি ছিলো? চন্দানির মধ্যে কিংবা সেই পড়ো পড়ো হেলথসেণ্টারে? ফালটুও যে গজেনের উপর আক্রোশ পুষতো তার নতুন জামাটা গজেন ছিঁড়ে দিয়েছিলো এসবই কি যোগাযোগ যে জন্য ফালটু তার সঙ্গে পালিয়ে ছিলো? একা পালাতে সাহস পেতো না যাবজ্জীবন দণ্ডিত খুনী শুধু বেকসুর ছাড়া পায়না, তাকে পুলিশ দিয়ে রক্ষা করা হয়। তা সত্ত্বেও কারণ দেখানোর চেষ্টা হয়। বোধহয় কারণগুলো বলা আর মন্ত্রতন্ত্র বিড়বিড করা একই ব্যাপার। যেন কারণ দেখাতে পারলে দুঃখকষ্ট কমে যায় যেমন মন্ত্রে নাকি রোগ সারে। মন্ত্র আর কারণের একই উৎপত্তি।

সাতদিন হলো বটু হারিয়ে গিয়েছে। সাতদিন, না সাতঘণ্টা, না সাত মিনিট? দিন, রাত, ঘণ্টা সব একাকার কালো হতাশা আর শোক হলে তাকে সাতদিন বলাও যা, সাত মিনিট বলাও তা।

হারিয়ে গেল। কারণ কি এই খুব কম বয়সে চন্দানি তাকে হাঁটতে শিখিয়েছিল বনের পথে, একা একা? ঝোপঝাড়কে ভয় না-পেতে শিখিয়েছিল? কারণ কি এই, এক বছরেই বনবিড়াল নিজের খাদ্য সংগ্রহ করতে শেখে, নিজেকে বাঁচাতে শেখে, মানুষ তা পারে না? কারণ কি চন্দানির পাপ?

মাছের ডোবাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। ডোবার ওপাশে ছন, কাশ, নলবনে, আগাছার ঝোপঝাড়, তার মধ্যে ডাহুকের কলোনি। চন্দানি ডাহুকের মতো ডেকে দেখেছিল, তাতে ডাহুকরা উৎকর্ণ হয় যেন, ধরার মতো কাছে এগিয়ে আসে না। পোষা ডাহুকী পেলে খাঁচাব ফাঁদে ধরা যেত। একটা ডাহুকী আগে ধরা দরকার। খাঁচার মধ্যে, পোষ মানার আগে বেঁধে রাখলেও, সে ডাহুকদের দেখলেই ডেকে নেবে, আর ভাবছ কারা ডাহুকীকে বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাতেই সুতোয় টান পড়বে খাঁচাব দরজা পড়বে। ডাহুক বা ডাহুকী ধরা ততো সহজ নয়। তারা উড়তে জানে! বনে লুকিয়ে পড়তে জানে। চন্দানি ডাহুকী দিয়ে ডাহুক ধরার ব্যবস্থা করতে পাবে নি, কিন্তু সদ্য উড়তে শিখছে, পালাতে তেমন শেখে নি, দৌড়ানোর বদলে গুটি গুটি চলে, উড়তে শুরু করলে যাদের লাঠির ঘায়েই মারা যায় সে রকম বাচ্চাগুলোকে ধরতে শুরু করেছিল। তার তো আজকাল ক্ষুধা বেশি; সে ভেবেছিল সেই বাচ্চাগুলোর নরম মাংস পুড়িয়ে দিলে বটু তার চক্‌চকে ছোট ছোট দাঁতগুলো দিয়ে চিবিয়ে খেতে পারবে হয়তো। বটুর তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠার কথাই ভেবেছিল সে। কারণ কি? কারণ কি ব'লে সে হাঁপাতে পারে, কেন, কেন ব'লে সে কাঁদতে পাবে, বটু, শিশু ফেরে না।

অন্যদিনের মত বটুকে জঙ্গলের কিনারায় দাঁড় করিয়ে রেখে, যেমন জলের কিনাবায় রেখে স্নানে নামে, সে ডোবার ওপারের বনে ঢুকেছিল। হয়তো খেয়াল ছিল না তার সেই নল আর ছনের বনে কতদূর ঢুকে গিয়েছে আর কতক্ষণ সে ঘুরছে বাচ্চা ডাহুক তাড়া করে' ফিরে এসে বটুকে পাওয়া গেল না।

অউম্, আউম্, আউম। আঁ, আঁ, আঁ।

চন্দানি চমকে উঠল। এতদিন কি ছিল না ওটা? আবার এসেছে? অনেকদিন পরে, পনরো দিনও হ'তে পারে, ডাকটা শোনা গেলো। তা হ'লে ওর সঙ্গে বটুর হারিয়ে যাওয়ার যোগ নেই। এই সান্ত্বনা ভাবতে ভাবতেই, কোথায় সেটা তা দেখতে সে দু আঙুল দিয়ে চোখের কোল দুটো মুছে নিলো। এটা এক রকমের সান্ত্বনাই বটু হারিয়ে যাওয়ার সময়েও ছিলো না। কিন্তু বটুর হারিয়ে যাওয়াও পনরো দিন হ'য়ে গেলো। এখন ঠিক বিকেল হচ্ছে। এসময়ে একবার ডেকে উঠবেই। এমন হতে

পারে, চন্দানির সেই বন তোলপাড় ক'রে ছোটা, সেই দিগন্ত ছোঁয়া কাশ, ছন, নলের বন তোলপাড় করে খোঁজা, আর তা সাতদিন ধরে—তখন তো চন্দানির ভাঙা গলার হাহাকার আর আর বটু বটু চিৎকার—বনটায় পশুপাখিরা বোধহয় ভয়ে চুপ করে গিয়েছিল। তারা মানুষ মায়ের কান্না আগে শোনে নি। হয়তো এই বাঘিনীটাও বুঝতে পারছিল না ডাকা উচিত কিনা, যদিও হয়তো বা তখনও সে মাঝে মাঝে এসেছিল এই বনে।

সাতদিন পরে এই জঙ্গলে, মানসাই-এর চরের সেই মাইল মাইল ছড়ানো নল আর কাশ ছনের বনে, যার এখানে ওখানে চোরাবালি, যার বিষাক্ত সাপগুলোর দু-একটাকে চন্দানিও দেখেছে, যে নলবনের কিনারায় কিনারায় মানসাই-এর প্যাঁচালো ধারালো স্রোত, কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। চোখে জমতে জমতে, নাকের দুপাশ দিয়ে গড়িয়ে নেমে নেমে, কদিনের কান্নায় ছুঁচলো হয়ে আসা চিবুকের শেষে গোল ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ল তারা।

একটু উঁচুতে বসে এখন নিচের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়েছে চন্দানি। শোকে ছুঁচলো হয়ে আসা চিবুকের নিচেটা সে মুছে নিল। তার দু-চোখের কোলে নীল গাঢ় কালি। কপালের দুপাশ থেকে এক গোছা ক'রে চুল চোখের দুপাশে, স্থায়ী জলের ধারা মনে হ'তে পারে।

সে খাচ্ছেই তো, স্নানও করছে, মাই দিতে হচ্ছে ছটুকে। প্রথম দুদিন তা না দেয়ায়, ছটু নেতিয়ে পড়েছিল পিঠের উপরের সেই ঝোলার মধ্যে। আর তা ছাড়া সেই দুই দিনে কি অস্থির করছিল পেটের মধ্যে। যেন খেতে না পেয়ে, ঘুমাতে না পেরে, অস্থির হয়ে উঠছিলো হৃৎপিণ্ডটাই।

চন্দানি ছটুকে ডান মাই থেকে বাঁ মাইয়ে নিল। ডানটাকে ঢাকতে গিয়ে হাল্কা গোলাপী শাড়িটা চোখে পড়ল। এটা, তিন চারদিন আগে কেনা। আগেরখানা বনে জঙ্গলে ছুটে বেড়াতে ঝোপঝাড়ে লেগে কুটি কুটি হ'য়ে ছিঁড়েছিল। শাড়িটাকে দেখতে গিয়ে ছটুর নাওয়া সত্ত্বেও ভার হ'য়ে ওঠা মাইদুটিকে সে দেখতে পেলো। সে বাঁ মাইয়ের উপরে ছটুর গালে হাত বুলিয়ে দিলো, কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিলো আর তাতেই তার মনে পড়লো সে ভাবল, আরও কিছু তুলো আর ধারাল সেই একটা কাঁচি কেনা বাকি। সে যেন হলংকে তা বলতেই হলং-এর দিকে চাইল। সে ভাবল, ব্যাপারটাও হলংকে বলে রাখতে হবে। সে নিজে যদি না-পারে? যদি অস্থির হয়ে যায়, অজ্ঞান হয়ে যায়, এ জঙ্গলে হলং ছাড়া আর কে সাহায্য করবে? তার হেলথসেণ্টার অভিজ্ঞ মন বলল, বোধহয় অনেকটা পেনিসিলিনও দরকার হতে পারে।

ছটুর কপালের চুল সরিয়ে সরিয়ে দেখতে গিয়ে হঠাৎ চন্দানির মনে পড়লো এই ছটুই কি তখন আবার বটু হবে। এটা শুনতে সান্ত্বনার মতো কিন্তু কাঁদতেই যেন মুখ হাঁ হ'লো তার। তার চাইতে—সে হলং এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে চোখ তুলতেই দেখলো, হলং তার উন্মুক্ত মাই এর দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে। চন্দানির শুকনো হলদেটে সাদা মুখ অনেক দিন পরে কিছু লাল হলো। সে ভাবলো, চোখ নামিয়ে, এটা বোধ হয় নোতুন নয়। এর আগেও সে অনুভব করেছে।

হলং তার স্নানের সময়ে, ছেলেকে দুধ দেয়ার সময়ে কাছাকাছি থাকলে তাকে যেন অবাক হয়ে দেখতে থাকে। কিন্তু এত কাছে বসে এমন করে বোধহয় আগে কখনও দেখেনি। হলং-এর ঠোঁট দুটোও যেন নডছে। চন্দানি বুক থেকে ছটুকে নামালো, শাডীটাকে গায়ে ছডিয়ে নিলো। মাটিতে বসলো ছটু। চন্দানি নিচু গলায় বললো, 'বাঘিনটা দূর গেইছে।' হলং নিজের পিছন দিকটা একবার দেখে নিয়ে একমত হ'যে মাথা দোলালো। চন্দানি ভাবলো বাঘিনীটার কথা হলংকে সেদিনই বলছে—সেটা এই বনের এদিক ওদিক ঘোরে না শুধু, এখন এখানেই থেকে যাবে। এই তো ছিলো না কয়েকদিন, আবার ফিরে এলো। আব এখন তো বোঝাই যাচ্ছে সে গাভিন। এই বন থেকে নডতেও চাইবে ন'।

চন্দানি ভাবল বটুর সময়ে সেই উদ্বাস্তুদের কলোনিতে ডাক্তার ছিল। অন্য স্ত্রীলোকেরা ছিল। ছটুর সময়ে ফালটু নৌকায় মানসাই পার হয়ে, পরে রিক্সা ক'রে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। এখন এখানে হলংকেই সব বলে রাখতে হবে, লজ্জা করলেও চলবে না। আর ওষুধগুলো এক জাযগা থেকে একবারে সংগ্রহ করা যাবে না। হলংকেই এদিক ওদিকে ঘুরে ঘুরে যোগাড করতে হবে। এক সঙ্গে অত ওষুধ যোগাড করতে গেলে একই জায়গায় একই সময়ে, মানুষের সন্দেহ হবে। আর তাবা তখন, সন্দেহ হলে মানুষ কি কবে তা তুমি বলতে পার না, হলং-এর পিছনে এই বনেও চলে আসতে পারে। পাখিগুলোকে দেখ না? এক টুকরো রঙীন কাগজ ফেলে রাখ, দেখবে কোনো না কোনো পাখি কিছুক্ষণেব মধ্যে তার কাছে চলে এসেছে, আর ঘাড গলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে নানাভাবে দেখতে চেষ্টা করছে।

ওষুধের ব্যাপাবট্যাপার লেহ্ মিঞাই বলেছিল প্রথম। কিছু কিছু ওষুধ আর ইনজেকশনের ছুঁচ পর্যন্ত সে স গ্রহ করেছিল: সে সব জরজর আমাশা পেটখারাপের। এমন কি হঠাৎ আহত হওয়ারও। বলতো, হেলথসেণ্টারে থেকে থেকেই এসব বদঅভ্যাস হয়েছে তার।

তা ছাড়া তখন শীত পড়বে। সেই শীতে সেই অবস্থায় কয়েকদিন ধ'রে দিনরাত হয়তো কুঁড়েটাতেই থাকতে হবে। অথচ দিনমানে কুঁড়েটা আদৌ নিরাপদ নয়।

পরিত্যক্ত পথগুলোর সব চাইতে উঁচুটার উপরে হওয়ায় সেটা নিচের পরিত্যক্ত পথগুলোকে ঢেকে যে বন তার প্রায় সীমাতে। সেখানে ইউক্যালিপটাসের নিচে যে ঝোপ-ঝাড় তাকে বন বলা যায় না। নতুন পথের ডাইভার্শন থেকে বড়জোর আধমাইল যে কোন মানুষ কাটকুট কাটতে কিংবা হারানো গোরুর খোঁজে কুঁড়েটার কাছে এসে পড়তে পারে। আসেনি এতদিন, ছসাত মাস তো হ'য়েই যায়, সেটাই যোগাযোগ কিংবা বাঘ বনটাকে বদনাম দিয়েছে। এই আশঙ্কাতেই লেহুমিঞা বলেছিলো, সারানো যায়, বন থেকে ডালপালা আর ছন কে:ট এনে। তার চাইতে বরং রোদেজলে কালো হয়ে যাওয়া পুরনো ছন থাকা ভালো, যাতে পুরনো পরিত্যক্ত কুঁড়ে মনে হয়।

কিন্তু তা আর কতটুকু আড়াল। ঠিক এই মুহূর্তেই যদি কেউ কুঁড়েটার কাছে এ:স থাকে সে কুঁড়েটার সামনে রাস্তার পিচের উপরে কাল সন্ধ্যার রুটি সেঁকার আগুনের ছাই দেখবে, আগরটা ঠেললেই কুঁড়ের ভিতরে চন্দানির সংসার দেখে ফেলবে—হোগলার মাদুর, কালিপড়া হাঁডিপ্যান, ছেলেদের জন্য টাঙানো মশারি।

কুঁড়েটা এমন কিছু নয়। এর পরের বর্ষায় ভেঙে পড়বেই, গলে যাবে। শীতের আগেই সারাতে হবে। যখন কুঁড়ের পথটা হাইওয়ের অংশ ছিলো তখন এখন যেখানে কুঁড়ে সেটা হয়তো দোকান ছিলো। ফলে মেঝেটা সিমেণ্টে বাঁধানো। আর সেজন্যই পরে কেউ কুঁড়েটাকে তু:ল থাকবে। লেহুর পিছন বনে ঢু:ক এ কুঁড়েতে এসেছিলো চন্দানি। আর সেই বিকেলেই কুঁড়ের মধ্যে পুরনো ঘুঁটে বার ঘুঁটের ছাই দেখে বোঝা গিয়েছিলো কুঁড়েটায় কেউ থাকতো। লেহু মিঞাই কি? লেহুমিঞা বলেছিলো, ষাড়ের পিঠে বেড়ায় সেই বাচ্চা সন্নেসিটাকে একদিন সে এখান থেকে বেরোতে দেখেছিলো। হয়তো সেই কখনও কখনও থাকে এখানে। এসব কিছুই যেন লেহুমিঞার মাথায় ঢোকে না, কোন বিষয়ে যেন গরজও নেই। 'রাতটা থাকি যাও, দিনৎ ফির ভাবি দেখো কোটে বা যাইবে।' লেহুমিঞা তখনও বনের দিকে চলে গিয়েছিলো। ভয়ে দিশেহারা চন্দানি ছেলে দুটোকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে সেই কুঁড়ের ভ্যাপসা অন্ধকারে ঠায় বসেছিলো লেহুকে সেই কুঁড়ের কাছে দূরে থাক বনের মধ্যেও দেখা যেতো কি? চন্দানি অবশ্যই, রাত্রির বনে লেহুকে খুঁজতে চেষ্টাও করেনি। সে লেহুনয় যে রাত্রির বনকে ভয় পাবে না।' তারপর এমন সময় হ'লো যখন লেহুকে দিনে রাতে পারে কাছে আর দেখা যাচ্ছে না। তাও মাস ছয়েক হ'তে চললো। কে জানে আবার অসুস্থ হ'য়ে কোন হেলথ-সেণ্টারে আছে কি না।

বর্ষার পরে একদিন হলং এসে উপস্থিত। হলং, চন্দানিকে কুঁড়েতে দেখে ভয়ই পেয়েছিলো। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। চন্দানি কুঁড়ের বাইরে যায়নি আর। হলং তার ষাঁড়টাকে নিয়ে কুঁড়ের দরজায় শুয়েছিলো। এখনও এ নিয়মটাই আছে। লেহু দিনের বেলায় শুনে বলেছিলো, ভালো হয়েছে। রাতে আগুনের আলো দেখলে কিংবা দিনে কুঁড়েতে কেউ এসে পড়িলে ভাববে হলংই থাকে। এক ভয় যদি হলং কাউকে বলে দেয়।

সে ভয়তো আছেই। ভরসা এই এখন পর্যন্ত হলং কাউকে তা বলেনি, বরং যেন গোপন থাকাই ভালো মনে করেছে সেও। বনেই থেকে যাচ্ছে, বন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যখন তখনও।

ভয়ইতো। মানসাই ঘাটের ভয় থেকে এ বনের ভয় কিছুমাত্র কম কি? বনে আসার দিন সাতেক তখন হয় কি না হয়, সারা বন কাঁপিয়ে বাঘ ডেকে উঠেছিলো, কাছে ডাকছিলো, দূরে ডাকছিলো। সারা রাত ছেলে দুটো কে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ঠায় ব'সে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো চন্দানি। পরদিন সকালে কুঁড়ে থেকে বেরোতে না বেরোতে যেন শূন্য থেকে নেমেছিলো লেহু মিঞা, বলেছিলো, 'ভাল হইল দেখং, বাঘের ডরৎ তোমাক কাঁউ ঘাটায় না।'

এটা কি কোন যুক্তির কথা হ'লো যে এ বনটা বাঘের বন হ'লে কোন মানুষ বনে ঢুকে চন্দানিকে বিরক্ত করবে না? যারা বনে থাকবে? লেহুমিঞা অবশ্যই সারা রাত বনে ছিলো। সে কি বাঘকে এড়িয়ে এড়িয়ে হেঁটে বেরিয়ে? চন্দানি নিজে কি তুলনায় নিরাপদে ছিলো কুঁড়েটায়? কুঁড়েটার কাছে এলে বাঘকি বোঝেনা কুঁড়েতে মানুষ আছে? এসব বোধ হয় যুক্তির কথাই নয়। যেমন এখন যখন সে কুঁড়ের মধ্যে ঘুমায় হলং থাকে দরজার কাছে, দরজার বাইরে তার ষাঁড়টা, যদি সেটা ফিরে এসে থাকে মাঠ থেকে, দরজা আর ষাঁড়টার মধ্যে ফাঁকা টুকুতে হলং নিজে। এটা কি বাঘের ব্যাপারে রক্ষাব্যবস্থা হয়।

আর এভাবে এত ভয়ের মধ্যে হলংএর বনে থাকারই বা কি যুক্তি? বাঘ কি তা বোঝে না? আর, প্রকৃতপক্ষে তারই তো বরং একটা জীবিকা আছে, আর তা বনের বাইরে ঘুরে বেড়ালে তবেই ধ'রে রাখা যায়। এমন কি এই বনেও এক মাস ধ'রে যে মাছ ধরা আর বিক্রি করার কারবার চললো তাও তো হলংএর হাত দিয়েই। সেই আটা চাল, নুন, চিড়ে কিনে আনে মাছের বদলে। সে একবার যদি না ফেরে, কিছু বলার নেই। অথচ সে ফিরে আসে।

অউম্, অউম্, অউম্। আঁ-আঁ-আঁ। বাতাসের ঝাপটায় যেন ঝোপ-ঝাড়গুলো কেঁপে উঠলো।

বেলা পড়ে আসছে। বনের বাইরে এখন আলো থাকবে, বনের মধ্যে গাছগাছালির ছায়ায় এখনই সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব। 'বড়া মুস্কিল হল,' ফিস্‌ফিস্ ক'রে হলং বলল। চন্দানি ছটুকে বুকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বরং আরও মাথা নিচু করল। সে আরও গলা নামিয়ে বলল, 'আগের চায়ে কাছে ?'

মুস্কিলের কথাই। বন থাকলে বাঘ থাকতে পারে। বনের ভয় আর বাঘের ভয় একই কথা। বাইরে থাকলে আকাশের দিকে দেখে নিয়ে বলা যায়, মেঘের জন্য আলো কমছে। বনে তেমন হঠাৎ আলো কমলে বাঘ শব্দটা মনে না হলেও, যে ভয়টা চারদিকে কালো কালো হয়ে ঘনিয়ে আসে, তাকেও বাঘ বলা যায়। সত্যিকারের বাঘ সম্বন্ধে হলং বা চন্দানি কি বা জানে ? চন্দানির হৃৎপিণ্ডটা তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করেছে তখন, অথচ বনের বাইরে যেতে পারো না। তা পারো না। তা পারো না।

বাঘটা নতুন নয়। ছ সাত মাস আগে চন্দানি বনে আসার পরপরই, হলং আসার আগে খুবই ডাকতো। দিনে রাতে কয়েকবারই ডাকতো কিছুক্ষণ ধরে। আর তার প্রতিধ্বনিও উঠতো যেন। যেন আর একটা বাঘ। তারপর হঠাৎ একদিন ডাকাডাকি একেবারে যেন বন্ধ হয়েছিল। তখন কয়েকদিন তা লক্ষ্য করে লেহু মিঞা একদিন বলেছিল—মানুষখেকোকে উত্তরে কাদম চা বাগানের কাছে গুলি করে মেরেছে, এ গল্পটা তা হলে ঠিক। সে আরও বলেছিল মানুষখেকোটা নাকি বড় বনের। শালবাড়ি দিয়ে আড়াআড়ি পার হয়ে নদীর চর ধরে এদিকে এসে পড়ছিল, বলে এদিকের লোক। চন্দানি বলেছিল, শীকার করার মানুষ তো বড় বনের ধারে কাছেও থাকবে। এখানে এতদূরে এসেছিল কেন ? লেহু মিঞা বলেছিল, মানুষখেকোরা ধূর্ত হয়। এক জায়গায় একটা মানুষ মারলে তা থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে অন্য মানুষ মারে। তা ছাড়া এটাকে কোন বাঘিনী ডাকছিল। সেই ডাকাডাকিতে লুকোচুরির মতোও থাকে। দুজনের একজন আর একজনকে এখানে টেনে এনেছিল এমন হতে পারে।

তারপর কিন্তু বাঘের ডাক ছিল না। পাঁচ ছ-মাস তো বটে। বাঘিনী কি তাহলে ভয়ে পালিয়েছিল। তা নাও হতে পারে সে হয়তো সেই বড় বনে চলে গিয়ে এদিকে আর ফিরতে পারে নি। তখন তো ঘোর বর্ষা। তখন শালবাড়ির এদিকে সব নদীতে ভরা বন্যার মতো জল।

মাসখানেক থেকে আবার এই এক বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছিলো। তা কিন্তু এমন নয়। হয়তো দু একদিনে একবার। আর তা ঠিক এরকম সময়ে। আর কখনও ভোরের দিকে একবার। এত ঘন ঘন ডাকছে কেন ? আর এটা যে সেই বাঘিনী তা কে বলবে ? কোন বাঘ-বাঘিনীর নাম থাকে না। তুমি একটা দিয়ে নিতে পার।

অউম্ অউম্ অউম্ আঁ, আঁ, আঁ।

হলং যেন নড়ছে না এমন ভঙ্গিতে ধীরে উঠে দাঁড়াল। কান খাড়া করে যেন শুনল। কিছুক্ষণ পরে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বোধহয় উত্তরে চলে গেল।'

চন্দানি তেমন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'অন্ধকারের আগে ঘরে যাওয়া লাগে'।

হলং বলল, 'আউর জেরাসে দেখং।

মিনিট পনরো হলং সোজা স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকল কান খাড়া ক'রে। সে একবার ভাবল এটা নতুন চন্দানির—ঘরে যেতে চাওয়া সন্ধ্যা নামতেই। আগে রাতের অন্ধকারেও ভয়ডর তেমন ছিল না।

ঘরে যাওয়ার কথা বলে চন্দানি নিজেও যেন কি বলল সে তা শুনেছিল। সে ভাবল, তার গা শিরশির করল, বা একটু বেশি ভয় করছেই এখন। বন সম্বন্ধে সে কেমন যেন নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ছিল। তা উচিত হয়নি। বটু মনে করিয়ে দিয়ে গিয়েছে বন নিশ্চিন্ত হওয়ার নয়। বন পুড়িয়ে ফেলেও এখন আর তুমি কিছু করতে পার না। বনের বিশ্বাসঘাতকতায় রাগ না ভয় কোনটা বেশি হওয়া উচিত, তা কেউ বলতে পারবে না।

হলং বলল 'চলিয়ে'।

তারা পাশাপাশি চলতে শুরু করলো। একদম নিরস্ত্র দুজন মানুষ। তাদের চারিদিকে গাছগাছালির ঝোপঝাড়ের কালো কালো শরীর আর তাদের কালো কালো ছায়াও যেন নড়তে লাগল।

একবার চন্দানির মনে হল, বোধ হয় জোরে জোরে কথা বলতে বলতে চলা উচিত। সে এরকম যেন কার কাছে শুনেছে জোরে জোরে এরকম কথা বলে চলতে থাকলে বাঘেরা নাকি মনে করে অনেক লোক। ভয় পেয়ে বাঘ সরে দাঁড়ায়। মানুষ না-দেখে বাঘের গায়ে গিয়ে পড়বে এমন হয় না। গায়ে না পড়লে বাঘও কিছু বলে না। কিন্তু আর কেউ যেন বলেছিল সেটা যদি মানুষখেকো হয়?

নিঃশব্দে চলতে চলতে হলং একবার ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'উটা বহোৎ রাগ খাইছে। হয় কারো জানবার মারছে ভুখে। জানবারের মালিক তাড়া করছে।' কিন্তু সে থেমে গেল। তার মনে পড়ল বনে বাঘের নাম মুখে আনতে নেই। ভাবতেও নেই, তেমন, বাঘের কথা। চন্দানিই বোধ হয় বলেছিল। আসলে সে ভাবল, বাঘের যত গল্প জানো, বাঘ সম্বন্ধে কিছুই জানো না। কেই বা জানে?

চন্দানি ভাবল, বাঘের সম্বন্ধে যত গল্প, কোনটা কোন বাঘ তা কেউ জানে না। এই কি সেই বাঘিনী হতে পারে, লেহু মিঞা যার কথা বলেছিল যে মানুষ খেকোটাকে এনেছিল এদিকে? কিংবা বাঘিনী তো সে একটাই দেখেছে, আর তার সম্বন্ধেই হলংও একটা

খবর সংগ্রহ করে এনেছে যেন। তার দেখা সেই চালতা তলার বাঘিনী আর হলং-এর গল্পের বাঘিনী যেন একই কিন্তু প্রমাণ কি? এমন হতে পারে, যাকে সে দেখেছিল সেটা চলে গিয়েছে, হয়তো এটা হলং এর গল্পের বাঘিনী সে জন্যই ডাকছে এত ঘন ঘন। কিংবা লেছু মিঞার গল্পের বাঘিনী ফিরে এসেছে আবার, আর সেই হয়তো হলংএর গল্পের বাঘিনী।

* * *

সতর্কভাবে চারিদিকে দেখে দেখে বনের দক্ষিণ দিক ঘেঁষে বরং, কারণ ডাকটা শেষবার উত্তর দিকে মনে হয়েছিল, তারা যখন সব চাইতে উঁচু পথের চাতালে হলং-এর ঝুঁড়ের কাছে উঠে এল তখন ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। এতক্ষণ ভয়ে ডাকে নি।। তা এমন যে কানে তালা লেগে কান কট কট করে। চাঁদ উঠেছে খানিকটা। শীত শীত কুয়াসার ভেজাল তার সবজে আলোতে হলং-এর বুড়ো প্রকাণ্ড ষাঁডটাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখা গেল। যত না পরিশ্রম তার চাইতে বেশি উদ্বেগ। এখানে অন্তত কোনো ডাকাডাকিতে কিছু হাঁপাচ্ছে না। পিঠ থেকে ছটুকে নামিয়ে দিল চন্দানি। সে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, বসল, আবাব দাঁড়াতে চেষ্টা করল। অকারণে হাততালি দিল। অকারণে "মা" "মা" শব্দটা উচ্চারণ করল। তালি বলতে পারে না বলেই, তাই তাই বলা আসছে না বলেই, সে এক রকম শব্দ করছে হয়তো।

চন্দানির চোখ দুটি সজল হল আবার। সে ভাবল, ছটুকে সে, হাঁটতে শেখার পরেও কখনই অত কম বযসে বনে চলতে শেখাবে না, যেমন বটুর বেলা হয়েছিল।

বন, বাঘ, অন্ধকার, চন্দানির মন বিদ্বেষে দিশেহারা হ'য়ে যাচ্ছে। একবার বাঘ, একবার অন্ধকার, একবার, বনকে প্রতিপক্ষ মনে হ'তে থাকলো। সেটা তার কপালই বোধ হয়, যে এই বিশেষধরণের বাঘিনীটাকে জুটিয়ে এনেছে। যার শরীরে বাঘ আর সিংহের হিংস্রতা এক সঙ্গে জমে আছে, আর হয়তো মায়ের কাছ থেকে সেই অপমানের স্মৃতিও মনে রেখেছে। এমন তো হ'তে পারে, সেটা ছিলো দাঁতক্ষয়ে যাওয়া সার্কাসের এক নেশাখোর বাঘ যা তেমন ভাবে এক অল্পবয়সী সিংহীকে অপমান করেছিলো। এখন তো দেখাই যাচ্ছে, এই সিংঘ্রী, চালতাতলার চাতালে দেখা, পেটসাদা সোনালী তামার, এটা সার্কাসেই ছিলো।

শুধু এই বনেই নয়, একদিকে ফালাকাটা অন্যদিকে শিলবাড়ি, শালবাড়ি পলাশবাড়ি এসব গ্রামে বাঘের কথা শোনা যাচ্ছে। লোকে ডাক শুনছে। এসব গল্পই শুনেছে হলং ফালাকাটার বাজারে, কাদমী চা বাগানের হাটে। আর এমন শুনতে শুনতে চন্দানির মুখে শোনা গায়ে ডোরা নেই প্রায় সোনা সোনা রঙের এক বাঘ দেখার গল্প

করেছিলো এক দোকানে বসে। দোকানে যারা ছিলো তারা এই গাঁইয়া জেলেটার কথায় বেশ হাসাহাসি করছিলো। কিন্তু সেই দোকানেই আর একজন বলেছিলো সেটা তা হ'লে সেই বাঘ হ'তে পারে গত শীতে বাদামতাম চা বাগানের কাছে যেটা সার্কাসের দল থেকে হারিয়েছে। সেই বাঘেও নাকি ডোরা খুব কমই দেখা যেতো বরং সিংহী-সিংহী দেখাতো, নাকি বাঘে আর সিংহে মিলিয়ে তৈরী। সেই সার্কাস কম্পানী পালাতে পথ পায় নি। তাও দুএকটা করে হ্যাণ্ডবিল বিলি ক'রে জানিয়েছিলো সেই বাঘটাকে খুঁজে দিতে পারলে হাজার টাকা দেবে। তারপরে সেই লোকটা বলেছিলো, সেই সার্কাস কম্পানী এদিকে আর আসবে না। বেশ মারামারিই হয়েছিলো। সার্কাস দেখার পাশ নিয়ে কথা। সার্কাসওয়ালারা বাগানের সাহেবদের, বাবুদের পাশ দিতো। তা হ'লে পাতা-তোলাদের কেন পাশ দেয়া হবে না? আর তারা যারা কিনা মন্ত্রীর পার্টির। কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কি, পরে মারামারি। সার্কাসের মানেজার, পাহালবান, কয়েকজন হাসপাতালে। তাঁবুতে আগুন। হাতি ঘোড়ার গায়ে আগুনের হল্কা লাগল। সার্কাস কম্পানীর কেউ খাঁচা খুলে দিয়েছিলো বাঘদের বাঁচাতে। কয়েকটি বাঘকে ফিরে পেলেও, দুটোকে পাওয়া যায় নি, যার মধ্যে বাঘা-সিংহীটাই নাকি দামী। ওটাকে দেখতেই ভিড় হতো।

শুনে চন্দানির ভয় হয়েছিলো হলং যদি বলে থাকে, এই বনে এই বাঘিনীকে দেখা যাচ্ছে, তবে তার খোঁজে লোকজন এই বনে এসে পড়তে পারে। চন্দানি ভয়ে ভয়ে হলংকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, বাঘিনীটা যে এই বনে আসে তা হলং বলেছে কিনা সেই দোকানে। না, হলং তো তত ভালো বাংলা বলতে পারে না, কাজেই সকলেই যখন বাঘিনী আর বাঘের কথা বলছিলো, তখন সে বাংলাতে পারে নি, বাঘিনী এই বনে কভি কভি আসিয়ে যায়। চন্দানি বলেছিলো না বলাই ভালো হয়েছে, হলং যেন আর কখনও বাঘিনীর গল্প কাউকে না বলে।

কিন্তু বনের বিদ্বেষে চন্দানি এখন বলল, বললে হয় সেই ডাক্তারের দোকানে এই বাঘের কথা।

হলং বোধহয় অন্য কিছু ভাবছিল। সে বলল, 'তো বহুৎ আচ্ছা, ছটু তোমাকে মা বলছে, বটুভি বলছে। ফালটু ব=ছে না, লেদু মিঞা বলছে নাই, আমি ভি বলছি নাই।' সে বোধহয় 'মা' এই শব্দটা যা এতটুকু শিশুরা বলতে পারে, তারা বয়স্করা কেন বলতে পারে না, তার ইয়ত্তা বুঝতে চেষ্টা করছিল।

শুনে চন্দানির মনে পড়ল, কাল সন্ধ্যার পরও হলং এমন একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল। চন্দানি ছেলেকে ঘুম পাড়াতে ছড়া বলছিল তখন। হলং জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মালি কৌন? কেন সে সব জানবে, বলতে ভি পারবে, আমরা যা জানি না।'

প্রশ্নটা যারপর নাই ছেলেমানুষি। হ'তে পারে হলং তার নিজের চাইতে বয়সে ছোট। চন্দানির একুশ বাইশ যদি, হলংএর হয়তো কুড়ি একুশ। লেত্নু মিঞার বড়জোর বাইশ তেইশ। এসব দিক দিয়ে ফালটুই সব চাইতে আনাড়ি এতদিনে তার কুড়ি হতে পারতো কি? কিন্তু সে যাই হ'ক, হলংকে তখন অদ্ভুতভাবে ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিলো। একেবারে বোকা হ'য়ে গিয়েছে যেন সেই ধাঁধাঁর সামনে। না হ'লে বলতে হয় তাকে তন্ময় হওয়া বলে। অপারেশন ক'রে যাকে বাচ্চা সাধু বানিয়েছিলো ঠক-সাধুর দল, সন্ন্যেসির ভান করতে করতে কি তারও মনে ভগবান, অলৌকিক, এসব কথা আসে? তা হ'লেও, ডাল আজ খালি থেকে কাল ফুলে ভরে উঠবে সে ব্যাপারে মালি, ফুলবাগানের মালি ছাড়া আর কেউ নয়।

দেখো কথাটা কি হচ্ছে। হলং বোগা রোগা সেই ফালটুকে নিশ্চয় মানসাই ঘাটের চায়ের দোকানে চন্দানির কাছাকাছি বসে বিড়ি বাঁধতে দেখেছে। লেত্নুমিঞাকে দু-একদিন এই বনেই দেখে থাকবে যেমন সেবার বটুর অসুখে। সে আন্দাজ করছে তারা দুজনে, যেমন বটু আর ছটু, কোনভাবে চন্দানির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কি কথা! কেন সে নিজে, আর সকলেই, 'মা বলছে নাই।'

কখনও কখনও এমন হাল্কা কথা উঠে পড়ে যে অস্বস্তি, দুঃখ, আতঙ্কের মধ্যে মানুষ হেসে ফেলে। কিন্তু সে উদাসও হয়ে যায়, আর সেই উদাস মনে হাসির ব্যাপারগুলোর স্মৃতিও দুঃখের খাঁজে খাঁজে চোখে পড়ে যেন।

*   *   *

ফালটু শেষ পর্যন্ত বড় হতে পারেনি। বছর দেড়েক সেই আসামের উদ্বাস্তুদের মধ্যে থেকে, ফালটু বলেছিল, উখুণ্ডিতে ফিরে গেলে হয়। তার গজেন কাকা মরে যাওয়ার পরে, সেই এখন সেইসব বাড়িঘর দখল করতে পারে। উখুণ্ডিতে সে বিড়ি বাঁধতে পারবে, তা ছাড়া লোকে বলছে মানসাইঘাটে এখন অনেক কাজ। উখুণ্ডি আর মানসাইঘাট কাছাকাছি। চন্দানি বলেছিল, সে মানসাইঘাট পর্যন্ত যেতে রাজি আছে। সেখানে যদি অনেক মানুষের ভিড় হয়ে থাকে, তবে সেই ভিড়ে লুকিয়ে থাকা যায়। তুমি না হয় উখুণ্ডি চলে যেও ফালটু। মানসাইঘাটে আসার পরে ফালটু চায়ের দোকান দিয়েছিল। অত কম টাকায় আর কোন দোকানই বা হয়? এই সময়ে ফালটু মাঝে মাঝে বলতো, সে উখুণ্ডিতে গিয়ে চন্দানিকে নিয়ে ঘরবাড়ি করে থাকবে। গেরস্থি করবে। সে যে তার কাকাকে খুন করেছে তার কি প্রমাণ? কে দেখেছে, আমি জ্যাক আর ইট দিয়েছিলাম? আর তা যদি দেখেও থাকে, কি প্রমাণ সে নতুন জ্যাক চেয়েছিল, পুরানোটা নয়? ফালটু বুঝতে চাইতো না, চন্দানিকে হেলথসেণ্টার থেকে

জোর করে নিয়ে গিয়েছিল গজেন, তা এতদিনে উখুণ্ডির অনেকে জেনে থাকতে পারে; চন্দানি হাসি চেপে মুখ গম্ভীর করে বলেছিল তখনই, কাকাকে খুন করে না থাকতে পার; তার টাকা আর মেয়েমানুষ নিয়ে পালিয়েছ তো। ফালটু এইরকমই শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল, যেমন সে ছটুর কথাতেও বলেছিল একদিন, সে অত ছোট, অল্প বয়সের, ছটু তার হয় কি করে।

শেষ পর্যন্ত ফালটু সাহস করে উখুণ্ডি যায় নি। বরং চায়ের দোকানে এক পাশে বসে দুলে দুলে বিড়ি বাঁধতো। সন্ধ্যার পরে কোনো কোনোদিন চন্দানির রান্না হয়ে গেলে, নিভন্ত উনানে বিড়িগুলোকে সেঁকে নিতো। সেই বিড়ি নিজেই বাজারের অন্য বিড়ির চাইতে সস্তায় মজুরদের মধ্যে বিক্রি করতো। কিন্তু কোনো কোনো রাতে সে আশ্বস্ত হতে চাইতো—বটু তার না হতেও পারে, ছটু তারই। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, মানুষ মরে ভূত হয় কি না, সে ভূতের মরার আগেকার আক্রোশ থেকে যায় কি না। মানুষ বুঝতে পারুক না পারুক, ভূত কি বুঝতে পারে কেউ নতুন জ্যাক না দিয়ে পুরনো জ্যাক এগিয়ে দিয়েছিল? তা হলে তার বুঝতে পারা উচিত অত বুদ্ধি একজনের ছিল না তখন যে সে আগে থেকে ঠিক করবে, পচা ইটটা গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেলে জ্যাকটা স্লিপ করবেই। সেই রাতে ফালটু বটু ছটু কাউকে চন্দানির কাছে ঘেঁষতে দেয়নি, নিজে চন্দানির বুকের মধ্যে কোলের মধ্যে গুঁজে শুয়ে ঘেমে উঠেছিল ভূতের ভয়ে।

আর ওটাই বোধ হয় ঠিক যে কেউ যদি প্রাণপণে লুকিয়ে থাকতে চায়, তা হলে চেনা মানুষ কাছাকাছি এলেও তাকে সে চিনতে পারে না যেন। কাক চোখ বন্ধ করে নিজেকে লুকোতে, মানুষের বুদ্ধি বেশি, মানুষের চোখের মণিতে বোধ হয় একটা পর্দা পড়ে যায়।

অবাক বোধ হল চন্দানির।

তবে ওটা লেহু মিঞার হাঁটা চলার কায়দাও হতে পারে কিংবা তার সেই কাঁধের উপরে ধামা নিয়ে হন হন করে হেঁটে যাওয়ার কায়দাটাও হতে পারে যে জন্য তাকে দেখা মাত্র চেনা যায় নি। অতবড় ধামাটা বাঁ কাঁধে নিয়ে কেউ যখন হন্ হন্ করে তোমার দোকানের সামনে দিয়ে চলে যায়, তার মুখ কখনও দেখতে পাও না। সে যখন উল্টো দিকে যায়, তোমার চায়ের দোকানের দিকে মুখের ডান দিক পড়বে, তখন সে কাঁধেই ধামাটা। তুমি বুঝতে পার, কিছুদিন পরে, সবজে সবজে ময়লা লুঙ্গি পরা, ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একজন গ্রামের লোক মাঝে মাঝেই, প্রতিদিন না হোক, তোমার দোকানের সামনে দিয়ে, অন্য অনেক মানুষ যেমন যায়, তেমন করে যাওয়া আসা করে। যেন কাঁধের ধামাই প্রমাণ সে হয়তো মানসাইঘাটে কিছু আনে গ্রাম থেকে, আর তা বিক্রি করে

কিছু মানসাইঘাট থেকে কিনে নিয়ে গ্রামে ফেরে। পথের দৃশ্য রোজ বদলায়, সেই সব বদলের মধ্যে সবুজ লুঙ্গি পরা গ্রামের মানুষটা যেন বদলায় না।

কিন্তু এক সময়ে তো সেই গ্রামের মানুষটা তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেতে শুরু করেছিল। এক বিকেলে তাকে রুটি ভাজতে দেখেই যেন, কিংবা রুটি ভাজার সুগন্ধে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। কলাপাতায় করে সেই সদ্যভাজা রুটি আর ঝলে কচু-লতির তরকারি দিলে, তৎক্ষণাৎ সেই রুটি আর তরকারি জড়িয়ে হাতে নিয়ে খেতে খেতে চলে গিয়েছিল। যেন বোবা কিংবা বোকা সেই মিঞা। পরে দোকানের দাওয়ায় কলাপাতার উপরে একটা আধুলি দেখেছিল চন্দানি।

সেদিনই চন্দানির চেনা মনে হয়েছিল ময়লা গেঞ্জির উপরে ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরা, একমুখ দাড়ি সেই মিঞাকে। কিন্তু কি ক'রে চেনা হ'লো? তার দোকানে এসে চা খাচ্ছে মাঝে মাঝে, সে জন্য? তার চাইতে অতীতের কিছু মনে আনতে তার নিজেরই তো অনিচ্ছা ছিল, সে জন্যই হয়তো তাকে হেলথ সেণ্টারের চাষী সেই লেদু মিঞা ব'লে চিনতে পারতো না, অথবা লেদু মিঞাই তখন অনেক গোঁফদাড়ি রেখে বোকাসোকার মতো হাঁটাচলা করে নিজেকে গোপন ক'রে রাখার পরীক্ষা চালাচ্ছিল?

এই সদ্য ভাজা রুটির ব্যাপারটা যেন বেশ আকর্ষণ করে। কুলি মজুররা, অন্তত পাঁচ ছ জন, তখন নিয়ম মতো তার দোকানে রুটি খেতে শুরু করেছে দুপুরের কাজের ফাঁকে। আর সেও সেটাকে লাভজনক মনে করে গাহাক ধরে রাখতে রুটির সঙ্গে ডালও দিচ্ছে তরকারির উপরন্তু। সে জন্য তখন দুপুরের পর পরই, চায়ের পাট তার কিছু আগে মিটলেও দুপুরেও মাঝে মাঝে চা বিক্রি হয়, দুটো উনান জ্বালাতো সে তার কুঁড়ের বাইরে বাঁশের তৈরি বেঞ্চি-মাচার পাশে।

হুলংও এই রুটির গন্ধেই আকৃষ্ট হয়েছিল। তার কোনো পরিচয় নেই মানুষের সমাজে। সে যে কে তা তো সে এখনও নিজেই জানে না। কিংবা সে একজন নাগা সাধু এটাই তার বলার মতো একমাত্র পরিচয়। সেই পরিচয় তার জীবিকাও। প্রথম সুযোগেই খাবার চাইতে এসে সে তার সেই পরিচয় দিয়েছিল। তাকে দোকানের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ভোর রাতে মানসাই এর তীরে দেখা সেই উলঙ্গ সন্ন্যেসির কথা মনে হয়েছিলো। সে সময়ের সেই আতঙ্কটাই ফিরে আসছিলো তার মনে। তখন নির্জন দুপুর। রুটির খরিদ্দারদের আসতে কিছু দেরি আছে। চন্দানি বাইরের উনানে নিজেদের ভাত ফুটিয়ে নিচ্ছিল। সে তো তখন একেবারে একা, উনানের এপারে সে আর তার ওপারে সেই সন্ন্যেসি। পরমুহূর্তে সেই অলৌকিক আতঙ্ক। কেমন করে তার গায়ের কাপড় আপনা থেকেই যেন খসে পড়েছিল, আর তার সেই অদ্ভুত দু পায়ের জোড়

দেখেছিল চন্দানি। ভয়ে আতঙ্কে ফুটন্ত গরম ভাতে সেই নাগার ভিক্ষার পাত্রটাকে ভরে দিতে হয়েছিল। পরে কিন্তু চন্দানির মনে হয়েছিল, এ সেই হেলথ সেণ্টারে দেখা ষাঁড়ওয়ালা না হয়ে যায় না, যার সম্বন্ধে ডাক্তারবাবু বলেছিল।

কিন্তু তখন তো সেই মিঞাও মাঝে মাঝেই, বিকেলের কিছু আগেই, সেই বেঞ্চি-মাচায় বসে, সদ্য ভাজা রুটি আর ফুটন্ত গরম ডাল দিয়ে রুটি খাচ্ছিলই। কিন্তু সবই যেন নিঃশব্দে। কথা কত কম বলে চলা যায়, তাই যেন। রুটির কত দাম দিতে হবে, তাও যেন জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। অন্যেরা কি দাম বলছে তা শুনে নিলেই হল।

*   *   *

চন্দানি দেখল হলং তার কুঁড়ের দরজার সামনে বসে ময়দা ঠাসছে। ছটু তাদের দুজনের মাঝখানে বসে বোধহয় হলং-এর দেয়া একটা ময়দার গুলি চুষছে। চন্দানি ভাবল তা হলে হলং-এর ময়দা ঠাসা দেখেই তার এত করে রুটির কথা মনে পড়ছে।

গত কয়েকদিনে তারা কয়েকবার মাত্র শুকনো চিঁড়া কিংবা চাল-সিদ্ধ খেয়েছে। আজ, বোধ হয়, হলং-এর ভালো খেতে ইচ্ছা হয়েছে, যে আটা সংগ্রহ করেছে সে।

হলং-এর এই রুটি বেশ একটু অন্যরকম। ময়দা ঠাসা হলে ভিতরে লঙ্কার কুচি, নুন, ভিজানো বেসনের পুর দিয়ে চেপ্টা ধরনের কতগুলো বড় বড় গুলি তৈরি করবে। আগুন জ্বালবে। সে আগুন যখন লাল অঙ্গার, তখন গুলিগুলো তার উপরে চারদিক দিয়ে সাজিয়ে দেবে। গুলিগুলির বাইরের দিকটা যখন পোড়া পোড়া, তখন অঙ্গারগুলোও, নিবে আসবে। সেই গুলিগুলোই তখন হলং-এর রোটি হল, ভালো খাবার হল।

চন্দানি জিজ্ঞাসা করল, জল আছে তো। এই বনে জলটাই সব চাইতে বড় সমস্যা। ভালো জল পেতে হলে সেই মানসাইঘাটের টিপ কলে যেতে হবে দু আড়াই মাইল হেঁটে, নতুবা হলং নদীর সেই ঝর্ণার মতো স্রোতটার কাছে যেতে হয় মাইল দেড়েক হেঁটে। মানসাইঘাটে যাওয়া মানে বনের বাইরে যাওয়া। হলংয়ের ঝর্ণায় যাওয়ার পথ দিয়েই তো বাঘটার যাওয়া আসার পথ। তবু সেই জলই আনতে হয়। বনের বাইরে যাওয়া যায় না।

হলং বলল, 'এক হাণ্ডি জল আছে।'

চন্দানি ভাবল, লেহু মিঞা নিজের জন্য জল সংগ্রহ করতো না। এখানে ঋতু বলতে শীত আর বর্ষা। শীত আর বর্ষার মধ্যে কয়েকদিন এক ফালি গ্রীষ্ম নামে। শীতে হলং-এর ঝর্ণার জল এত স্বচ্ছ আর মিষ্টি যে ভাবতে হয় না। চন্দানি নিজের চোখেই দেখেছে। লেহু মিঞা সেই ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে, জলের উপরে মুখ নামিয়ে,

ফুঁ দিয়ে কুটো টুটো সরিয়ে ফেলে, হাত না লাগিয়ে, পেট পুরে জল খেল। কখনও কখনও লেড়ু মিঞার কাজকর্মে না-হেসে উপায় থাকে না। মানুষ নাকি বাঘের মতো জল খায়!

তো তখন কাকের মতো চোখ বন্ধ করে না থাকলেও চন্দানি চা বা রুটির, গাহাকদের কারো মুখের দিকেই চোখ তুলে তাকাতো না। যে লুকিয়ে আছে, তাকে তো মুখ আড়ালে রাখতে হয়, আর কিছু না করুক মুখ নামিয়ে চলতে হয়।

সেদিন বোধ হয় কোন কারণে রুটি করার ব্যাপারটায় দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিকেল হয়ে যায় প্রায় তখন। দুই উনান জ্বলছে হাঁ হাঁ করে, কুঁড়ের বাইরে, পথের ধারে। একটায় তরকারি হচ্ছে, অন্যটায় ডাল ফুটছে। সেই মিঞার বোধ হয় সেদিন খুব ক্ষুধা। তাকে অবশ্য মিঞাও বলা যায় কি? অনেক হিন্দু কৃষক, মজুরও দাড়ি রাখে, কাপড় সংক্ষেপ করতে লুঙ্গি পরে। চন্দানির মনে হচ্ছিল, সে লোকটি রুটি হল কিনা দেখতে, আধঘণ্টায় বার দু তিন, দোকানের সামনে দিয়ে চক্কর খেয়ে গেল। তা দেখে তাড়াতাড়ি ময়দা ঠাসতে বসেছিল চন্দানি। তার বটু আর ছটু কুঁড়ের মধ্যে ঘুমাচ্ছে। ছটুর তখন মাস তিন চার হবে বয়স। ফালটু রাস্তার ধারে ঘাসে কুঁড়েটার ছায়ায় বসে বিড়ি বাঁধছে। তখন সেই মিঞা এসে বেঞ্চি মাচাটায় জেঁতে জুতে বসে পড়ল। যেন রুটির অপেক্ষায়।

আর ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটে গেল। উখুণ্ডির ড্রামাটিক পার্টির সেই কর্তা, হুবহু সেই চেহারা, বরং আরও যেন মোটা হয়েছে আর গোঁফও রেখেছে, ফালটু যে ভাবে ভূত আসতে পারে ভেবে ভয় পেয়েছিল, ঠিক তেমন ভাবে মাপা মাপা পায়ে ফালটুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কোন সন্দেহ নেই, না, সে, সেই গজেন। সেই গজেন বাঘিসা, সেই হাঁও'।

যেমন মাপা পায়ে বিনা দ্বিধায় এগোন, তেমন মাপা নাটকের কায়দায় কথা বলা। বেশ স্পষ্ট করে সে বলল, 'তৈরি হও। আর আধঘণ্টায় লাশ পড়বে তোমার। মানসাই-এর চরে যেতে যে সময়।'

চন্দানি কুঁড়ের আগরের পিছনে পালালো। গজেন হাত বাড়িয়ে ফালটুর চুল ধরে তাকে টেনে তুলল। ফালটু ভূত দেখার মতো জড় হয়ে গিয়েছিল। তার বিড়ি বাঁধার সরঞ্জাম ছড়িয়ে গেল। দু-এক মুহূর্তে সে গজেনের হাত থেকে চুল ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করল। গজেন পা বাড়িয়ে ল্যাং মেরে তাকে ফেলে দিল। আর সে মাটিতে পড়তেই তার মুখে লাথি মারল গজেন। এই বোধহয় শেষ হল, সেই রোগা ছোকরা ফালটু। সে উঠে দাঁড়াল। বুকে হাত রেখে পালাতে চেষ্টা করল। গজেন দুপা গিয়ে

তাকে ধরেই চড় কষাল। ফালটু ঘুরে পড়ে গেল আবার। কিন্তু ফালটুও বোধহয় মরিয়া হয়েছিল ততক্ষণে। বুঝতে পারছিল গজেন তাকে মেরে ফেলবে। উঠে, না-পালিয়ে বরং তেড়ে এল গজেনের দিকে। জাপটাজাপটি শুরু করল তারা। মনে হল ফালটু গজেনের বুকে কিংবা বাহুতে কামড়ে ধরেছে, আর গজেন ফালটুর গলা টিপছে দুই হাতে।

এই সময়েই কাণ্ডটা ঘটে গেল। সেই সবুজ লুঙ্গির কৃষক যে রুটির লোভে বসেছিল, (এখন তো চন্দানি জানেই, সে লেদু মিঞা ছাড়া আর কেউ নয়। নতুবা অমন বোকা কাজ হয়?), সেই লেদু মিঞা, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ফুটন্ত ডালের ডেকচিটাকে দু'হাতে কানা ধরে নিয়ে, দৌড়ে গেল! আর যেখানে সেই লড়াই সেখানে আধ মিনিটে পৌঁছে, সেই ফুটন্ত গরম ডাল টা গজেনের সারা গায়ে ঢেলে দিল। একবারে নয়, ঝপ করে নয়, বেশ কায়দা করে পিঠ, পাছা, পা এমন করে দেখে দেখে।

লেদু মিঞা ছাড়া কে এমন হাসির কাণ্ড ঘটাতে পারে?

* * *

সেই লেদু মিঞা বলেছিল, হয়ত সে সব তার অনেকদিন হেলথসেণ্টারে ডাক্তারের কাছে থাকার ফল, চন্দানি তোমার ছেলেদের কিন্তু এ জল খাওয়ালে চলে না। আর মশারি না টাঙালে জ্বর হবে। এই বনে ওষুধ পাবে কোথায়? হলং কিছুক্ষণ আগে বলেছে জল আছে। অর্থাৎ সিদ্ধ করা জল।

তো, সেদিন, তার পরেও, চন্দানির সেই চায়ের দোকান আর রুটির ক্ষুদে হোটেলের সামনে বসেই রইল লেদু মিঞা। বরং একবার তাগাদা দিয়ে বলল রুটি হয় তো, তরকারি রুটি দিলেই চলবে। ফালটু আর গজেন দুজনেই লেদুর সেই আক্রমণে সেই দোকানের সামনে মাটি নিয়েছিল। আগে গজেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে, একই সঙ্গে গেলাম মরলাম আর পুলিস পুলিস করতে করতে দৌড়াল। একটু অন্যপথে বিপরীত দিকে কোঁখ ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে ফালটুও ছুট লাগলো।

শুষ্ক বিধ্বস্ত ভয়ে রক্তহীন চন্দানিকে লেদু মিঞা আবার হাত চালিয়ে রুটি বানাতে তাগাদা দিল। আর নিজে সেখানে স্থির হয়ে বসে রইল। এই সময়েই ভয়ে ভয়ে চন্দানি মুখ তুলে সেই লুঙ্গিপরা অদ্ভুত কাজকর্মের কৃষকটিকে বারবার দেখতে চেষ্টা করেছিল, আর ভাবছিল চেনা চেনা লাগে কেন? কিছুদিন থেকে কখনও কখনও রুটি আর চা খেতে আসে বলে? দুপুর গেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলে তখনও সেই কৃষক তেমন স্থির বসে। শেষে যখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে, সেই কৃষক বলেছিল, চন্দানি, তোমরা বা কি করেন এলা? ফালটু আর নাই আইসে। গজু

তো হাসপাতালৎ থাকি যাইবে এলা মাসখানেক। কিন্তু পুলিস আইসবে।' তো, চল।'

হঠাৎ তখন গলার স্বরে, কিংবা তাকে সেভাবে ডাকতে শুনে, লেহু মিঞাকে চিনতে পেরেছিল চন্দানি, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল, এলা মুই কি করং মিঞা।' সে যেন কতদিনের সঞ্চিত কান্না।

লেহু বলল, 'চপ্। নয়তো বনৎ চলি যান। সড়ক ধরি উত্তর যান, তো ডাইবাসল আসি গেইলে বাঁয়ে পুরানা সড়ক ধরেন, বন আসি যাইবে।'

'—বন? বনৎ বাঘ নাই থাকে?'

'—থাকে তো।'

'—বনৎ দেও নাই থাকে?'

'—থাকির পারে। কাঁয় দেখছে?'

'—তো বনৎ খারাপ মানুষ নাই থাকে?'

'—নাই থাকে, ইটা কবার পাই।'

বনে বাঘ থাকেই, ভূত অপদেবতা থাকতেও পারে, কিন্তু খারাপ মানুষ নাই, এ শুনেই যেন চোখের জল মুছে মুখ তুলেছিল চন্দানি। 'তো যাঙ মুই' বলে সে তার সেই ঝুঁড়ের দোকান থেকে বেরিযে পড়েছিল।

তখন লেহু মিঞাব হঠাৎ যেন চোখে পড়লো। বলেছিল, 'আঃ হা তোমার ফিন বাচ্চা আছে।'

চন্দানিবও যেন তখনই মনে পড়েছিল, তার বটু আর ছটুর কথা। না, তার পক্ষে সত্যি আর কখনও ছেলে হওয়ার আগেব, সেই নিজের মতো নিজে থাকার, কুমারী হওয়া সম্ভব ছিল না।

চন্দানি তার বটু আব ছটু দুই ছেলের কথা বললে, লেহু মিঞা বলেছিল, 'আঃ হা।'

চন্দানির এখন মনে হল, লেহুব দুই 'আহা'য় তফাৎ ছিল। চন্দানি বটুকে পিঠে বেঁধে, ছটুকে, তখন তো মাস দু তিন বয়সের, বুকে জাপটে ঝুঁড়ের দরজাতে এসে দাঁড়ালে, লেহু মিঞা বলেছিল সদ্য ভাজা রুটিগুলোকে কাপড়ে বেঁধে নিতে, আর একটা ঘটিতে খাওয়াব জল, আর যদি ঘরে চিঁড়া থাকে, তবে তার কিছু সে সেই জলের ঘটিতেই ডুবিয়ে নিতে পারে।

এখন তো বোঝাই যায়, লেহু মিঞা সেদিন আগে থেকেই ব্যাপারটা আঁচ করে চন্দানির সেই ঝুঁড়ে দোকানকে মাঝখানে রেখে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল। এরকম বোঝাই যায়, চন্দানি তাকে চিনতে না পারলেও লেহু মিঞা প্রথম থেকেই তাকে

চিনেছিল, সে জন্যই প্রথম দিকে কাঁধের ধামায় মুখ আড়াল করে সরে সরে যেত। হয়তো সে উখুণ্ডির সব খবর রাখতো। লেছু মিঞার নিজের ভাষায়, বাঁচতে হলে ধূর্ত হতে হয়, তা মানুষখেকো কিংবা অন্য কোন রকমের বাঘই হও। হয়তো, সেদিন গজেন তার দোকানের দিকে আসার আগেই, লেছু মিঞা তাকে চেলা-সাগরেদ নিয়ে মানসাইঘাটে ঘুরতে দেখেছিল,।

তাই বলে লেছু মিঞার ওই ব্যাপারটায় কিন্তু না-হেসে পারা যায় না, যদিও হয়তো গজেনের পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল তেমন করে আপাদমস্তক পুড়ে যাওয়া। সে তো গেলাম গেলাম করছিল, যন্ত্রণায় অন্ধের মতো টলছিল, পুলিশের কাছে আশ্রয় চাইছিল, কথা বলতে না পেরে আঁ আঁ করছিল। ভাবো সেই গজেন ঢালি, গজা বাঘিলা, গজা হাঁও, যে নাকি তখন চন্দানির কাছে ভূত অপদেবতার মতো অসীম শক্তি ধরে। কেউ ভাবতে পারে ফুটন্ত ডালের হাঁড়ি তেমন মারাত্মক অস্ত্র হয়?

লেছু মিঞা, পরে জেনেছিলো চন্দানি, উখুণ্ডির অনেক খবর জানে যা চন্দানি জানে না। সেই যে কালোরাতে যখন চন্দানির মৃত্যু হয়েছিলো, তার কিছুক্ষণ বাদেই লেছু গাড়ির চাকার দাগেই বুঝতে পেরেছিল চন্দানির কি অপঘাত হ'ল। তার দ্বিতীয় দিনে গজেনের নিজের জিফের তলায় চাপা পড়া শয়তানরা মরে না বলেই মাস তিনেক হাসপাতালে থেকে তার বেঁচে ওঠা, দু বছর আগে ব্লকের সভাপতি হওয়া, এসব খবরও জানে লেছু মিঞা। এখন গজেন নাকি পিরধান মানুষ এ অঞ্চলে। তাকে পার্সেণ্ট না দিয়ে কেউ ইস্টিমেট টেণ্ডার দিতে তার ব্লকে ঢুকতে পায় না। দুইখানা ট্রাক আর একটা ফটফটিয়া তার, আর এখন তার বাড়িটায় দোতলা হচ্ছে। বলতে পারো, এই অঞ্চলে সেই প্রথম দোতলা।

চন্দানির দুই কারণে অবাক লাগছিলো। উখুণ্ডির সেই গজেন হাঁও'-এর এই উন্নতি আর সেই ডাক্তার বাবুর সেই বোকা সোকা লেছু মিঞার মুখে এই সব কথা যা শুনে চন্দানি নিজে সব বুঝতে পারছে না। ইস্টিমেট, টেণ্ডার, পার্সেণ্ট শব্দগুলোই বা লেছু মিঞা কি ক'রে উচ্চারণ করছে? ইংরেজি নয় শব্দগুলো? ফুটন্ত ডালের হাঁড়িকে অস্ত্র করার মধ্যে নিশ্চয়ই এক রকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে। ওটাও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লক্ষণ বলতে পারো ডাক্তার বাবুর কোয়াটার সংলগ্ন পড়ো জমিতে তত ফল, সবজি ফলানো। কিন্তু—

হয়তো, চন্দানি ভাবলো, উখুণ্ডিতে থেকে গেলে, সে নিজেও এসব শব্দগুলোকে জেনে ফেলতো, এতদিনে। সেই ড্রামাটিক পার্টির উন্নতি নিজের চোখে দেখতে পারতো। একটু পরে আবার চন্দানি ভাবলো, বনে থাকলে মানুষকে ধূর্ত হতে হয়ই। লেছু

মিঞাকেও ধূর্ত হ'তে হয়েছিলো। কারণ বন তেমনই জায়গা একটা পা ভুল নাড়লে, একবার দেখে নিতে শুনে ভুল হ লে মৃত্যু।

নাকি সোজা বুদ্ধিও? যেমন জল-চিঁড়া কেন? বনে জল নাই, যা আছে তা শিশুর পক্ষে মারাত্মক। বনে গোরু নাই যে বটু দুধ পাবে। বটুকে বাঁচাতে ফোটানো জলে ভিজানো চিঁড়া লাগে। পরে লেদু মিঞা বটুকে পোড়া মাছ, পোড়া ডাহুক, পোড়া বন মুরগীর নরম মাংস খেতে শিখিয়েছিল। বটুও শিখে উঠেছিল যেন, পুরো একদিন শুধু চিঁড়া ভিজানো জল খেয়ে থাকলেও কাঁদতে নেই, বডজোর ছটুর খাওয়া হলে, সে মাই ছেড়ে দিলে, একটু তা খেয়ে নিতে পার। কারণ বনে মাছ, ডাহুক, বনমুরগী চাওয়া মাত্র পাওয়া যায় না। তারাও সহজে বঁড়শির ফাঁদে পড়তে চাইবে কেন?

কিন্তু রাত হতে কতক্ষণ। মানসাইঘাট ছাডতে সন্ধ্যা শেষ, রাত হয়েছিল। ডাইভার্সান সম্বন্ধে আন্দাজ ছিল চন্দানির। কিন্তু তার কাছাকাছি যেতেই, জঙ্গলগুলো নড়ে উঠেছিল যেন, সে যে হাঁটছে বনে তা সে বুঝতে পারছিল না। অথচ তা তো বনই নয় তখনও। কি করে ঢুকবে সে বনে? আর ঠিক তখনই অউম্ অউম্ আঁ আঁ করে বাঘ ডেকে উঠেছিল। চন্দানি চিৎকার করে দৌড়ে পালাচ্ছিল পিছন ফিরে। পিছন থেকে লেদু মিঞা বলেছিল আঃ হা। সে তো ভাবতেই পারে নি লেদু মিঞা তার পিছনে আসছে। কোন শব্দই ছিল না তো। লেদু মিঞা ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, 'বাঘা ডাকলে নড়া নাই। চেঁচান নাই। বাঘা বলা নাই। তো সেই বুডার বেটা জানিতে না পায়, তোমরা আছেন বনৎ। যেদু মানুষখাকিয়া নাই হয় চলি যাইবে।'

'—আর যেদু মানুষখাকিয়া?'

লেদু মিঞা শোনা যায় কি না-যায় এমন মৃদু স্বরে বলেছিল, 'আধামিনিট ঝাপটা ঝাপটি, তার বাদে কিছু আর না-বুঝেন তোমরা। কামড়ে মাংস খায়, শব্দ। না-বুঝেন।

চন্দানি ভয়ে কেঁপে উঠেছিল, আবার দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন লেদু মিঞা পিঠে হাত রেখেছিল। মানুষখেকোর কথাগুলো ভয় দেখাতে নয়, বরং আশ্বাস দিতে, তা তখন বোঝা যাচ্ছিল না ব'লে পিঠে হাত রেখেছিল লেদু মিঞা। আর সেই ছোঁয়াতে মনে হয়েছিল চন্দানির, অন্ধকার চারদিক মুছে দিতে থাকলে অনুভব করতে আরও সুবিধা হয়েছিল, যে সে যেন এক অদ্ভুত পথ দিয়ে আবার সেই ডাক্তারবাবুর, লেদু মিঞার হেলথসেন্টারে ফিরে যাচ্ছে।

ছলং তার রুটির সেই বড় বড় গুলি পাকানো শেষ করেছে। এখন আগুন জ্বালবে।

স্বাভ অনেকটা হলে বনজঙ্গলের হিসাবে, এ আগুন সহজে কারো চোখে পড়ার কথা নয়। জন্তুরা বরং এড়িয়ে যাবে, এক মানুষখেকো ছাড়া। মানুষ যদি এই বনে আসেই হঠাৎ আগুন চক্কর দেখলে বরং অপদেবতা মনে করবে। নতুবা বাঘের ডাকের পাশে কে আর আগুন দেখায়? মানুষখেকোরা নাকি আগুন দেখলে বোঝে, ধারেকাছে তাব আহার থাকবে।

অবাক হয়ে গেল চন্দানি। গজুর সেই ব্যাপারটা আর মানুষখেকোর মানুষ খাওয়া কি একই ব্যাপার? অন্ধকারের এক ভয়ঙ্কর ধাক্কা, যখন তোমার জ্ঞান নাই আর। তারপর কিছু বুঝতে চেষ্টা করছ যেন, তখন কুৎসিত গন্ধে বেদম হচ্ছ যেন বুঝতে পারছ কেউ কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে মাংস, নাড়িভুড়ি টেনে ছেঁড়ার শব্দ হচ্ছে; মরে গেছ, কিছু বলতে পারছ না। মরা কাছিমের পচা খোলা।

যেন তাড়াতাড়ি করে দৃশ্যটা থেকে চোখ সরাতে গিয়ে চন্দানি দেখল, ছটু পথের সেই পিচেব চাতালে হলং-এর আগুনের পাশে শুয়ে পড়েছে, নিজের গায়ে হাত চাপড়ে নিজেকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছে।

চন্দানি ছটুকে বুকের মধ্যে তুলে নিল। মাই খাইয়ে দিলে ঘুমাবে। আর তখন তার মনে পড়ল, একেবারে একা কিন্তু বনে থাকতে সে পারে না। বিশেষ ছটুকে নিয়ে। বলতে পারো হলং এক রকমে বোকা। কিন্তু তবু সে একলাকে দোকলা করে। দেখ এই বন যেখানে অন্ন নাই, পানি নাই, কাঁটা আছে, সাপ আছে। বাঘ ডাকে। বটু হারায়। হলংকে দরকার যেন ছটুকে দেখে রাখতে, বটু হারানোর পরে আরও। কিন্তু এই কয়েক মাস আছে বলেই সে থাকবে কেন? কি লোভে? এখানে ষাঁড়ের মাথা চালিয়ে ভাগ্য গোণানো হয় না, নাগা বলে সিধা দেয় না কেউ।

কথাটা মনে পড়তে ছটু যেখানে খাচ্ছে সেখানে চোখ নামাল চন্দানি। আগুনের লাল আভা সেখানে। তার একটু অবাক লাগল যেন। সব পুরুষেরই লোভ এখানে? যেমন ছটুর, এমন কি ষোল সতরো বছরের ফালটুরও ছিল। কিন্তু হলং পুরুষ হয়ে জন্মালেও এখন আর—কিন্তু, তা হলেও।

ভাবতে গিয়ে আরও মুখ নামাল সে। দেখতে চেষ্টা করল, হলং তাকে দেখছে কি না। সে অস্পষ্টভাবে, স্বপ্ন স্বপ্ন যেন, স্থির করল : কাল জল আনতে যেতে হবে সেই হলং ঝর্ণায়। শীত শীত ভাব হওয়া থেকে, বটু হারানোর সময় থেকে স্নান আর হচ্ছে কবে? কাল খাওয়ার জল আনতে হলংকে সঙ্গে নেয়া ভালো। দু'কলস একবারে আসবে। আর তখন ছটুকে পাহারা দেয়ার জন্য হলংকে ঝর্ণার কিনারায় রেখে স্নানে নামলে হবে। কি উপায়?

কিন্তু চিন্তাটার ধারগুলো যেন একরকমের অস্বস্তির গরমে অমসৃণ হল।

হলং বলল, 'তো, তোমার এই বুড়ারবেটি যদি সকাসের সেইটা হয়, তোমার অষুধের দোকানের বাবুগুলাকে বলি দিলে হয়, সকাসের মানুষ আসিয়া ধরি নিয়া যাইবে। অত আঁউ আঁউ কেনে এইটে।'

বাবটাকে ধরে নিয়ে গেলে কিছু সহজ হয় বনে থাকা? যে বনে নিজের পায়ের নিচেই মরা ডাল-পালা ভাঙলে হৃদপিণ্ড থমকে যায়, কালো বরফ জলের স্রোত ওঠে পিঠ বেয়ে; যে বনে ভয়ে তখন কাঁদতেও পারো না। যে বনে মানুষের ভয়ে, মানুষখাকিয়ার ভয়ে মানুষখাকিয়ামানুষের আতঙ্কে কান্না গিলে থাকতে হয়।

*　　　*　　　*

আর একদিনের সকাল হচ্ছে তা হলে? এই ভেবে চন্দানি তার ছোট মশারিটার বাইরে এল। পাখির ডাকই বটে চারদিকে। আর কিছুদিনের মধ্যে এই শীতটাই কষ্ট দিতে শুরু করবে। সে দেখল, ঘরের ঝাঁপের প্রায় গা ঘেঁষে হলং-এর ষাঁড়টা, আর ঝাঁপ আর ষাঁড়টার মধ্যে যে সংকীর্ণ জায়গাটা সেখানে হলং ঘুমিয়ে আছে।

ঘরটা হলং-এর হতে পারে, বলেছিল লেদু। হলং না থাকায় ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়েছিল, আর চন্দানি দখল করেছিল লেদু মিঞার পরামর্শে। হলং কোনোদিন ফিরবে মনে হয়নি তখন। খড়ের ছাদের এখানে ওখানে ফাঁক, বেড়া এখানে ওখানে খসা, পরিত্যক্ত রাস্তার উপরে কোন পরিত্যক্ত দোকান ঘর বলে শক্ত মেঝেটা শুধু ঠিক আছে। বন থেকে শুকনো কাশ, নল খাগড়া এনে চার পাঁচ দিনে ধীরে ধীরে মেরামত করেছিল লেদু মিঞা, কিন্তু তা ভিতর থেকে। বাইরের দিকে কুঁড়েটাকে আগের মত পুরনো মনে হতো তখনও। নতুন হলে মানুষের চোখে পড়ে যায়।

কুঁড়ের মেঝেটাই প্রমাণ করে এটা হলং-এর আগেও আর কারো ছিলো। আর হলং প্রথম যখন আসে তখনই কুঁড়েটা ভগ্নস্তূপ। হয়তো লেদুমিঞা কোন দিন হলংকে আর তার ষাঁড়টাকে কুঁড়ের কাছে দেখেছিলো। তাতেই কুঁড়েটার তেমন নাম হয়েছে। হলং সব সময়ে কুঁড়েটাকে ব্যবহার করতো না। চন্দানি বনে আসার পরেও কয়েক মাস হলং এদিকে আসে নি। পুরো বর্ষাটা কেটে যাওয়ার পরে হলং এসেছিলো। আর তাকে দেখেই যেন লেদু মিঞা বন থেকে চলে গিয়েছিলো। এটা কিন্তু ভাবার কথা বর্ষাকালের রাতগুলো লেদু মিঞা কোথায় কাটাতো। এই কুঁড়েতে? কিংবা বন থেকে বেরিয়ে গিয়ে জমি পাহাড়া দেয়ার যে সব কুঁড়ে কখনও কখনও দেখা যায় তার কোনটায় রাত কাটাতো? নাকি তখন সেই রোয়া গাড়ার সময়ে ক্ষেত মজুরের দলে মিশে গিয়ে কোন কৃষকের গোয়াল ঘরে বলদদের মধ্যে বর্ষার রাতগুলো কাটাতো?

এটাই ঠিক হবে? লেহ্ মিঞার মাটিতে কিছু তৈরী করার দিকে বরাবর ঝোঁক। কিছু তৈরী না ক'রে সে থাকতে পারে না। হয় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু তৈরী করবে, না হ'লে কাশ দিয়ে নল খাগড়া দিয়ে কিছু বুনবে, তা সে মাথাল হ'ক, চুবড়ি হ'ক, কিংবা ফাঁদ। এই বনে সে চাষ করতো না, কারণ চাষ থেকে প্রমাণ করা যায় এখানে মানুষ থাকে। তাই ব'লে সে একেবারে থেমেও থাকে নি। পর পর দু তিনটে গাছে লতিয়ে ওঠা চালকুমড়ো আর কুঁড়ের চাল ঢেকে হলুদ ফুলে ভরা ধুঁধুল তার প্রমাণ।

কুঁড়েটায় না হয় হলং কখনও কখনও থাকতো চন্দানি বনে আসার আগে, কিন্তু হলংই বা কেন তেমন এসেছিলো। এমন হ'তে পারে তখন বাঘের এত উপদ্রব ছিলো না, তা হ'লেই বা বনে কেন? এখানে কার ভাগ্য গুণবে, কেই বা ভিক্ষা দেবে?

হলংকে ভাবতে গিয়ে হলং-এর সেই মানুষের তৈরী করা খুঁতটার কথা মনে পড়লো। ওটা তো ওর জীবিকার উপায়, তা হ'লেও ও কি কখনও কখনও এক যন্ত্রণায় এমন হ'য়ে পড়ে যে মানুষ শব্দটাই বিষ হ'য়ে যায়? আহা, ও যেহ্ ধানের রোয়াগাড়ে, ধানও না হয় বোধায়। অন্যদিকে মানুষ বিষ হ'য়ে উঠলে এই কুঁড়ে ছাড়া আর কি থাকে কার? যেহ্ তাই হয়্যা থাকে। এতদিনেও অভ্যাস হয় নি রাত্রির কুঁড়ে। গা শির শির ক'রে উঠে, কাঁটা কাঁটা হয়।

এই কুঁড়েতে কাটানো প্রথম সেই রাতই যেন ফিরে আসে ভাবলেই। সারা রাত ঝিঁঝিঁর ডাক, থেকে থেকে বাঘের ডাক। দরজা জানলা নেই এমন নড়বড়ে কুঁড়ের মধ্যে সারা রাত দমবন্ধ করে কেটেছিল চন্দানির।

সকাল হতেই চারদিকটা দেখবার জন্য নিচু হয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াতেই প্রায় শূন্য থেকে যেন লেহ্ মিঞা দেখা দিয়েছিল। কোথায় ছিল সে সারারাত?

এখন তো জানাই গিয়েছে, সে রাতে ঘুমাতো না। সারারাত বনে চলে বেড়াতো। হয়তো বন ছেড়ে এগ্রামে সেগ্রামেও চলে যেত রাত হলে। যেন বাঘেরা ঘুমালে সেও ঘুমাতো। বাঘেদের চলার সময়ে সেও চলে বেড়াতো। সে যে রাতে বন ছেড়ে চলে যেত কখনও কখনও, তার প্রমাণ তো চন্দানির মানসাই ঘাটের কুঁড়ে থেকে তার মশারি, মাদুর আর তোবড়ানো অ্যালুমুনের হাঁড়িকুঁড়ির এঘরে থাকা। সকলের চোখ এড়িয়ে রাতে ছাড়া কি করে আনবে সে সব? দিনের বেলায় লেহ্ মিঞা ঘুমাতো, একদিন সে নিজেই তার সেই দিনে ঘুমানোর জায়গা মাঝামাঝি উঁচু পথটার সেই চালতাতলার চাতালটাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

'মশারি লাগান নয়তো ছেলেক জরে ধরবে। ছেলেক ফুটানো পানি খাওয়ান, নয়তো প্যাটের ব্যারাম ধরবে।' কিন্তু উপদেশ দিয়ে লেহু মিঞা নিজে কি করতো? সেই কম্বলটার ভরসা? শীত আর মশা তাতেই হার মানতো? আর তাকে বনের জানোয়ারের মতো, গুঁড়ি মেরে, ঝর্ণার জলে মুখ লাগিয়ে, জল খেতে বনে আসার প্রথম সকালেই দেখেছিল চন্দানি।

আর সেদিনই দেখেছিল কি করে মাছ পুড়িয়ে খেতে হয়। সেটা বোধহয় হাত দেড়েক লম্বা, ধরলে মুঠ ভরে যায় এত মোটা এক কুচলা মাছ। যেন একটা কালো রঙের সাপই। মাছ পোড়ানো শুধু নয়, মাছ ধরা, পাখি পুড়িয়ে খাওয়া, এসব লেহু মিঞাই শিখিয়েছিল। মানুষটা হেলথসেণ্টারেও কৃষিকাজে ওস্তাদ ছিল, বনের ব্যাপারেও যেন ওস্তাদ। কাঁচা আঁঠিয়াকলা পুড়িয়ে খাওয়া যায়, বোধহয় তারই আবিষ্কার। কি কশ্, কি কশ্! পেটে রাখলে ক্ষুধা মেটে।

যেমন আবিষ্কার বনে একদিনে একবারের বেশি খাওয়া দরকার করে না। বাঘেরাও তা জানে। যেমন একদিন একটা পুরো বনমোরগ পুড়িয়ে খেতে পারলে, পরের দিন না খেলেও চলে। তখন বনে আসার দিন পনরো হয়ে গিয়েছে। চন্দানি নিজে একটু হেসে বলেছিল, 'ঠিকই এই আইন, বনৎ রোজ রোজ পাখি কাঁয় ধরিরে পায়।'

বনে বনের আইন মানতে হয়। সব সময়েই লোহা আর দেশলাই যেন সঙ্গে থাকে —এমন সব আইন অনেক রকমের। কিন্তু সব আইন মানা সহজ ছিল না। রাতের অন্ধকার নামতে না-ঘুমানোর জন্য সব চাইতে উঁচু পথের উপরে, সেই কুঁড়েতে চলে যেতে হবে। ওদিকে বনের প্রান্ত, ওদিকে গ্রামও নেই যে বাঘরা যাবে। তারা যেন লেহু মিঞার আইন মানে! ঘুম? ছেলে দুটিকে জাপটে ধরে সারারাত বসে বসে থামা। দিনের বেলা বনৎ ঘুরবে, তা শুধু খাদ্য সংগ্রহ করতে নয়। বেপরোয়া কোনো মানুষ যদি বনে ঢোকে সে যেন না দেখে। কিন্তু নিচের জঙ্গলে যে বাঘ সারারাত ডাকাডাকি করে, তারা কি দিনের আলোয় মিলিয়ে যায়? থাকে না বনে? কি কথা! বাঘের সঙ্গে দেখা না হয় তো হইল। তা যেন তোমার ইচ্ছাতে হবে। ওদিকে লেহু মিঞাই নিজে বলেছিল—একটা নয় বাঘ।

মনে হয় এ বনের নয়। একটা বুড়ো বাঘ যেটা সম্ভব মানুষখেকো। আর একটা বাঘিনী হবে। মানুষখেকো নাও হতে পারে। কার ডাকে কে এসেছে এই বনে তা বলা যায় না। কিংবা দুটোই অন্য বন থেকে এসেছে একে অন্যকে ডাকতে ডাকতে। তা বাঘ থাকা ভালো বনে, মানুষ আসে না। এ গুলো কি গল্প, সময় কাটানোর?

নাকি চন্দানিকে বন চেনানো? চন্দানি বলে ফেলেছিল, 'সুখের শেষ নেই।' লেন্থু মিঞাও হেসে বলেছিল, তা হলে চন্দানির ভয় কমেছে।

রাতে যদি চন্দানির ঘুম না হয়ে থাকে তবে সেও চালতা তলায় চাতালে বিশ্রাম নিতে পারে। যেন চালতা তলাটা কখনও বাঘের চোখে পড়ে না। পড়ে কিনা তার প্রমাণ চন্দানি দিতে পারে আর যখন এটা বলছে লেন্থু মিঞা সে হয়তো তখন তার ধামা কাঁধে নিয়ে বনের বাইরে যেতে তৈরি হচ্ছে। চন্দানি একা থাকবে বনে। এরকম একদিন চন্দানির মনে হয়েছিল কি দরকার ছিল নুন আর মরুচের কথা বলে? পোড়া মাছ আর পোড়া পাখি নুন লঙ্কা ছাড়া খেতে গেলে—কিন্তু এনেই বা কি লাভ হবে? নুন থাকল কুঁড়েতে, আর দু মাইল দূরে কোনো ভিজে ভিজে ঘাসের জমিতে হয়তো একটা ছোট কাছিম পুড়িয়ে খেতে বসেছে তারা।

কিন্তু বনে থাকতে হলেও লোকালয়ে যেতেই হয়। ধামায় কোনোদিন মোচা, আধপাকা বুনো আঁঠিয়া কলা, বনের ডুমুর, এমনকি সুতো বঁড়শির ঝুমকোফাঁদে ধরা দু একটা পাখি থাকতে পারে, যার বদলে আটা আর নুন কিংবা একটা গঞ্জি কেনা হয়। কিন্তু একেবারে খালি ধামাও থাকে। আর তা তো কাঁধে রেখে মুখ ঢেকে চলার কৌশলই। আর তা চন্দানি নিজেই সেই মানসাই ঘাটে দেখেছিল। বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। কত সহজে নিজেকে গোপন করে। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল চন্দানি, যে সেই হেলথসেণ্টারের জমিটুকুতে দিনরাত ফসল ফলানোর কাজে মেতে থাকতো, এখানে এত জমি সে কেন তা কাজে লাগায় না। লেন্থু মিঞা বলেছিল, তা হলে তো মানুষকে ডেকে আনা হল। কারো চোখে পড়লে সে কি আর ফিরে যাবে?

চন্দানি বনে আসার মাস দু এক পরে লেন্থু বলেছিল, সেদিনই বিকেলে মানুষখেকোটাকে কাদম চা বাগানের কাছে মেরে ফেলেছে।

চন্দানি বলেছিল, তোমার যেন দুখ হচ্ছে মিঞা।

—দুঃখ না, ভাবনা। বাঘিনী যদি চলি যায়?

—বনও শুকায় তবে?

—ঠিকই তো। তিন দিনৎ মাঠ করি ফেইলবে।

একই কথা বারবার। একই বনে ঘোরা।

চন্দানি আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে হলং-এর ঘুম ভাঙাল। 'উঠো, হলং, জল আনা লাগে, বহোৎ দিন ছান্ নাই, ছান করি নেং আইজ।'[1] সারাদিন বনে কাটানোর জন্য তারা বেরিয়ে পড়ল।

আর তখন হঠাৎ চন্দানির মনে হতে থাকল: কি অস্থির এক অবস্থা। আগের

মুহূর্তে বুঝতে পারো না, পরের মুহূর্তে কি হবে। আজ বারবার দেখেও বলতে পারো না, কাল মানসাই কোন দিকে ভাঙবে। চারদিকে বারবার লক্ষ্য করে বলতে পারো না, কোন ঝোঁপটা হঠাৎ বাঘ হয়ে দাঁড়াবে। আর বাঘের ডাক শুনেই কেউ কি কখনও বলতে পারে সেটা মানুষখেকো নয়।

প্রতি পদক্ষেপেই তো গায়ে কাঁটা দেয়। চন্দানি যেন চারদিকে শুকনো কাশের খয়ের রং দেখতে গেল, গাছের পাতা নেই, মাটিতে সবুজ ঘাস নেই, দূরে দূরে একটা একটা খয়েরি রংয়ের ডালপালাও শুকিয়ে উঠেছে এমন গাছ। আর চারদিক থেকে আলো যেন তাকে তাড়া করে আসছে। ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিল।

এখন বাঘটার ঘুমাতে যাওয়ার সময়। সারারাত ঘুরে এখন বনে ফিরেছে, এখন তাকে অস্থির করা উচিত হবে না। আজ হয়তো সে শোনে নি, কিন্তু আজও নিশ্চয় সেই ভোরে সে ডেকেছিল। আর তাতে এই বলা হয়, আমার বিশ্রামের সময় দূরে থাক। এখন পাখিরা ডাকছে, বন মোরগ, ডাহুক, ফেজ্যান্ট, তিতির' যেখানে খুব অন্ধকার এখনও সেখানে ঝিঁঝিঁও। আর এইসব ডাকাডাকিতে একটা স্তব্ধতা হয় যাব আড়ালে বাঘটা ঘুমায়।

চন্দানি এক উৎকণ্ঠায় মুখে শব্দ না করে মনে মনে বলল, না, হলং কাউক বাঘিনীর কথা বলা না লাগে। হউক সাক্কাসের পলানো। কিন্তু তাক যদি ফিন্ আবার ধরি নেয়, হামরাও ধরা পড়ি যাই কিন্তুক।

মানুষ যদি আর গ্রামে থাকতে না-পারে, তাকে তো বনেই থাকতে হবে। তা হ'লে সে বনে যত বাঘ থাকে তত মঙ্গল। মানুষ আসে না তবে। বন না থাকলে মানুষ কোথায় মুখ লুকাতো?

অন্যদিকে এ বনটা ভালো। চন্দানি বনে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই লেহু মিঞাকে একদিন বলেছিলো, 'বনই যদি মানুষের ভয়ে তো আরও বড় বন দেখলে হয়। শোনং সেই বন রিজাব সেই বন গহীন, মানুষ হয়তো দেখির পায় না।' লেহু মিঞা বলেছিল, 'আছে তো তেমন আরও উত্তরৎ গেইলে। কিন্তুক সেই বন মানুষ-সাপের রাজত্ব। হইল না হয় মানুষ-সাপ ভোটবাবু কওয়ার পাইস্, উমরায় ভোট করে, পিরধান, মনতিরি বনায়। গাছ কাটে ভোটবাবু।

সেদিনই বুঝতে পেরেছিল সে যেমন গ্রাম তেমন সে রিজাববন, মানুষ নাই-বাঁচে। এই সামান্য বন যা ছাড়ি দেওয়া সড়কগুলার খাঁজে খাঁজে আতো জালা, যার শেষ মালিক কাঁউএ না হয়, তাই এই পৃথিমিতে মানুষের শেষ থাকিবার স্থান।

তারা সব উঁচু পথ থেকে মাঝের পথটায় পৌঁছাস। চন্দানি পিছন ফিরে দেখল উঁচু

পথের উপরে সেই কুঁড়ে এখন আর দেখা যায় না। এটাও তো বনে চলার কায়দা। এখন আর তাকে কুঁড়েটার সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না।

আর এখানে প্রত্যেকেরই আলাদা কৌশল শিখে নিতে হয়, যদিও হয়তো শেষ পর্যন্ত হঠাৎ মানুষখেকোর মুখোমুখি হয়ে যাও। আর একটু ঝাপটা ঝাপটির পরে সব শেষ।

হলং, আজও সে আবিষ্কার করেছে, তার ষাঁড় আর কুঁড়ের মাঝখানে যে অল্প ফাঁক সেটাকে জুড়ে ঘুমায় রাতে। কিভাবে? কুঁড়ের পিছন দিকটায় ঘন কুলকাঁটা বন, আর নিচের জমি থেকে অনেকটা খাড়া। সেখান থেকে কুঁড়ে টপকে বাঘ আসেনা? সামনের দিকে প্রকাণ্ড ষাঁড়টাই আড়াল। সেটাই বাঘকে নিজের শরীর দিয়ে আটকাবে। কিন্তু সেটাই আবার বাঘকে টেনে আনতে পারে।

লেদু মিঞার কৌশল অন্যরকম ছিল। সারারাত সেই ঘুরে বেড়ান, বাঘ যেমন ঘোরে আর দিনের বেলায় ধামা কাঁধে বেরিয়ে না গেলে সকালটা ঘুমিয়ে থাকা। দুপুর হতে না হতে সেদিনের খাওয়ার খোঁজে আবার বনে ঘুরে বেড়ান।

একদিন সকালে চন্দানির ঘুম ভাঙিয়ে হাসিমুখে বলেছিল, এখনও ঘুমাও! মনে কর, এ তো বনের বাইরে, মানুষ যদি ঘাসের জন্য আসি যায়? তারপর যখন তারা গভীর বনের মধ্যে, ডোবার ধারে সেদিনের খাবার মাছ ধরতে বসেছে, লেদু মিঞা বলেছিল হঠাৎ, 'তো তোমার গজুর হাসপাতাল থাকি বিরাতে আর পনরো দিন।'

তা কি একটা সংবাদ যা গতরাতে সে সংগ্রহ করেছে, অথবা সতর্ক করে দেয়ার কথা? চন্দানি বলেছিল, 'মরে নাই মরে নাই।'

—'নাই মরে।' বলে লেদু হেসেছিল।

সেদিনের সারাটা ক্ষণই চন্দানির মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে উঠছিল।

মুখের ভিতরে শুকিয়ে ওঠার ব্যাপার অন্য রকম হতে পারে। সেই সকালে তখন রোদ উঠে পড়েছে। লেদু মিঞা ডাকে নি। নিজেই চন্দানি বনে ঢুকে পড়েছিল। আগের দিনও লেদু মিঞাকে বনে দেখা যায় নি। আর সেই সকালেও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। চন্দানির আশঙ্কা হচ্ছিল, গজু কি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে? অবশেষে দ্বিতীয়বার যখন সে চালতাতলার সেই চাতালকে বাঁ হাতে রেখে ডোবার দিকে যাচ্ছে, মাছ ধরা যায় কিনা দেখতে, চন্দানি লেদুকে দেখতে পেয়েছিল। লেদুর মুখটা কি শুকনো ছিল? সেদিন লেদু আরও কিছু আইন শিখাচ্ছিল বনের। কোন অসুখে কোন ওষুধ লাগে তা বলছিল। সামনে বর্ষা; আর এখানে গাছতলাই যেখানে একমাত্র আশ্রয়, আর এখানে যার তিনদিকেই নদী ফাঁপতে থাকবে, সেখানে বাঘও সুযোগ পেলে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। অথচ তোমাকে থাকতেই হবে।

ওষুধের নাম। হেলথসেন্টারের মেয়ে চন্দানির ও একেবারে অজানা নয়। কিন্তু লেহ্ মিঞার সেদিনের উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছিল যেন সেই ডাক্তারবাবুই কথা বলছে। লেহ্ মিঞা বলেছিল সে সেই ওষুধগুলো এনে দেবে, চন্দানি যেন যত্ন করে রাখে যাতে জলে না-ভেজে। ছেলে নিয়ে বনে থাকা, অষুধ পাও কোটে আর?

সেদিন চন্দানি এসব শোনার পর জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, মিঞা, তোমার নাম সাচাই লেহ্ তো?

লেহ্ দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে পরে বলেছিল, 'নামৎ কি যায় কি আইসে, চন্দানির লেহ্ না হয়, থ্যালপো হবার পায়। তোমার নাম মান্সী, মানসাহী হউক না কেনে।' চন্দানি বলেছিল, মিঞার শরীর ততো আহ্লাদী নয়, ততো অলস নয় সে যে তাকে লেহ্ বা থ্যালপো বলা যায়।'

আর সেবার আরও দেরি হয়েছিল। তিন চারদিন ধরে লেহ্ বনে ছিল না। কি ভয়, কি আশঙ্কা! প্রথম দিনে সারাদিনের চেষ্টায় লেহুকে খুঁজে না পেয়ে বিকেল হতে না-হতে চন্দানি কুঁড়েতে ঢুকেছিল। দ্বিতীয় দিনে বছরের প্রথম বৃষ্টি নেমেছিল। বাঘটা আর আকাশ মাঝে মাঝেই ডাকছিল, কখনও এক সঙ্গে, কখনও পরস্পর ধমকাতে। তৃতীয় দিনে, ক্ষুধার তাডসে আবার বনে নেমেছিল চন্দানি। ভাগ্যে গোটা দুয়েক মাটিতে উঠে আসা চ্যাংসাটি পেয়েছিল সে। শুধু চিঁড়া-জল খেয়ে বটুর চলতে পারে। কিন্তু বটু-ছটুর জন্য শরীরে দুধ রাখতে তাকে তো খেতেই হবে। চতুর্থ দিনের দুপুরে যেন হাওয়া থেকে দেখা দিয়েছিল লেহ্।

চন্দানি চমকে উঠে খুশিতে বলেছিল, 'আজ খাওয়া নয় শুধু, ছানও করা লাগে।' আশঙ্কার চাপ উঠে যেতে সে বুঝতে পারছিল না, কতটা প্রফুল্ল হওয়া উচিত। সেদিন সে হলং-এর ঝর্ণাতেই স্নানে নেমেছিল। একদিনের বৃষ্টিতেইকি তোড সেই জলে। আর নতুন জলে যেন আলাদা স্বাদ থাকে। পিঠঝোলা নিজের পিঠে বেঁধে নিয়ে ছটুকে পিঠে ঝুলিয়ে লেহ্ মিঞা জলের ধারে ধারে খাবারের খোঁজে চলে গিয়েছিল। বটুকে জলের কিনারায় বসিয়ে জলে নেমেছিল চন্দানি। আধঘণ্টা বাদেই লেহ্ ফিরে এসেছিল। তার হাতে লতায় বাঁধা একটা কাউঠা বন কাছিম। ছটু তখনও লেহুর পিঠে, বটু বরং চন্দানির কোলে। সেদিন ভিজে শাড়ি পরে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল।

সব মানুষই কিন্তু, নির্দয় হতে পারে। আগুন জেলে জীবন্ত কাছিমটাকে চিত করে তার উপরে তুলে দিয়েছিল লেহ্। কাটারিতে পেট চিরে দিলেই কি কাছিমের প্রাণ যায়। সেই অবস্থায় নিজের খোলায় সেটা সিদ্ধ হয়েছিল।

স্বাদ-বিস্বাদের কথা নয়। পেট ভরেছিল নরম হয়ে যাওয়া সেই গরম গরম মাংসে। কিন্তু কাছিমের সেই সাদা পেট…

তারপর তারা আবার চালতাতলার চাতালে বসছিল।

আর সেদিন লেছু মিঞা বলেছিল, 'জান, চন্দানি, মনৎ করি, বনৎ যদি পৃথিমি ফাটি যায়, এমন ফাটল যে সেইটে গেলে আর উঠা না লাগে, পৃথিমির ঠাণ্ডায় ঘুম আসি যায় ; ঘুম, ঘুম, ঘুম আর না ভাঙে।'

চন্দানি থমকে দাঁড়াল। নদীর পাড়ের শেষ ঢালটা কি সে তাড়াতাড়ি নেমেছে ? সে ভুল করেছে, তার শরীরের এই অবস্থায়, এমন তাড়াতাড়ি নেমে। সে দম নিতে নিতে অনুভব করল, তার বুকের নিচে কেউ আপত্তি জানাতে নড়েচড়ে উঠছে।

সে জলে না নেমে সেই বড় বড় পাথরগুলোর একটাতে বসে পড়ল। গালে হাত রেখে ভাবল। সেদিনও সে উঁচু সড়কের উপরে কুঁড়েটার পাশে একটা কাঠেরগুঁড়ির উপরে বসে এরকম ভাবছিল। সন্ধ্যার লাল রাংতা আলোর ঝলমলানির গায়ে পথের ধারের ইউক্যালিপটাসগুলো তখন কালচে সবুজ থেকে কালো হ'য়ে আসছে। সেদিন সে বাঘের ডাক খেয়াল করে নি। সেটাকি বন পার হ'য়ে গেছে ? আর আধঘণ্টার মধ্যে যে রাত হবে-তা ঘুট ঘুটে অন্ধকার হ'ক কিংবা চাঁদনি তা দেখতে সে বাইরে থাকবে না। বরং সেই শেষ আলো দেখে নিয়ে, সে কুঁড়ের ভিতরে যে ভয়ের গহ্বরে আর একটা রাতের জন্য নামবে তাকে মৃত্যুই বলতে হয়। আর সূর্য উঠলে তা যদি সে দেখতে পায় তবে বাঁচবে। তখন লেছু মিঞার সাড়া পেয়েছিল সে। লেছু মিঞা বলেছিল ক্লান্ত লাগল। সে রকম করে লেছুমিঞা আর কখনও কুঁড়েটার কাছে আসে নি। গালে হাত রেখে চন্দানি ভাবল, সে দিন কি সে লেছু মিঞার কথার ভুল অর্থ করেছিল ? সে তো পৃথিমি নয়, যে তাকেই লেছুমিঞা পৃথিমি মনে করবে। সে ভাবল, এখানে আর কে তার কথা শুনতে পাচ্ছে যে লজ্জা করবে ? ভুল ? নয়, সাহসই সেটা ? না কি, সে সন্ধ্যার লাল কালচে নীলে মিলিয়ে যেতে থাকলে প্রায় এসেছে এমন বর্ষার ঝিঁ ঝিঁ কাঁপানো স্নিগ্ধতায় তেমন করে চুল খুলে দিয়ে পৃথিমি হতে চেয়েছিলো সে ? ভেবেছিল সাহস ক'রে পৃথিমি হবে সে ? লেছু ঘুম, যা ভাঙে না তেমন ঘুম এসব বলছিল। সে গায়ে কাপড় রাখে নি। সেই পৃথিমির ফাটল কি মিঞাকে স্নিগ্ধ করেছিল ?

চন্দানি উঠে দাঁড়াল। জল এখন বেশ দূরেই। তার পরে বর্ষা এসেছিল। আবার তো শীতেই যাচ্ছে পৃথিবী। বর্ষার শেষে এখন অনেক দিন হয়ে যায়।

আর একদিন, তারও আগে সেদিন লেছু মিঞা প্রায় বাঙালিদের মত কথা বলছিল।

পায়ের নিচে বালি। এখানে তাড়াতাড়ি চলা যায় না। জলের কাছে বলে কুয়াসাও। রোদ উঠলে, চারদিক দেখতে পেলে তবু তাড়াতাড়ি করা চলে।

ইতিহাস আর ভূগোল যে ভাষায় লেখে, তেমনই যেন, সেই ভাষা আর একদিন ছিল লেন্থু মিঞার। সে বলেছিল, 'কাউকে বলে যেতে ইচ্ছা করে। কথাটা তার মধ্যে আশ্রয় পাক এরকম ইচ্ছা হয়। একজন কেউ জানুক কোথায় থেমে গেল কে। জান, ডাক্তার ধরা পড়েছে এতদিনে। আর সে বলেছে সবই ভুল ছিল। অত রক্ত, অত রক্ত! বল, ভুল বললে সে মানুষগুলো ফিরে আসে?'

আর চন্দানিও যেন স্কুলে পড়ার মত মনে ফিরে গিয়েছিল। সে বলেছিল, 'কে কোথায় থেমে যাবে বলছ? অত রক্তের কথা কি বলছ? কি সব ভুল ছিল? তুমি কি লেন্থু মিঞা নয়? ডাক্তার বাবু কি ডাক্তার বাবু ছিল না?

চরটা নতুন পড়েছে, কিংবা বলা যায় হলং-এর ঝর্ণাটা এদিক থেকে খানিকটা সরেও গিয়েছে। পায়ের প্রান্তে জল লাগলেও, সে রোদ উঠবার জন্য একটু দাঁড়াবে ভাবল। কোথায় বসাবে এখানে ছটুকে জলে নামার আগে? বটু? না, বটু এখন নেই আর। নেই।

হয়তো পিছনে ফেলে আসা কোন বড়গাছের জন্য সূর্য আসছিল না, অথবা সেখানে কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই সূর্য আরও দু-এক ডিগ্রি উঠল। কুয়াসাকে ঠেলে আলো এসে পড়ল চন্দানির গায়ে। চন্দানি ফিরে দেখল কয়েক হাত দূরে হলং দাঁড়িয়ে। তার দু-হাতে দুটো মাটির ঘড়া।

সে কি করতো সেই ছয় সাত দিনের, কয়েকদিনের মধ্যেই যদি হলং না এসে পড়তো হঠাৎ? আর এখন তো হলংকে নিজের জন্যই আটকে রাখতেই হয়। আষাঢ় থেকে আশ্বিনের, সেই চার মাসের ভারি বর্ষায় যে অসুবিধা, তখন হলংই তো আহারের যোগাড় করতো। যদিও হলং থাকলেও বটু হারিয়ে যায়, এখন যে সময় আসছে তখন হলং ছাড়া কে সাহায্য করবে?

চন্দানি পিঠঝোলা ঘুরিয়ে ছটুকে হাতে নিয়ে হলংকে বলল, ধর। হলং ছটুকে নিয়ে হাঁটু জলে নেমে দাঁড়িয়ে হাতে জল তুলে কুলকুচি করে ফিরে তীরের বালুতে গিয়ে দাঁড়াল। গায়ের আঁচল টেনে কোমরে জড়াল চন্দানি। বুক দুটোয় কারো লোভ আছে জানা, আর তাতে কারো লোভ বাড়ানো এক কথা নয়। সঙ্কোচে চন্দানি চোখ নামাল। ছটু দিনরাত খেয়েও কমাতে পারেনি, বরং পিতল রঙের মাই দুটো সকালের প্রথম রোদে আরো চকচকে, আরো গোলালো আর বড় হয়েছে। দু চার মিনিট সে রকম দাঁড়ালো চন্দানি নাভি জলে।

'হলং, ওষি যায়া দেখ, মাছটাছ পাও কিনা। মুই ছান কয়ি নেং।' বলে চন্দানি পিছন ফিরে জলে এগোল।

স্নান সেরে এক এক কলসী করে তুটোতেই মাঝ ঝর্ণার পরিষ্কার জল নিয়ে এল চন্দানি। আর জলের এই বাছবিচারে, তার আবার লেহুর কথা মনে পড়ে গেল। ততক্ষণে হলংও ফিরে এসেছে। সে মাছ পাবে নিশ্চয়, এমন হয় না। শিখিয়ে দিলে যা পারে, নিজে থেকে তা পারবে, তা হলে তো সে লেহুর মতোই তুখোড় হতো। চন্দানি তাকে বলল, 'ছান কর, এদিক ওদিকে যেয়ো না। চোরাবালি থাকিতে পাবে।'

হলং যতক্ষণ স্নান করছে, ততক্ষণে চন্দানি ছটুকে তার খালি পিঠের উপরে বেঁধে নিল। বাঁধার চাদরটা সামনের দিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাঁধল। গা একেবারে খালি থাকলে, কিংবা ভিজে কাপড়ে জড়ান থাকলে, শীত শীত করছে কয়েকদিন হল। গায়ের আঁচলটা চিপে জল নিংড়ে হাতের উপরে নিল সে।

জল থেকে উঠে কলসী তুটোকেই নিল হলং। এভাবে তারা, বরং, রোদ দেখে দেখে তা গায়ে লাগাতে লাগাতে হাঁটতে লাগল।

চন্দানি স্থির করল, কাল রাতের খাওয়ার পরে এখনও চব্বিশ ঘণ্টা হয় নি, এখনই খাওয়ার চেষ্টা না করলেও চলে। বরং বাঘটা যদি চালতাতলার চাতালটাকে এর মধ্যে দখল করে না থাকে, সেখানে বসে দিনটাকে কাটিয়ে দেয়া যাবে। এমন হতে পারে, বাঘটা গ্রাম থেকে ফিরতে দেরি করে, বেলা হওয়াতে, সব চাইতে কাছের কোন ঝোপে লুকিয়েছে। সকাল হলে, প্রাণীদের ভয় দেখিয়ে দূরে তাড়ানোর জন্য, সে তখন একবার ডাকে বলে চন্দানির ধারণা। সে ডাকটা আজ যেন শোনা যায়নি।

এখন কিন্তু তার বরং শুয়ে বসে কাটাতে ইচ্ছা করে। এখন যেন একটা আলসেমি হয়েছে। আর তখন সেই ছ সাত দিন তার শরীর যেন লজ্জায় ভার হয়েছিল। সে কয়েকদিন লেহুর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টার তু-এক ঘণ্টা ছাড়া সব সময়ে দেখা হতো।

* * *

চালতা তলার চাতালে কোথাও জালিকাটা ছায়া, কোথাও টাটকা রোদ। বাঘটা আজও তার আগে এসে পৌঁছায় নি। আর মানুষ জন দেখলে নিশ্চয় আসবে না।

আলসেমির জন্য রোদে আধখানা শরীর ছড়িয়ে দিল চন্দানি। সে সময়ে, সেই হঠাৎ আসা লজ্জা করার সময়ে, একদিন সে বলেছিল, 'যান, তোমরা কখনো লেহু মিঞা না হয়।' আর লেহু মিঞা বলেছিল হেসে হেসে, 'বস, তোমরা নৌতুন নাম রাখেন না কেনে? কি কওয়ার চান? সমু বলির পারেন।'

সেই সময়েই কি সেই লেহু মিঞা বলেছিল, অনেক চেষ্টা করেও লেহু মিঞা হওয়া

খায় না। মানুষখেকোরা খিদে না-পেলে মানুষ মারে না। লেডু মিঞারাও বাধ্য না হলে মানুষ মারে না, মানুষী। তার চাইতে সমু, সমসের, সমরেন যা হয় বল, যারা মানুষ মারে।

আর সাতদিন আগে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে দেখেছিলো কুঁড়ের দরজায় হলং নেই তার ষাঁড়টাও নেই। মনটা ছ্যাঁ ক'রে উঠেছিলো তার। কিন্তু রক্ত নেই কোথাও। রক্ত পড়বে না অথচ একটা মানুষ আর একটা ষাঁড়কে ধ'রে নিয়ে যাবে এমন বাঘ হয় না।

তা হ'লেও দিন হ'য়ে যাচ্ছে, কুঁড়েতে থাকা যায় না। একটা সুবিধা প্রথম শীতের কুয়াশা নেমেছে। এটা একটা আড়াল। কিন্তু দুদিকই আছে। কেউ যদি চার পাঁচ হাতের মধ্যে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় তাও টের পাবে না চন্দানি। তার চাইতে বনে ঘোরার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়া ভালো। সে ঘটিতে ফুটানো জল আর তার মধ্যেই চিঁড়া নিয়ে পিঠে ছটুকে বেঁধে সে বেরিয়ে পড়লো। কাটারি আর দিয়াশলাই, লোহা আর আগুন, ছাড়া কে আর বনের পথে পা দেয়।

তখন তার মনে প'ড়েছিল তার আগের দিনের বিকেল থেকে হলং নেই। বনে সে একেবারে একা। হাঁটতে হাঁটতে চন্দানি একবার উৎকর্ণ হয়েছিল। বাঘিনীটা এখনও ডাকে নি। তার অর্থ এই করা যায় সে বনে ফেরে নি। সকালের ডাকটা তো এজন্যই যে সে বলতে চায় আমি বনে এসেছি আমার কাছাকাছি কেউ এসো না। তো, হলং দুএকদিন আগে থেকেই বলছিল, সে স্বরগ্‌ দেখতে যাবে। হেসে বাঁচেনা চন্দানি। অনেকদিব পরে ষাঁড় নিয়ে ভাগ্য গণতে বেরিয়েছিল হলং। ফালাকাটার বন্দরে, এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঘুরে পয়সা উপার্জন করবে। এটা চন্দানির ভালো লাগে নি-এই প্রস্তাব। কিছুদিন আগে যে মাছের চুবড়ি নিয়ে ফালাকাটা বন্দরে যেতো তাকে নিশ্চয়ই লোকে চিনে ফেলবে। ঠগ বলে মারধোর করতে পারে। তখন স্থির হয়েছিল হলং বরং অন্য কোথাও যাক, কোন চা বাগানে, অথবা জটেশ্বর কিংবা অথবা পলাশ-বাড়ির মতো গ্রামে। সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিল হলং। ভাগ্য গুণে সে পয়সা যত পেয়েছিল তার চাইতে বেশি পেয়েছিল, চাল, আটা, ডাল, আলু। সিকি, আধুলি যদি ভদ্রলোকেরা দিয়ে থাকে চাল ডালের সিধে দিয়েছে চা, বাগানের পাতা তোলা মজুররা। ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হ'য়, কুঁড়েতে রাখা হলং-এর সেই ঝোলাটায় হলং এর ষাঁড়ের জন্য কড়ি আর পুঁতির মালা, হলং এর নিজের গেরুয়া আলখিল্লা বেশ ভালো ক'রে সাজানো ছিলো, এমন কি কপালে হাতে দেয়ার লাল আর সাদা রং, রুদ্রাক্ষের মালা। অনেক-দিন থেকেই অভিনয় করার অভ্যাস তো।'

আট দশ দিনের পক্ষে যথেষ্ট চাল, ডাল, আটা নিয়ে এসেছিল হলং। রাতে তারা চাল ডাল মিশিয়ে ফুটিয়ে নিয়েছিল। চন্দানি বলেছিল, এবার ঘুম যা, অনেক খাটি আসছিস আজ। তখন হলং বলেছিল, 'আচ্ছা, তোমরা স্বরগ্ দেখছেন কি?' 'স্বরগ?'

'যেটে আদমি মরার পর যাওয়ার পারে।'

চন্দানি হেসে বলেছিল, তোমরা সন্নেসি, হলং, তোমার জানির পার। মুই নাই-জানং।' 'আজ মোর চোখুর আগৎ এক পাক ঘুরি গেইছে। কাল ফিন যাঙ, ভাল করি দেখং কাল।'

চন্দানি হাসতে থাকলে হলং স্বরগ বর্ণনা করেছিল। শুনে মনে হয় চন্দানির খুব ছোট বেলায় দেখা সদর সহরের কোন ইলেকট্রিক আলোয় উজ্জ্বল পাড়ার কথা বলছে। একটু হলুদরঙের বাড়ি, যার সামনে ফুলগাছ, যার ঘরের ভিতরের রং গোলাপী, হেলথ সেন্টারের সেই কাচের জানলাটার মতো যার জানলা। যার ভিতরে বিকেলেই আলো জ্বলে উঠেছিল। সেখানে হোলুদ শাড়ি পিধছে এমন বেটি ছাওয়া চুল সাফা করে। আর তার উরুত মুখ রাখি তার ছাওয়া। ছাওয়াটা মার সেই চুল দেখি অবাক হয়া গেইছে। চন্দানি হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আচ্ছা, তো, একদিন চুল সাফা করিম, তুই কাঁকই কিনি আনিস, আর উরুত মুখ রাখির চাস যেদ্‌হু রাখিস।

কিন্তু সকালে হলংকে না দেখে প্রথম যে ভয়টা হয়েছিল, বনের মধ্যে নেমে এসে তখন সেটা অন্য ভয় হচ্ছে। বন আর চা বাগান এক নয়। বেটি ছাওয়ার উদলা শরীরের দিকে তেমন ক'রে দেখতে থাকলে মার ধোর খেতে হ'তে পারে চা-বাগানে। হলং এর বোঝা উচিত সেটা স্বরগ্ নয়, চা-বাগানের কোন কর্মচারীর বাড়িতে বাড়ির গিন্নিকে সে দেখেছে। রাতেই সে নিষেধ করেছিল। হলং বলেছিল, সে চিনতে ভুল করে নি স্বরগ্। স্বরগে যে তেমন বাড়ি থাকে তা সে স্বপ্নে বহুবার দেখেছে, আর তার স্বপ্নের কথা শুনে তাদের দলের সেই বুড়ো সন্নেসি বলেছিল ওটাকে মনে থাকার কথাও বলতে পারা যায়। নাগাদের তেমন পূর্বজন্ম দর্শন হয়।

তো সাতদিন আগে সেই প্রথম শীতের কুয়াসার সকালে হলং আর তার ষাঁড় ছিলো না। বনে একেবারে একা চন্দানি। এমন কি বাঘটাও ডাকছিল না। কুয়াশার দরুণ ভালো আলো ফুটছিল না তার চারদিকের বনে। দু একটা পাখির কিচমিচ কখনও শোন যাচ্ছে। আগের রাতে সেই চাল-ডাল খাওয়ার পরে ক্ষুধার পীড়া নেই। তা হ'লেও জলের ধারে যাওয়া ভালো। হাত মুখ ধুয়ে জলের ধার ধরে চলতে চলতে কাউটা কাছিম, কুচলা চোখেও পড়ে যেতে পারে। কিন্তু হাতমুখ ধুয়ে তেমন চলতে চলতে জলে, জলের ডোবা পাথরের চারদিকে, পথের ঘাসবনে তেমন সতর্ক চোখ রাখতে

পারছিল না চন্দানি। তার মনে বরং হলং এর জন্ম ভয় হচ্ছিল, আর হলং যদি ফিরে আসতে না পারে তা হ'লে তার সে সময়ে কি হবে ভেবেও ভয় হচ্ছিল। সে কিছু অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছিল চলতে চলতে। ঠিক তখনই, সেই সাতদিন আগের কুয়াশার সকালে, সে চমকে উঠেছিল, বুঝতে পারছিল না কেন চমকালো, কিন্তু কাটারিটা হাতে নিয়েছিল। আর তখন লেছু মিঞা বলেছিল, 'ভালই তো দেখং চন্দানি। এলা সতর্ক হয়্যা গেইছ।'

দুজনেই হেসে ফেলেছিল। চন্দানির মুখটায় তার পরে যেন এক ঝলক আলো পড়েছিল সে লেছুমিঞার দিকে চোখ তুলতে পারছিলো না।

'কি কং তোমাক ! মিঞা, না সমু!'

'সমু কবার পার। ওটেও কয়্যা আসছি, সমুই মোর নাম।'

কি বলবে, কি করবে খুঁজে না-পেয়ে চন্দানি হেসেছিল আবার। বলেছিল, 'আজ কিছু না-পাইলেও চলে। ঘরং চাল ডাল আছে। রাধি খাওয়া যায়। চলো, বইসং কোটে, আজকালি চলি বেড়াতে হাঁফ ধরে।'

তারপরে সকালের রোদ যেখানে পড়েছে মাঝারি উঁচুপথটার ঘাসে ঢাকা সেরকম একটা অংশে তারা বসেছিল।

'কোটে বা কাটাছ তোমরা সেই আষাঢ় থাকি এই পৌষ, কোটে বা কাক ফিন কয়্যা দিছ তোমরা সমু।'

লেছু মিঞা মুখ নিচু করে খানিকটা ভেবে নিয়ে বলেছিল, 'কোটে আর, ওই না পাতলা খাওয়ার জোতদার মলিন কাজীর বেটি ছাওয়ার ওটে। তারই না জমিত চাষ দিছং রোয়া গাড়লং, ফির পৌষ শেষ হইতে না হইতে যাং ধান কাটিবার।'

'অত দূর গেইলে কেনে ?'

লেছু মিঞা আরও কিছু সময় ভেবে বলল 'বাঃ মলিন কাজী না মরি গেইছে। তার বেটি ছাওয়া বা কি করে। উমরার এক বেটা এক বিটি একটার দশ, দুসরার ছয় হওয়ার পারে। তো বাইশ বিঘার জোতদার। এলা বারো তেরো বিঘায় আধিয়ার বসে গেইছে জোর করি। নও দশ বিঘা বাকি থাকে। তাও এ শাল আধিয়ার বসিয় চায় ওই বাকিটুকু জমিত। কি করং আর। চাকর নৌকর রাখি চাষ করে উপায় নাই। আধিয়ার ঘর ভুকি উঠে।' চন্দানির অবাক লাগছিল। সে বলেছিল, 'তোমার বুঝি জমিটা দেখি ভাল লাগি গেইছে।' 'না-হয় রে। বহোৎ খাটিবার হইছে। আসলে চার শাল পহিলে মুই না মারি দিছং মলিন জোতদারক।'

চন্দানি চমকে উঠে হাঁ ক'রে লেহু মিঞার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। লেহু মিঞার চোখ দুটো যেন পাতাটাতা সমেত একবার লোপ পাচ্ছে, একবার কষ্টে কাঁপছে।

চন্দানি আতঙ্কে বলেছিল 'বোকা, বোকা, কেনে গেলু মেটে যদি তোমাক কাউ চিনি ফেলে। ফির ধান কাটিবার যাইবে, যদি পুলিশক বলে।

'চিনির পারে নাই। ফিন যে রাতে রোয়াগাড়া শেষ হইল—'

'রাত করি রোয়া গাড়া?'

'তো। মলিনের বেটিছাওয়া কয় দুচার দিনে রোয়াগাড়া শেষ নাই করি আধিয়ার আসি যাইবে। তো সেই বাতত কোলং তোমারও আসেন, দুজনা হাতে হাতে রোয়াগাড়া শেষ করি। পাশাপাশি আধাহাঁটু জলে ভোরবাত পর্যন্তক রোয়া গাড়া হইছে। আকাশে ভিজা চাঁদ তারই আলো।'

'উমায় পারছে।'

'অলপ্ অলপ্।

'ভাল করো নাই, মিঞা, সেটে আধিয়াবও শত্রু। যদি জানির পায় লেহু মিঞা সমু হওয়ার পারে। জোতদাব বেটিছাওয়ার অত কাছে না যাওযা ভাল যদি চিনি ফেলে। হয়তোক তোমাব চেহাবা সগায় আলোচনা করছে।'

'তো সেই ভোর রাতে জোতদাব বেটিছাওয়া ঠাণ্ডায় জলে কাপির ধরছে, কাশির ধরছে। তো ফির আগুন জ্বালায়্যা চা, তেজপাতা, আদা জাল দিছে। আগুনের সামনা বসি সেলা হাত তাপাই, পাও ছেকি, হাতপা সবই শ্যাক্ শ্যাক্, তো জোতদাবেব বেটি ছাওযাও আগুন তাপায় পাশে বসি। সেলা তার পাত হঠাৎ হাত রাখছং। সেলা কইছং মুইএ সমু, যেহু সমুব নাম শুনি থাকেন।' চন্দানি হায় হায ক'রে উঠলো বললো, 'তার পাছত।'

'উমরায় পইলা থক খ্যায়্যা গেইল। বিশ্বাস করির চায় না। সমুর নাম উমরায় শুনি থাকবে। যেন নামের সঙ্গে সেই লেহু মিঞাক মিলায়। পিছে দৌড পারি ঘবৎ গেইছে।'

চন্দনি বলেছিল, 'ওটে আর যাইবে না তোমবা উমরার স্বামীক মারছ তুমি। হউক চার শাল আগৎ। পুলিশে খবর দিবেই। ধান কাটির গেইলে রক্ষা নাই। মানুষ মারছ, মানুষ মারলে ফাসী হয় জানো নাই। ভাবছো রাতভর রোয়াবাড়ির জলৎ শ্যাকশ্যাকা পাত নিজের হাতের তাপ দিছো তো উমরায় তোমাক ছাড়ি দিবে?' 'ছাড ইগুলা কথা পুলিশ জানির পারেই যেহু, ধরির পাব্বে লেহু মিঞাক? আগৎ না দূর থাকি দেখং কি করছে, জোতদার বেটি-ছাওয়া। যেহু দেখং উমরায় পুলিশক খবর করছে

তো ধানা কাটা শুরু। পুলিশ আসতে আসতে কোটে বা সমু, কোটে বা লেহু। আমা
যেহু বোঝং পুলিশক খবর নাই করে তো ধানা কাটার বাধে উমরার দু তিন বিঘা বাড়ির
লগু ভাঙ্গা জমিত আনারাস গাড়ি দেং। ইগুনা ছাড়। হলং কোটে?

'স্বরগ্ দেখিবার গেইছে কিন্তু—'

'ছাড় কিন্তু। মুই গন্ধু না-হং, পুলিশ ধরির পারে। তোর বটু বা কোটে?'

চন্দানির এরকম ভুল ছিল বটু হারিয়ে যাওয়ার কথা লেহু জেনে গিয়েছিলো। পরে নিজের ভুল ধরা পড়লে শোকটা নতুন করে জেগে উঠেছিলো। শব্দ না ক'রে সে খানিকটা সময় কেঁদেছিল। আর লেহুমিঞা সম্ভবত তাকে সান্ত্বনা দিতে বলেছিল ছেলে থাকলেই মাকে কোন না কোন সময়ে কাঁদতে হবে।

আরও পরে সে ভাবে পাশাপাশি ব'সে থাকতে থাকতে চন্দানির মনে হয়েছিলো, একি অদ্ভুত আতঙ্কের জায়গা এই পৃথিমি! বনে থাকলে বটু হারায়, বনের বাইরেও দেখো লেহু মিঞার চারদিকে কি বিপদের জাল।

চালতার ছায়ার দিকে বরং স'রে বসতে হয়, পৌষের রোদ হলেও আর বেশীক্ষণ মিষ্টি লাগবে না। হলং কুঁড়েতে জল রেখে ফিরে এলে নিজেদের খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। লেহু মিঞা কিন্তু সেই একটা রাতই কুঁড়েতে ছিল। যেমন এসেছিল আবার তেমন চ'লে গেছে। চন্দানি চিঁড়াজলের ঘটি থেকে নিজে খানিকটা জল খেলো। ভিজে চিঁড়া হাতে ঢেলে ঢেলে ছটুকে খানিকটা খাওয়ালো।

সেই রাতে লেহু মিঞা বলেছিল আবার ছেলে থাকলে সব মাকেই কাঁদতে হয়। হলংএর মা কাঁদে না, সমুর মা কাঁদে না, তেমন বটুর জন্য তোমাকেও কাঁদতে হবে। আমরা ছেলেরা সকলেই কোন না কোন বনে হারিয়ে যাই।

এটা কি সান্ত্বনা, না লেহুমিঞার ভাবনার কায়দা? এখন সে এমন করেই ভাবে? যেমন কাউকে দেখে তার পৃথিমির গুহার কথা মনে পড়ে। এমন অদ্ভুত ভাবনা বলেই জোতদার বেটি ছাওয়ার জমিতে রোয়া গাড়ে। কি? না-জোতদারকে সেই নিজের হাতে মেরেছিল। এটাই সেই অনেক রক্তের কথা। যার সঙ্গে লেহু মিঞা, ডাক্তার বাবু, আর অন্য অনেকে যুক্ত ছিল। নাকি ভুল! কিন্তু ভুল করলে কি, তেমন ক'রে, ধরা দেয়ার মতো ক'রে, রাতভর কারো জমির একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে রোয়া গেড়ে, আগুনে গরম নিজের হাতে কারো ভিজে খ্যাকখ্যাকা পা সেকে দিতে দিতে বলতে হয় সেই সমু? এটা কাউকে পৃথিমি মনে ক'রে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টার মতোই। পৃথিমি? পৃথিমি? কেউ হ'তে পারে? সেই পৃথিমি যে কোন দিন মরে যেতে পারে একটা মেয়ে মানুষের মতো। কি নিশ্চয়তা এই বনের। সাতদিন আগেকার সেদিনের

বিকেলে তারা সে আর লেছ মিঞা খাদ্য সংগ্রহ করতে সব নিচের পথের ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে চলছিলো। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল তারা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ছন বনের ওপারে নদীর চরার ধারে মানুষ, তাদের নৌকা। তারা ধান কাটার মতো ক'রে ছন কেটে, আটি বেঁধে নৌকায় তুলছে। মানুষ বনের একপ্রান্তে ঢুকলে অন্য-প্রান্তেও পৌঁছাবে। এখনই এই মুহূর্তে হয়তো আবার এসেছে তারা। আর আজ সকাল থেকে বাঘও আবার ডাকছে না।

চিন্তিত মুখে লেছ মিঞা আর চন্দানি ফিরে এসেছিল।

যা তোমার তারই নিশ্চয়তা নেই, যা তোমার নয় তার কি নিশ্চয়তা থাকবে? বনে থাকলে বাঘ ধমকায়। বাঘ না থাকলে বন দুদিনে লোপ পায়। বাঘ থাকলেও কি বনের নিশ্চয়তা আছে।

* * *

শরীরটাই ভালো ছিল না চন্দানির নতুবা তত বেলায় সে কুঁড়েতে শুয়ে থাকতো না। কেউ তাকে ছুঁইছে এরকম অনুভব করে চন্দানি ধরমর ক'রে উঠে বসল।

লেছ মিঞা বললো, 'ভয় না-খাও। উঠ। কথা কওয়ার আসছি। বেলা কবি ফেলছ। হলং আইসে নাই?'

তখন কুয়াশা নেই বনে। কুঁড়েতে, নিশ্চয়ই, থাকার সময় নেই। বনের শুকনো কাঠকাঠরা কুড়োতে মানুষ এসে পড়তে পারে—কয়েকদিন থেকেই এরকম ভয় হচ্ছে চন্দানির। কাজেই খুব চাইতে উপরের সড়কে তো নয় বরং মাঝের সড়কে বেত ঝোপের আড়াল দিয়ে দিয়ে মাঝের সডকের কোথাও গিয়ে বসা ভালো। নিচের সড়কও আর নিরাপদ নয়। বলা যায় না আজ সকালে ছন কাটতে সেখানে লোক এসেছে কিনা, এরকম চলতে থাকলে হলং-এর ঝর্ণাও ধারও উদলা হয়ে যাবে।

লেছ মিঞাও আজ হাসছে না, বরং বেশ গম্ভীর মুখ তার। তারা বনের গভীরতর অংশের দিকে চলতে শুরু করলো। এখন ঝরা পাতা খুব পডছে বনে। খুব সন্তর্পনে চললেও খচ্‌খচ্‌ শব্দ হয়েই যায়। একটা সজারুই তেমন শব্দ ক'রে পালালো। লেছ মিঞা বলল, 'তোমার শরীরটা কি খারাপ। এসো এখানেই বসি।'

চন্দানি লক্ষ্য করল শুধু মুখের ভাষার নয়, চেহারাতেও যেন লেছ মিঞা লেছ মিঞার মতো থাকছে না।

লেছ মিঞা বললো, 'চন্দানি আমি আবার একটা ভুল ক'রে ফেলেছি। তোমার আর এ বনে থাকা সম্ভব নয়। বনে যে ছন কাটে সে ফালটু। ছনের আটি মানসাই-ঘাটে বিক্রি করতে দেখে তার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। সে তো আমাকে উখুণ্ডিতে

দেখেছে। তাকে বলেছিলাম এই বনে তুমি ছেলে নিয়ে আছ। ভেবেছিলাম, সে এসে তোমার কাছে থাকলে সুবিধা হবে। কিন্তু—' লেহ্ মিঞার চোখে যেন জল এসে গেলো। একটু থেমে সে বলল, 'কাল সন্ধ্যার পরে গজা ঢালি আর পুলিশকে মানসাই ঘাটে দেখে সন্দেহ হয়েছিল। গজা ঢালি তোমাদেরব খোঁজ খবর নিচ্ছে এরকম শুনতে পেলাম। রাতেই বনে আসছিলাম তোমাকে খবর দিতে। ভাইভার্সানের কাছে পলাশ গাছটায় মানুষের মতো কিছু দেখে শুকনো ডালপালার মশাল ঠেলেছিলাম। পলাশ গাছটায় ফালটুর শব ঝুলছিল। মনে হবে ভূতপ্রেতের কাজ। তারপর বোঝা যাবে ভূতপ্রেত তেমন নৃসংশ হয় না। মনে হ'লো জ্যান্ত অবস্থায় কেউ বুক পিঠের ছাল ছাড়িয়েছে। হাঁটু একটা মুচড়ে মুচড়ে ভাঙা। একটা চোখ ছুরি বা শিক দিয়ে খুবলে বার করা। মনে হ'লো ফাঁসীতে লটকে দেয়ার আগে ফালটুকে যন্ত্রণা দিয়েছে। এমন হ'তে পারে তার কাছে জানতে চেয়েছিলো যন্ত্রণা দিয়ে। গজাই হবে।

আর্তচিৎকারটা ঠেকাতে আঁচলটাকে মুখের উপরে চেপে ধরলো চন্দানি।

লেহ্ মিঞা বলল, 'তুমি এ বন থেকে চলে যাও, চন্দানি। হলং-এর সঙ্গে কি তুমি কোথাও চ'লে যেতে পারো না? তারও বাড়ি ঘর নেই। কোথায় গেছে হলং।'

চন্দানি ফ্যাকাসে মুখ তুলে বলল, 'হয় তো দু-তিন দিন পরে ফিরে আসবে। কিন্তু মোর এ শরীরে কতদূর বা যাং ক্যামন করি বা যাং।'

লেহ্ মিঞা ভাবতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ভেবে বললো, 'আচ্ছা। কিন্তু রং বা কোথায় পাবে।'

'রং!'

'হ্যাঁ, লালচে কোন রং' খানিকটা সাদাটের রং।'

চন্দানি কিছু বুঝতে না-পেরেও বলল, 'হলং যেহ্ বড় ঝোলা না নিয়া থাকে ঝোলাত রং থাকির পারে। কিন্তুক রং এ কি আপদ কাটে?'

লেহ্ মিঞা চন্দানির হলুদ মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে বলল, 'আর কোন উপায় নাই চন্দানি এই বনে থাকার। শুনতে খারাপ, খুব খারাপ, কিন্তু আটা ময়দা লালচে রং মিশিয়ে মুখে, আঙুলে, পায়ে কোথাও কোথাও মাখতে হবে। তুমি তো শহরে যাও নি। শহরে এরকম কুঠি থাকে যাদের কেউ ছোঁয় না। চন্দানি কথা বলতে মুখ খুলে হাঁ ক'রে থাকলে কিছুক্ষণ। আতঙ্কে সে উঠে দাঁড়াল। একবার নিজের আঙুলগুলো নিজের চোখের সামনে মেলে ধরল, একবার নিজের গালে হাত বুলিয়ে দেখল যেন।

লেহ্ মিঞা বলল, 'আর কোন উপায় মাথায় আসছে না। এই বনে আর কি করে বা মেয়ে মানুষ রক্ষা পায়।'

চন্দানি এবার শব্দ ক'রে কেঁদে ফেললো। বরং উল্টোটাও করল সে। বলল, 'তোমরা ছটুর সামনা বইশ খানেক। ছান করি আইসং।'

গায়ের সম্ভাব্য ক্লেদ ধুয়ে ফেলতে সে নদীর দিকে চ'লে গেল।

কিন্তু সেই রকম স্নান করতে গিয়েই সে স্তম্ভিত। উত্তর দিক থেকে হলং-এর পুরনো খাত পার হ'য়ে পুলিশ ঢুকছে বনে। তাদের হাতে হাতে বন্দুক।

চন্দানি ঝোপ ঝাড়ের আড়াল দিয়ে দৌড়ে চালতাতলায় পৌঁছে বলল 'তুমি কও বনৎ মানুষখাকিয়া নাই, মানুষখাকিয়া ছাড়া কারুক মারে না, তবে বন্দুক ধরি পুলিস কেনে বনৎ।'

পুলিস? বন্দুক? এই বলেই লেছু মিঞা উঠে পড়ল। চন্দানিকে বলল, যেখানে উপরের বেতঝোপ আর তলার কুলঝোপ তার কাছে গিয়ে বসতে। পুলিস উপর থেকে এলে বেত ঝোপের এপারে, আর নিচে থেকে উঠলে বেত ঝোপের ওপারে যাবে। সে নিচে নেমে গেল যেন পুলিসদের সঙ্গে দেখা করতে। কি হবে? কি হবে?

* * *

কতক্ষণ ধরে কি হয়েছিল তা এখন আর বলা যাবে না। সকাল গড়িয়ে দুপুর পার হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। একবার নিচের জঙ্গলে পলকের জন্য লেছুকে দেখা গিয়েছিল। মনে হয়েছিল পুলিসরা জঙ্গল তোলপাড় করে ছুটছে। একবার বন্দুকের শব্দ হল। শব্দ করার উপায় ছিল না। মাঝারি পথের সেই বাঘচাতালে বসে চন্দানি মুখে আঙুল কামড়ে ধরেছিল। পুলিস বাঘের বদলে মানুষকে গুলি করছে! এক মোচড় দিয়ে পলকের জন্য সব নিচের সড়ক থেকে দ্বিতীয় সড়কের কাছাকাছি উঠে আবার দক্ষিণ দিকে দৌড়াল একজন অন্তত। পুলিস তাকে ধাওয়া করে উঠতে ডোবায় পড়ল মনে হল। চন্দানি কি বলবে—সাবাস! বাঘ যেমন তার বন চেনে, এই বনের ঝোপঝাড় খানাখন্দ, সব যে লেছুর মুখস্থ তা নিশ্চয় এখন কাজে লাগছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছে। কিন্তু অদৃশ্য মানুষের সেই দৌড় যেন পুলিসদের টেনে নিয়ে সব নিচের সড়ক আর মাঝের সড়কের মধ্যে ঝোপ ঝাড় গর্ত গাড়া ডোবা চিরে চিরে, টপকে টপকে, দক্ষিণে যেতে যেতে নিঃশব্দ হয়ে মিলিয়ে গেল। খুব দূর থেকে আবার বন্দুকের শব্দ হল। দু তিনটে এক সঙ্গে যেন।

চন্দানি এখন বুঝতে পারে সেদিন লেছুর উদ্দেশ্য ছিল পুলিসের দলকে চালতাতলা থেকে, চন্দানি আর তার ছেলের থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া।

ঘণ্টাখানেক হতে পারে, দু ঘণ্টাও হতে পারে। চন্দানি বেতঝোপ থেকে সরে যেন লেছুকে খুঁজতে বেরোবে এরকম ইচ্ছা করেছিল। আর তখনই কাছা-কাছি কোথাও হুইশিল বেজে উঠেছিল।

চন্দানি জানতো না তখন চালতাতলা থেকে পুরনো উপরের পথের ঢাল বরাবর চোখ তুললে নতুন উপরের পথেরও খানিকটা খানিকটা দেখতে পাওয়া যায়। ঝোপঝাড় পার হয়ে গেলে ইউক্যালিপটাস সারির ওপারে কি একটা জিফ দেখা যাচ্ছে? ওদিকেও কি পুলিস। সেজন্যই হুইশিল। সর্বনাশ, সে দেখল উপরের পথের নিচের সেই ঢালে একটা ঝোপের আড়ালে থেকে লেদুই উঠে দাঁড়াল যেন, আর তা জিফের তত কাছে! যেন ধরা দেবে।

এখন আর জানার কোন উপায় নেই, কেন সে তেমন করেছিল সেই দুপুরের আলোতে। তা কি দুঃসাহসের নেশা? তা কি বেপরোয়া রাগ? কিংবা তার কি উদ্দেশ্য ছিল, নিচের পুলিসের দলকে যেমন, উপরের পুলিসের দলকেও তেমন চন্দানি আর তার ছেলেদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া। না, জানার কোন উপায় নেই।

এ যেন চন্দানির ভাগ্য, যে নিজের দু চোখে সব দেখতে হল তাকে। জিফ থেকে একজন লোক নামল লেদুকে দেখতে পেয়ে। তারপর ঝোপের আড়ালে আড়ালে, সরু সরু সেই ইউক্যালিপটাসের আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি শুরু হল। চমকে উঠেছিল চন্দানি। সে দেখল জিফ থেকে নেমে ঢাল বেয়ে যে নেমে আসছে সে গজু, সেই গজু বাঘালি। এ কি? সে গুলি ছুঁড়ছে হাত-বন্দুক থেকে। একবার নয়। দুই, তিন, চারবার সে গুলি ছুঁড়ল। একবার কি লাগল লেদুর। একটা ঝোপের আড়ালে সে বসে পড়ল যেন। উপর থেকে গজু দেখতে পাচ্ছে না, নিচে থেকে চন্দানি তো দেখতেই পাচ্ছিল। কিন্তু সেটা তো বোকামি। ঝোপটা ঘুরে যেন টলতে টলতে, ঢাল বেয়ে লেদু গজু আর তার জিফের মাঝখানে চলে গেল। কি আশ্চর্য, মাথা গোলমাল হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, নাকি মাথা আরও ঠাণ্ডা করে নিয়েছে। পায়ের শব্দেই বোধহয় গজু ঘুরতে গেল কিন্তু তার আগে লেদু তার পিঠের উপরে লাফিয়ে পড়ল। সেই ধাক্কায় গড়ানে জমিতে দু-জনেই কিছুটা নেমে এল। দু-জনেই পড়ে গেল জড়াজড়ি করে যেন। পরমুহূর্তে লেদু উঠে দাঁড়াল, গজু উঠল না। আর তারপর লেদু হু-হু করে নামতে লাগল সেই ঢাল বেয়ে। এখন চন্দানি ভেবে পায় না কি হতে পারে সে ব্যাপারটা। কখনও কখনও তার মনে হয়ঃ বাঘ যেমন বনের মধ্যে শেষ আশ্রয়ের জন্য গুহা খুঁজে রাখে, লেদুও কি তেমন কাশে ঢাকা রাস্তার খোঁদলটাকে ঠিক করে রেখেছিল? সেই খোঁদলটাকে লক্ষ্য করেই সে যেন ছুটে নামছিল, পড়ে গিয়েও গড়িয়ে আসছিল। কিন্তু পুলিসের তো একটাই জিফ ছিল না, গজুও একা আসে নি। কত গুলি যে লাগল লেদুকে। শেষের হাত পনরো সে গড়াতে গড়াতে নামল যেন; যতক্ষণ না সেই কাশ বনের খোঁদলে মিলিয়ে গেল তার শরীরটা।

পুলিসরা নেমেছিল। তারা তো তাদের গুলি লাগতে দেখেছে লেহু মিঞার গায়ে। সেই অত অজস্র গুলি। বোধহয় সেই সাত আটজন পুলিস ঢালু জমিটার উপরে পরস্পরকে রক্তের দাগ দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করল। তারপর ঢালের উপর দিকে উঠে গিয়ে জনচারেক মিলে গজুর নেতানো শরীরটাকে হাত পা ধরে ছেঁচড়ে নিয়ে জিপে তুলে চলে গেল।

চন্দানির বুকের তলায় অস্থির হচ্ছে। একে কি কারো একটা কথা জমা রেখে দেয়া বলে? সে হাত তুলে চোখের নিচে জমা জল আঙুলে মুছে ফেলল।

* * *

অউম্ অউম্ অউম্ আঁ আঁ অঁা।

সেই বনভূমির পশ্চাদপট কাঁপল যেন একবার। আবার এসেছে বাঘটা।

চন্দানির মনে পড়ল তখন তো হলংও আসে নি। একা সে সেই কাশবনের গভীর ফাটল থেকে কাউকে কি তুলে আনতে পারতো? পুলিসরাও সে চেষ্টা করে নি। দেখে মনে হয় ওটা শুকনো ঘাসবন। কিন্তু নিচে নামলে বোঝা যায়, দুতিন হাত দেখে কাশের মাথা তেমন দেখায় উপর থেকে। মাঝের সড়ক আর সব নিচের সড়কের মধ্যে ওটা একটা গভীর গর্ত। সেই ফাটলের জন্যই হয়তো মাঝের সড়ক ছেড়ে সব উঁচু সড়কটা তৈরি হয়েছিলো। অনেক দিন আগেকার সেই বর্ষায় হয়তো ওখানটাতেই হলং আর মানসাই মিলেছিল। সে শুধু দু'দিনের চেষ্টায় ফণীমনসার কাঁটা ডাল এনে ফেলেছিল সেই খাদে। যাতে সেই শরীরটা শেয়ালে না খায়। আর দু'দিন পরে হলং বোধহয় এক অকাল বর্ষার ভয়ে তার কুটিরে ফিরলে, তার সামনে ছটুকে রেখে চন্দানি কিছু কিছু মাটি নিয়ে ফেলেছিল সেই খাদে। চন্দানি একেবারে অবাক হয়ে গেল। ফণীমনসার যে মাথাটা জেগে আছে শুকনো কাশ বনে সেখানে একটা বেশ বড় হলুদ ফুল। কিংবা সেটা কি হলুদ মোহন পাখী এই শীতেও।

অউম্ অউম্ অউম্ আঁ আঁ।

হলং বলল, দেখ, ওইটে ফুল।

সে ফণীমনসার ফুলের গুচ্ছটাকে লক্ষ্য করল। বলল আবার, 'আচ্ছা কন তোমরা মালি কেনে জানে। মালি কেনে বলবে বা।'

অউম্ অউম্ অউম্ আঁ আঁ।

ডাকটা কি আরও কাছে এসেছে? অস্বস্তি বোধ করল চন্দানি।

তা লক্ষ্য করে হলং বলল, 'কোটে বা বকরি খাইতে দেরি করছে। আভি তোমাক এইটে দেখি, ভয় দেখাবার ধরছে। যাঃ, যাঃ। আচ্ছা, বটু কয়, ছটু কয়, ওইটাও কি মা কয়?

হলং-এর আঙুল তোলা লক্ষ্য করে, চন্দানি দেখতে পেল, তার কোমরের কাপড় কিছু আলগা হওয়ায় তার ফোলা পেটটা দেখা যাচ্ছে, আর সেদিকেই হলং-এর চোখ। চন্দানি হলং-এর মুখের দিকে চাইল। সেই যেন প্রথম দেখছে তাকে তেমন করে, কিংবা কোন এক অনির্বচনীয় আশঙ্কায় তাকে এর আগে এতদিনেও চোখ মেলে দেখে নি। কত আর বয়স হবে? কুড়ি একুশ? দাড়ি-গোঁফ তো এই উঠছে মনে হয়। নাকি ওর সেই অবস্থায় মানুষ এরকমই থেকে যায় চিরকাল?

কিন্তু বাঘটা কি আরও এগিয়ে আসছে? খুব রেগে গেছে নাকি? না। ডাকটা যেন এবার বরং ঘুরে সব চাইতে নিচের পথের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু এসময়ে কখনও এভাবে ডাকেনা। ডাকটাও যেন অন্য রকম। রাগ না কাতরানি?

চন্দানি উঠে বসল যেন সরে অন্য কোথাও যেতে।

কিন্তু কোথায় যায়? বটুকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই বনেই তো। আর লেদু মিঞা আর সমু। আর লেদু। আচ্ছা ওইটে ওই পাতালত শীতল হইছে এখন। আচ্ছা, আচ্ছা। চন্দানি পিঠের দিকে কোমরে গোঁজা কাটারিটাকে ছুঁল একবার।

হলং উঠে দাঁড়িয়েছিল। আবার বসল। ছটুর বোধহয় বাঘের ডাকে অস্বস্তি হয়েছে, সে কাপড় ঠেলে দিয়ে কাছের মাইটায় মুখ দিল। আর হলং-এর তা চোখে পড়ল।

হলং বলল, আচ্ছা, কন্ তোমরা। আইজ ফুল নাই, কাল কিন্তুক ফুল হয়া যায়। কেমন করি হয়? এটা কিন্তুক মালি ছাড়া কাঁউই না-জানে! হয় না?

অউম্ আঁ অউম্ আঁ।

আরে! বলে উঠে দাঁড়াল হলং। এমন বা করে কেনে? আচ্ছা তো, দুসরা বাঘ কি আইসে?

ঝোপের আড়াল থাকায় স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শ'দেড়েক গজ নিচে নিচের পথ আর এই মাঝারি পথের মধ্যে এবারের বর্ষায় যেখানে ভূমিক্ষয় হয়ে ডোবার মতো হয়েছিল, যার উপরে ভূমিক্ষয়ের দরুন একটা কাঁঠাল গাছ ডালপালা সমেত পড়ে সাঁকোর মত হয়ে আছে, সেখানে যেন কোনো হলুদ প্রাণীকে নড়তে দেখা গেল। কাঁঠাল গাছটার পাতা সবই ঝরে গিয়েছে ডালগুলো খোঁচা খোঁচা সঙ্গীনের মতো হয়ে আছে।

অউম্ আঁ।

এবার আরও মৃদু গর্জন, যেন বা কাতরানি, তারপর ধুপ করে যেন লাফ দেয়ার শব্দ। চন্দানি স্থির করল বাঘটা বোধহয় তাদের দেখতে পেয়ে সব চাইতে নিচের পথের কোথাও জলের দিকে যাচ্ছে। যাক। সে ছটুকে বলল, ছাড়। আর খাস না। সে

ভাবল এই খালি ভাল আর মাল্লির কথা আগেও কিন্তু বলেছে হলং। ও আচ্ছা, দাঁড়াও, এটা ইস্কুলে নিচের দিকের ক্লাসে পড়ায়। তা কিন্তু এই পশ্চিমা নাগা হলং বা জানবে কি করে? আশ্চর্য তো!

তা হ'লে ওকি আগে কোথাও এই ছড়াটা শুনেছে। কে বলেছে ওকে? সে বাঙালি কি? নিজের চিন্তায় অবাক হ'তে হ'তে চন্দানি ভাবল, ও দিকে দেখ কথা ও স্মরণ বলতে তো কাচের জানলা দিয়ে মার উরু জড়িয়ে ধরা ছেলেকে বোঝে, যে রকম দৃশ্যের কথা বললে অন্য সন্ন্যাসীরা ওকে স্বপ্ন বলে বুঝিয়েছে আর যা হয়তো ওর স্মৃতি।

অউম্, অউম্।

হলং বলল, রসেন জেরাসে দেখি আইসং কি বা করে বাঘ। দূর থাকি হুঁসিয়ারসে দেখং।

হলং সতর্ক ভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে সেই চাতাল থেকে নেমে গেল।

চন্দানির মনে পড়ল ডাক্তারের কথা। হলং জন্ম থেকে এরকম নয়। অপারেশনের দাগ এখনও আছে। আচ্ছা, তা হলে কি ওই ছড়াটা শুনবার মত সুযোগ ছিল হলং-এর কখনও।

* * *

আধঘণ্টা পরে হলং দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল।

বাপুরে। বাঘ তো মরি গেইছে। মাথাৎ দাও-এর চোট, সামনার ডান পায়ে রশিতে বান্ধা জাঁতা কল। বাপুরে! লোহার হইবে। আর চার পাচ আঙুল দাঁত সব। তো কাঁঠালের ডালত বাধি গেছে কল আর লোহার রশি। খুলির পারে নাই রক্ত, রক্ত। তো মরি গেইছে।

যেন হলং-এর হাঁপানি, উত্তেজনা, আর কথার তোড়েই দেরি হল চন্দানির দেখতে। হলং-এর দু হাতের আঁজলায় প্রায় বলের মত চেহারার হলুদ কিছু।

—'কিরে উগলা?'

—বিয়াইচে। বাচ্চা তো। একটা মরছে। এই দুইটা আছে। বাঘের বাচ্চা।

—আঃ হাঃ আনলু কেনে? চখু ফোটে নাই হয়তো। দেখ তোর গাৎ রক্ত নাগিছে। আনলু কেনে? খাইবে কি? দুধ পাবে কোটে।

হলং চাতালের উপরে চন্দানির কাছাকাছি বসে, পায়ের কাছে সদ্যোজাত বাচ্চা দুটোকে রেখে হাঁপাতে লাগল।

সোঁদাল

'মানসিটা পাগ্‌গোল হঅ্যা গেইচেরে।'

মানুষ পাগল হয়ে গেলে আর কি বলা যাবে? তার কি তখন আর নাম থাকে? আর এদিকটায় যারা তাকে একাধিকবার দেখেছে তারাও ধরতে পারে না, সে এ অঞ্চলের কিংবা অন্য কোন অঞ্চলের, এমনই বদলে যায় মানুষ যদি বা সে চেনাও হয়ে থাকে। আর সাধারণ চেহারার, অনুজ্জ্বল ছেঁড়াছুটো পোশাকের একজন দিনের স্পষ্ট আলোয় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকলে, চোখে পড়ে, কিন্তু দু-একবারেই কৌতূহল মিটে গেলে, কে আর তাকে লক্ষ্য করে দেখে?

এই অঞ্চলে যেন সে বন্দী হয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় মানুষ কি একটা অদৃশ্য অলঙ্ঘনীয় গণ্ডি অনুভব করে যা সে ছাড়াতে পারে না? একদিকে বহতা বলশালিনী নদী, আর অন্যদিকে এ গ্রামে ও গ্রামে ছড়ান তিনটি বিন্দু। কয়েক বছরের ঋতুচক্রে সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নদী থেকে হিসাব করলে দক্ষিণপশ্চিমে হাতকাটা, মোটামুটি দক্ষিণে হাদলমারি, দক্ষিণপূর্বে লাউতামা। অবশ্যই স্থানীয় মানুষদের দেয়া নাম। গ্রাম নয়, গ্রামগুলোর নাম হয়ত আখুরার হাট, দলদলি, কিংবা টাঙ্গনমারি। এই বিন্দুগুলো বরং কোনো ম্যাপে বসানো বিন্দু যা যেন এক গ্রাম-নিরপেক্ষ সার্ভের উদ্দেশ্যে। খোঁজ করলে জানা যাবে, হাতকাটা নামের সেই মাঠটার তেমন নাম এজন্য যে সেখানে দেবী নামে কারো, তার তা একটা হাতই ছিল, সেই অবশিষ্ট একটা হাতের আঙুলগুলোকে তরোয়ালের কোপে কেটে দেয়া হয়েছিল। সে নাকি, যারা জমি জবরদখল করেছে আর যারা সে জমিকেই আবার জবরদখল করতে চায়, সে রকম দুই দলের মধ্যে সমঝোতা আনতে ন্যায়, অন্যায় শোষণ, তার প্রতিকার, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে যখন বোঝাতে ব্যস্ত, তখনই ব্যাপারটা ঘটে গেছে। গ্রামের কামারের তৈরি কাঠের হাতলের তরোয়াল। পরে নাকি সেই আঙুলকে অন্য কোন দেশের সাহেব-ডাক্তাররা জুড়ে দিয়েছিল। পুবের হাদলামারির ঘটনায় কিছু জুড়ে দেয়া যায় নি। কলাগাছের লম্বা ভুঁয়োর উপরে হাদলা বর্মনকে, তখন তো তাকে বল্লমে গেঁথে ফেলাই হয়েছে, তার গলাটাকে, বালি দিয়ে ধার করা রামদাও ছিল সেটা। দক্ষিণপূর্বের লাউতামার মধ্যে তামার কি অর্থ তা বোঝা শক্ত। সেটা ছিল গ্রামের একমাত্র আউস খেত আর সে ছিল নেতাজি বৈশ্য। আসলে সে ত অনিল কিংবা সুনীল নামে এক 'পাইমারি-মাস্টার'। আলাতনই কথাটা যা সে করে তুলেছিল। কয়েকটা গ্রামের সকলে জেনে ফেলেছিল 'নেরুরা ষড়যন্ত্র করে, বড়লোক আর ইংরেজদের সঙ্গে, ভাশটাকে ভাগ করলো। নেতাজি থাকলে ভাশ ভাগ হইতো না' ত, সে দেশভাগ হওয়ার পরে, এদেশেই জন্মালেও, সেই আর এক ভাশের কথা ভুলতে পারত না, যে ভাশে দুধমাছের ল্যাখাজোখা

নিল না, হিন্দু আর মুসলমান চাচা ভাইস্তা, মামু আর ভাইগনা ছিল। তাকে গাঁয়ের ডোবায় স্নান করিয়ে, গলায় জবার মালা পরিয়ে, গ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে লম্বাটে এক লাউয়ের উপরে ফেলে, বেশ কয়েকজনে তখন ধরে রেখেছিল তাকে, কিন্তু নতুনত্ব ছিল না, সেটাও রামদাও ছিল।

কিন্তু মনে হয় এই বিন্দুগুলোর সত্য কিছু মূল্য নেই। সেই তিনবারের তিনটে ভোটের পরে আরও কয়েকবার ভোট হয়ে গিয়েছে। মানুষ গ্রামগুলোর পুরনো নামই ব্যবহার করছে আবার। সে সব ব্যাপারেরর জায়গাগুলোকে দেখিয়ে দিতে এমনকি একটা করে গাছও লাগান হয় নি। সেই বিন্দুগুলোর চারদিকে, এমনকি বহতা নদীটার ওপারে গিয়েও গ্রাম, বড়গ্রাম, শহর, গ্রাম—একই রকম, একই রকমে পরিবর্তনশীল, আর প্রখর আবরণহীন সূর্যালোকে আধুনিকতা, মোটরবাস, ইলেকট্রিসিটির দিকে দ্রুত ছুটছে। এই বিন্দুগুলো দিয়ে সে সব থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অঞ্চল কি হতে পারে? বোধহয় এরকম বলা ভাল, তা সত্ত্বেও যদি কারো মনে বিন্দুগুলো যুক্ত হয়ে একটা গণ্ডি তৈরি হয়ে থাকে, যা সে পেরোতে পারছে না, তবে তার মনকে সুস্থ বলা যায় না।

বাস্তবের দৃষ্টিতে দেখতে হলে এমন কোনো বিন্দু থাকা দূরের কথা, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরের মধ্যে কি কোনো ব্যবধান, পার্থক্য, আড়ালই কি থাকছে? অন্ধকার, অন্তত আধো-অন্ধকার, সবুজ মিশানো কালচে অন্ধকার থেকে হলুদ-ধূসর-উজ্জ্বল সূর্যালোকে, আদিমতা থেকে আধুনিকতায় পৌঁছে যাচ্ছে জেলাকে জেলা। আর সবই এই গত কয়েকটা বৎসরে। গ্রামগুলোর মধ্যে মধ্যে, গ্রাম আর শহরের মধ্যে এই অবস্থায় আড়াল, আবডালও থাকে না। গ্রামের লাগালাগা বন দূরের কথা, বনের সঙ্গে লাগালাগা দু-চার হাজার একরের ছোট বন ঠিক দু-বছরের মাথায় ধানক্ষেত, পাটখেত, গ্রাম আর গঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কি অদ্ভুতভাবে অলস, ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন, আদিম মনের মানুষেরা ছিল এখানে।

সেই অনেকদিন আগে থেকেই এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সেকালের প্রয়োজন মত সড়ক ছিল। ত্রিশ ফুট চওড়া সেই সড়ক, যার মাঝ বরাবর পনের ফুট আবার বাঁধান, প্রথমে ইটে, পরে মহাযুদ্ধ-টুদ্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরকুচি আর পিচে। আর সেই পথ দিয়ে এ মহকুমা ও মহকুমাকে যোগ করে দিনে খানচারেক বাস চলত। আর তেমন বাস এসে পড়লে সেই সড়কে চলা ধান বা পাট অথবা তামাক বোঝাই গরু বা মোষের গাড়ি, অথবা ছইয়ে ঢাকা বুড়ো-বুড়ি, শিশু অথবা স্ত্রীলোক নিয়ে চলেছে এমন গরু বা মোষের গাড়ি সসম্ভ্রমে, সড়কের ধারের বন ঘেঁষে, ঘাসে ঢাকা সড়কের অংশে সরে দাঁড়াত; বাসটা চলে গেলে আবার নিরুদ্বেগে চলত।

বনই ত। পথের দুধারেই ঘন গাছের সারি, শাল, শেগুন, কড়ি, গামহার। সেই সারির মধ্যে নেমে গেলেও বনই চলতে থাকত অনেক জায়গায়। কোনো কোনো জায়গায় সেই বনের সারির মধ্যে দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা নেমে যেত, এঁকে বেঁকে চলা মরুচমতী নদীটার যেমন এখানে ওখানে শাখা বেরোয়, আর সেই সব কাঁচা রাস্তা ধরে চলে গেলে, ধানখেত, পাটখেত, ঘরবাড়ি কুটির সমেত গ্রামও পাওয়া যেত। সে সব গ্রামকে ঘিরেও আবার বন, কাঁঠাল, জাম, বাঁশ।

বনই ত। যত গ্রাম, তত বন। কোথাও গ্রামের কোথাও বা বনের প্রাধান্য। কোথাও গিয়ে মনে হত বন শেষ হয়ে গিয়েছে, এ ত শহর। বাজার বন্দর, কোর্টকাছারী, স্কুলকলেজ, ইলেক্‌ট্রিক আলো, ট্যাক্সি আর ট্রাক, ময়লা জলের নর্দমা, স্ট্রিট আর রোড। যেমন সদর শহর, যেমন তার তুলনায় ছোট, কিন্তু একই আদর্শে তৈরি মহকুমা শহর। অনেক অনেক গ্রাম পরস্পর সংলগ্ন হলে এরকম সব শহর হয়ে যায়। তা হলেও, সেসব শহরেও পথের ধারে ধারে সেগুন, মেহগ্নি, কুড়ুই, জাম গাছের সারি থেকে যেত। তা হলেও সদর শহরেও এরোপ্লেন, যা নাকি আকাশে ওড়ে, তার নামার মাঠের আর শহরের বাড়িঘরগুলোর মধ্যে সেই মরা নদীটার এপারে ওপারে ঘন শালের বন থেকে যেত।

অন্য কোথাও বনেরও প্রাধান্য ছিল। যেমন এই অঞ্চলটারই উত্তর অংশটায়, অথবা এই বহতা নদীটা পার হয়ে সদর শহরটার পশ্চিমে পশ্চিমে চলে, এ গ্রাম সে গ্রামের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে, এমন কি বহতা নদীর এখাত সেখাত পার হয়ে হয়ে, কোলের কাছে একটা দুটো গ্রাম রেখে রেখে, এক মহাবন আর এক মহাবনকে স্পর্শ করে করে বিরাজ করত। আর সেসব বন যেমন হয়, দিনেও আলো হয় না, জোনাকি জ্বলে এমন অঞ্চলও ছিল। গাছগাছালি ছিল, মহীরুহ, বনস্পতি ছিল; হাতি, গণ্ডার, বাঘ শুয়োর, হরিণ, বুনোমোষ, বনমুরগী, সাপ ছিল। ঝরনা ছিল, বড় নদীর ছোট ছোট শাখা ছিল; হাতি ঘাস ছিল, বুনো ঘাস ছিল', জলে শাপলা শালুকের, হোগলার, কাশের সমারোহ থাকত। আর সেই অগম বনের অন্তঃস্থলে কখনও, সেই বনে হারিয়ে গিয়ে, বুনো মানুষের গোষ্ঠীও থাকত। যেমন একটা গোষ্ঠী যারা নিজেদের অসুর বলে। সব প্রাণী যেমন বাসস্থলের সঙ্গে নিজের শরীরের রং মিলিয়ে নেয়, এই মানুষেরাও, যেন হাজার বছরের চেষ্টায়, বনের সেই আধ-অন্ধকার শ্যামলতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছিল নিজেদের। যেন একদল শ্যামল সাঁওতাল, কি করে বা এইসব বনে বাস করতে এসে জাতি বদলে ফেলেছে। তেমনই, কিন্তু হঠাৎ যেন অনেক বেশি লম্বা, নাক ছড়ান নয় কিন্তু টিকলো, আর বড়, অন্ধকারে দেখতে হয় বলেই বোধহয় চোখের মণি বড় আর খয়রা ধরনের। আর সেই বহতা নদীটার দক্ষিণ পশ্চিম, দক্ষিণ, আর দক্ষিণ পুবের সেই

রক্তাক্ত বিন্দুগুলোকে ছাড়িয়ে দক্ষিণে চলতে থাকলেও তেমন বন আর গ্রামে মেশামিশি ছিল, গলাগলি ছিল। একে অন্যকে তার হলুদ সোনালি এসব রংকে উপহার দিলে, অন্যেও সবুজ ও নীলকে উপহার দিত। বনের বর্ষার মেঘ গ্রামগুলোকে স্নান করিয়ে দিয়ে বনের সবুজের গায়ে নীল নীল কুণ্ডলী হয়ে হাসত—যতক্ষণ না দশ মানুষ সমান উঁচু সেই মাটির প্রাচীরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়—যে প্রাচীর এক নগরকে রক্ষা করতে তৈরি হয়েছিল যে প্রাচীরের লজ্জাকে ঢাকতে বন তার সবুজকে পাঠাতে চেষ্টা করে এখন।

এসব বন অবশ্যই তপস্যার ভূমি হয় না, শান্তির আলয়ও না। আর কবিতাও হয় না। বরং জীবন আর মৃত্যু সেখানে পরস্পরের আলিঙ্গনে, সেখানে সবই লজ্জার, সবই স্বাভাবিক; সেখানে জীবন আর মৃত্যু কে কাকে ফলবতী করে তা বলা যায় না। অথবা বলতে হবে আমাদের চিন্তাভাবনা দর্শন কিছুকেই সে অরণ্য আমল দেয় না। বরং কিছু সময় তার সান্নিধ্যে থাকলে এরকম মনে হতে পারত, সে কিছু না বলেই জানিয়ে দিচ্ছে: তোমাদের এক রাজ্যচ্যুত রাজাকে তার সৈন্যসামন্ত সমেত আশ্রয় দিয়েছিলাম। অন্য কোনো সময়ে এরকমও মনে হতে পারত, কালচে সবুজ মনসুন মেঘই যেন গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে কৌতুকে নেমে পড়েছে। আর উঁচু থেকে নামা মনসুনেরই আর এক মেঘের নীল, কালচেনীল কুণ্ডলীগুলো নেমে নেমে অরণ্যের অতিথি হলেই বুঝতে পারা যেত একই জাত। দুজনে মিলে জল নিয়ে খেলতে খেলতে গ্রাম-গঞ্জ নদীনালাকে ভাসিয়ে দেবে। গ্রামগুলোর গায়ে এসে পড়বে খেলার মাতলামিতে। খেলা শেষ হলে মেঘগুলো উঁচু হতে হতে উদাসীন আকাশে মিলিয়ে গেলে, বনানীও গ্রাম থেকে দূরে সরে উদাসীন ভঙ্গিতে আবার ভাবতে থাকবে, হয়ত গর্ভের কথা।

উদাসীন বটে কিন্তু স্নেহশীলাও। তা না হলে ছোট গ্রামগুলো কেন কোল ছাড়তে চায় না? বড় বড় গঞ্জ বন্দরওয়ালা গ্রাম আর শহরগুলো দূরে দূরে হাঁটে বটে।

কিন্তু এসবই অতীতে মনে হতে পারত হয়ত। ধান, পাট, তামাকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন বদলায়। একটা হরিণী এক ঋতুতে আর একটা মাত্র হরিণ দিতে পারে, এক হস্তিনী আর এক হস্তিনীকে আনতে দুবছর সময় নেয়, এক শাল থেকে আর এক শাল হতে ষাট সত্তর বছর লাগে, এক মেহগ্নি থেকে আর এক তেমন মেহগ্নি হতে দু-শ বছর লেগে যেতে পারে, একটা বন হতে হাজার বছর লেগে যায়। একটা ধানখেত তৈরি হয় এক বছরে। একটা ধান এক মরসুমে হাজারটা ধান আনে। এই আবিষ্কার থেকেই ত মানুষ মানুষ হল। যদি এক মুঠো ধান লাগালে গোলা ভরে ওঠে, এক গোলা ধান লাগালে কি গোটা একটা গ্রামকেই ধানের গোলাঘর করা যায় না? বনের মধ্যে কোদালের জুমচাষের চাইতে বন হাসিল করে লাঙলের চাষ অবশ্যই ভাল।

ধান উৎপাদনের পদ্ধতিতে যে কোন সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদিকে নির্ধারিত করে, সে তো এখানকার নানা অধিবাসীদের মধ্যে রাভাদের লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। তারা তো বলে 'নাং কোচা'—আমরাই কোচ। আর গারো পাহাড়ের আদিবাসীরা শৌর্যেবীর্যে সকলকে ছাপিয়ে উঠতে থাকলেও (তারা তো তখন পশুপালক পশুশিকারীর স্তরে) পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ ছাড়া কিছু জানত না। তারা এই সমতলবাসী কোচদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ধান চাষ শিখতে—এই ডাক থেকেই, রব থেকেই তারা রাভা। আর সেজন্যই ধানজমি আর রাভাকন্যা, আর রাভাগৃহ, এক থেকে অন্যটা পৃথক হয় না। জমি আর কন্যা একই আত্মার দুই পৃথক রূপ, কন্যার গৃহও তাই। পুরুষ লাঙলের ফলা হতে পারে ; তারপর তো সে এদিক ওদিক চলে যাবে, কন্যা ছাড়া কে লালন করবে ধান। পুরুষ জঙ্গল থেকে বাঁশ, কাঠ, ছন এনে ঘর তুলতে পারে, কিন্তু সেই ঘর যদি একটা রাভাকন্যার শরীরও না হয়, কোথায় আশ্রয় পাবে পুরুষ ! সেজন্যই ধানের জমি আর ধান, গৃহ আর সন্তান সব সময়েই রাভাকন্যার, রাভাপুরুষের নয়। পুত্রই হোক, অথবা কন্যা, মায়ের পরিচয়েই পরিচয়, মায়ের গোত্রই গোত্র। জমি ধ্রুব, গৃহ ধ্রুব, জননী ধ্রুব। এই ধ্রুবতার আশ্বাস ছাড়া ধান আর সন্তান ভাল হয় ? পুরুষের ত প্রয়োজন আছেই। ধান খেতে শূয়োর আসে, বুনো মোষেরা আসতে পারে, হাতি এলেই বা কি করছে ? তীর ধনুক, টাঙ্গি, বল্লম নিয়ে তখন পুরুষকে এগতে হবে। নিজের শরীরের মদ যদি দাঁতাল শুয়োরের, শিং বাগানো মোষের, কিংবা পাহাড় হেন হাতির সামনে দাঁড়ানোর সাহস না দেয়, রাভাকন্যাব যে মদ তাতে সাহস সংগ্রহ করো।

মোন্নাত বারবার প্রমাণ পেয়েছে ধান উৎপাদনের পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে পরিবর্তন আসে। মলগু দাস কিংবা মোঙ্গলচন্দ্র দাসের ব্যাপারটা মনে কর। মলগুঁ রাভাদের জাতীয় ইতিহাস আর রাভা ভাষার ইতিবৃত্ত বিক্রি করে বেড়ায়। রাভাদের জনসংখ্যা কেন লোপ পাওয়ার মত কমে যাচ্ছে, তাদের ভাষাটা মরে যাচ্ছে কেন, এসব নিয়ে সে দুশ্চিন্তা করে, এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম রাভাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বেড়ায়—অবশ্যই এসব সেই সময়ে যখন জমিতে ধান থাকে না। মলগুঁর স্বজাতি-প্রীতি মোন্নাতকে আকর্ষণ করেছিল। মোন্নাত জিজ্ঞাসা করেছিল রাজবংশী ভাষায় (তার কাছে রাভা ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষাও বরং সহজবোধ্য) ; তোমার বাড়ির সব চাইতে ভাল ঘরটায় কি রাইন্তক আছে ? ধামাভরা সবচাইতে ভাল চালই কি রাইন্তক ঠাকরানী ? সেই ঠাকুরকে রোজ বাঁশের চোঙাৎ কি চকোৎ, মদ, দেন ? সম্ভব হলে, যোগাড় করতে পারলে সেই রাইন্তক ঠাকুরকে শুয়োরের মাথা নৈবেদ্য দেন ?

সবগুলি প্রশ্নের উত্তরেই মলগুঁ দাস হাঁ হাঁ করে যাচ্ছিল।

মোন্নাত আবার প্রশ্ন করল, 'তোমার গোত্র কার?'

'কেনে, আমার মার।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা কার গোত্র পাইবে?'

'কেনে, তাদের মার।'

'আচ্ছা, তো, তোমার চিকাবায়রাই কি? আছে, কি নাই?'

চিকাবায়রাইয়ের কথা কেউ তোলে? একই সঙ্গে তা মানুষকে ভয়ও দেখায়, উদামও করে দেয়।

সব রাভাই জানে তার চিকাবায়রাই আছে, আর সে তা একবারই শুনবে যখন সে মরণোন্মুখ।

সে ইহজীবনে যেখান থেকে এসেছিল আর মৃত্যুর পরে যেখানে ফিরে যাবে, তা তার জানার কথা নয়। জানলে বেঁচে থাকা যায় না, আর তা তার জননীই মাত্র জানতে পারে। সুতরাং মরণোন্মুখ রাভার কানে কানে ভবিষ্যতের আশ্বাস সে সংবাদ জননীকেই বলে দিতে হয়। সারা জীবনটা সেই সংবাদ জননীর মনেই গোপনে থেকে যায়। এমন ত প্রায়ই হতে পারে, কোনো রাভার মৃত্যুর আগেই তার জননীর মৃত্যু হবে। সেরকম সম্ভাবনা দেখা দিলে, সেই গোপন সংবাদটি জননী সঙ্গোপনে সেই রাভার মাতৃসমা কাউকে, কিংবা হয়ত তার স্ত্রীকেই গোপনে বলে যায়। তা ছাড়া কি করেই বা মৃত্যুর সামনে নির্ভীক হবে একজন রাভা?

মলগুঁ বলেছিল, 'কোন্ রাভার চিকাবায়রাই নাই থাকে? কেমন রাভা সে?'

মোন্নাতও না-ছোড়, সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তা হলে তোমরা দাস কেনে? তোমরা বৈষ্ণব হছেন'?'

মলগুঁ বুঝিয়েছিল, রাভাদের বৈষ্ণব হওয়ার কিছু অসুবিধা আছে। রাইস্তককে পূজা চলতে পারে লক্ষ্মী বলে। কিন্তু সেখানে চকোৎ মদ দেওয়া যাবে না, শুয়োরের মাথা ত নয়ই।

মোন্নাত বলেছিল, 'আচ্ছা তা, তোমার ধান জমি কাঁয় পায়, বেটা, না বিটি?'

মলগুঁ বলেছিল, 'কেনে? বেটা পাইবে।'

তারপরে দুজনেই হেসে ফেলেছিল। মলগুঁ যেন তার হাসি দিয়ে স্বীকার করেছিল সে নিজেকে বৈষ্ণব না বললে, তার ধানের জমি, প্রকৃতপক্ষে যা তার স্ত্রীর, তার ছেলেরা পেতে পারে না। আদালত মানবে না, সমাজ মানবে না। মলগুঁ কথায় কথায় স্বীকার করেছিল, তার শাশুড়িই তাকে তার স্ত্রীর গ্রামে নিয়ে আসে। তার জননী নিশ্চয় তার শাশুড়িকে তখনই তার চিকাবায়রাই বলে দিয়েছে। আর তার শাশুড়িও সেটা তার

স্ত্রীকে নিশ্চয় বলে যাবে, সে বৈষ্ণব হলেও। সে মেয়েদের দেখবে না এমন নয়। মোয়াজ্জ যেমন লেখাপড়া শেখা ছেলে, সে ত বড় হয়ে হাইস্কুলের মাস্টার হবেই। সেরকম কোনো রাভা ছেলের সঙ্গে মেয়ে ভুটোর বিয়ে দেবে। মেয়ের কি তখন ধানের জমির দরকার থাকবে আর?

মলগুঁ শুধু কমিশন পাওয়ার জন্যই বইগুলো বিক্রি করে বেড়ায় না। তার কথা থেকে বোঝা যায় সে নিজের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করে। যে রাভাভাষা সে নিজেও খুবই কমই জানে, তাকে আবার একটা প্রচলিত ভাষা হিশাবে দেখতে চায়। তার একটা সরলতা আছে যাকে সত্যনিষ্ঠার কাছাকাছি বলা যায়।

সে বলেছিল, 'দেখো, তোমরা, মোর জমির উত্তরৎ কুঞ্জ বর্মনর জমি। উমরা রাজবংশী। রানীর বংশ নো হয়। রাজার বেটা রাজা হয়। তো উমরার বাপের জমিও বেটা পায়। পূবৎ বিসারু মহম্মদের জমি। উমরার বড়ো বাপ রাভা। চেহারাৎ এলাও মালুম হয়্যা যায। এলাতো মহম্মদ, বাপের কাল থাকি। দক্ষিণৎ জমি কিন্তু পদ্মিনী রাভার, দশ বিঘা। আঃ হাঃ তেমন দুঃখনী আর কোটে দেখেন? একই মাসে পুরুষ গেইল, বিটি গেইল।'

মলগুঁ পদ্মিনী রাভার দুঃখটাকে যেন অনুভব করল মিনিট দুয়েক। পরে বলেছিল পদ্মিনীর সেই অল্পবয়সী জামাই তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তখন তার গ্রামে গিয়েছিল বলেই হয়ত রক্ষা পেয়েছিল। কে তখন পদ্মিনীর সেই ধানের জমি দেখে? ধানের এক খন্দ চোখের জলে ভেসে গেল। দ্বিতীয় খন্দে হল বিশ মণ। তাও তখন জামাই ফিরে এসে ধান কেটেছিল বলে। তৃতীয়বার ধানের খন্দের আগে, রাভা মেয়েরা সেকালে যে সাহস পেত তেমন সাহস করে জামাইকে বিয়ে করল পদ্মিনী-পঙ্কজিনী। দশ বছরে সেই জামাই গেল যক্ষায়, দশ বছরের বেটা রেখে। এবার দেখ আবার ধানের দ্বিতীয় খন্দ যায়। সেই দশ বছর আগেই পঁয়ত্রিশ ছিল পদ্মিনীর। এখন ত চুলে পাক, চোখের কোণে কোণে কাটাকুটি, শোকে তাপে পুড়ে পুড়ে কালো হয়েছে মানষিটা। বুদ্ধি নিতে এসেছিল। লোক রেখে চাষ করাবে। কি সর্বনাশ! খেতে ঢুকতে দিও না। এখন বরগার আইন। সারা দেশে। একবার কেউ তোমার জমি ছুঁলে তোমার বাড়ির আর বাঁশ থুপির আধাবিঘা ছেড়ে সব বর্গাদারের হয়ে যাবে। তখন বিসারু বুদ্ধি দিল। ধানের খন্দের আগে নিকা করেছে বিসারু মহম্মদ। বিসারুর লাভ দেখেন। পদ্মিনীর বা কি ক্ষতি? জমি থেকে গেল। ছেলে বড় হলে জমিটা পেয়ে যাবে। মহম্মদীরা তেমন পায়। বিসারুও এ কাজে নতুন নয়। আরও এক মহম্মদী বেওয়াকে এক ছেলে এক মেয়ে আর আট বিঘা জমি সমেত নিকা করেছে সে পাঁচ বছর হয়। তার নিজের প্রথম

এনিকার দুই বেটা আছে। তাহলে বিসারুর সব সমেত পঁয়তিশ বিঘা জমিতে কাজ করবালোক হল আটজনা। বর্ষা কোথায় লাগে, কোথায় লাগে আধিয়ার। দেড়শ মন ধান তোমার পঁয়তিশ বিঘাতে। পক্বিনীকে বছরে দুখানা শাড়ি আর তার বেটাকে দুটো করে হাপ প্যাণ্ট, দিলে হবে বছরে, আর সারা বছরে দুবেলা করে খেতে।

মোল্লাত মনে মনে হিশাব করে দেখেছিল সংসার চালিয়েও বছরে কম করে পঞ্চাশ মন ধানের দাম জমা হবে বিসারুর হাতে। পক্বিনীর দশ বছরের বেটা সাবালক হলে, তাকে তখন জমি ফিরিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি? বিসারু ততদিনে বিসারু ব্যাপারী হয়ে যাবে, ধানের ব্যাপাব, পাটের ব্যাপার, গম ভাঙানো কলের ব্যাপার করতে থাকবে।

মোল্লাত ভরে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বিসারুর জমিতে আধিয়ার বসতে চাইবে না? মলগুঁ বলেছিল, 'উমরা না মাইন্‌রোটি।'

শুধু কি এই? মলগু বলেছিল, 'কি করবে, কন, তোমরা—রাভার বেটা? রাভাব বেটির নয় তো ধানখেত থাকিল। হাঁতি আইসে, রুখবে? ভৈষা ঢোকে ধাতক্ষেতৎ, পেনটি ধরি টানো? বুনা শুয়োর আইসে ধান বাড়ি?, বন কোটে?'

মলগুঁ যেন বলতে চাইছে, বন কোথায়? অরণ্য কোথায় গেল? রাভা পুরুষদের সে ক্ষেত্রে কি কাজ অবশিষ্ট আছে আর? রাভা মেয়েদের ধানজমিতে চাষ দেয়ার পরে কোনো কাজই কি এখন আর অবশিষ্ট থাকে রাভাদের, যদি সে বনে বনে শিকারও না করে? রাভা মেয়েদের শরীরে যে শাস্তি তার জন্য পুরুষকে ধানখেতেব কাছে আসতেই হয়, কিন্তু নিজের পৌরুষ? আরও ওটাও ভেবে দেখ। যে তোমাকে ধানখেতে সাহায্য করতে ডেকেছিল সেই নেই। তখন বনই ত তোমাদের আশ্রয়, কারণ সেই ধানখেতে, সেই গৃহে তোমার কিছুমাত্র স্বত্ব নেই তখন।

আর সে জন্যই রাভাদের ধানখেতের গ্রামগুলোর ধারেই যেন বন থাকবে। আর সেজন্যই যেন যত গ্রাম তত বন। হয়ত এসবই তেমন সময়ের কথা যা বর্তমান থেকে অনেক দূরের। এরকম যুক্তিও দেয়া যেতে পারে; শুধু ত রাভা নয়, কোচরা, রাজবংশীরা, তাদেরও গ্রাম ছিল; কোচদের ধানখেতগুলো ত পুরুষদেরই। তাদের গ্রামের ধারেও তবে কেন অরণ্য?

মোল্লাত ভেবে দেখেছে সেটাও ধান উৎপাদনের আর এক পদ্ধতি। বনের মধ্যে সে সব গ্রাম ত জোতদারের? আর জোতদার ত তারাই যারা দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকত ঘাঁটি আগলাতে, রাজার পক্ষে, সম্ভাব্য শত্রুর বিপক্ষে, যদি বা কোনো শত্রু বনকে উপেক্ষা করেও রাজ্যকে আক্রমণ করে। সেই ঘাঁটিদাররাই তো বনের মধ্যে মধ্যে গৃহী আর

জোতদার হয়ে ধানের মালিক হত। কিন্তু বনকে তারাও রক্ষা করত। দেখা যাচ্ছে কি রাভা, কি কোচ, রাজবংশী বনের সঙ্গে সুসম্বন্ধ রাখত।

বনকে রক্ষা করলে বন তোমাকে রক্ষা করে এরকম বলা হয়ত বক্রোক্তি নির্ভর। বনের কি প্রাণ আছে, না ব্যক্তিত্ব? এরকম বলা যেতে পারে দক্ষিণ থেকে এগিয়ে আসা আক্রমণকারীরা অনেকবার বনের দুর্ভেদ্যতার কাছে পরাজিত হয়েছে। সেজন্যই বন। বন বৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, এটা হয়ত বা অবৈজ্ঞানিক, কিন্তু বন খালবিল নদীনালাকে শুকাতে দেয় না, মাটিকে নরম রাখে। আর সেজন্য বনের ছায়ায় নদীনালায় তড়াগে অজস্র বড় জাতের সরস ঘাস হতে থাকলে, মোষ আসত হৃষ্টপুষ্ট হত, সংখ্যায় বৃদ্ধি পেত। কালো প্রকাণ্ড মোষ, আর ছোট বাদামী হরিণ।

কিন্তু দক্ষিণ থেকে আক্রমণ করার ঝুঁকি যখন থাকল না তখনও যদি যত গ্রাম ততই বন থেকে থাকে? মোন্নাত এই ভেবেছে, মনের মধ্যে অভ্যাস, স্মৃতি আবেগ এই সবের অন্ধকার অন্ধকার কোমল কোমল গাঢ়সবুজের ভাবটা আর এক বনই, যা বাইরের বনের পক্ষপাতী হয়। নতুবা রাজাই নেই, ত তার রাজ্যরক্ষা।

তা হলেও এসবই অতীত যার তুলনায় বর্তমানকে বোঝা যায়। মেঘলা দিনকে যেমন চড়া রোদের আলো, রাজাকে যেমন গণতন্ত্র, স্মৃতি-আবেগ-অবচেতনকে যেমন লেখাপড়া আর বুদ্ধি, তেমন বনারণ্যকে কাটতে কাটতে, ভাঙতে ভাঙতে, ঝলসাতে, ঝলসাতে আল টপকে টপকে শত শত মাইল চলে যাবে চষা জমির ধূসরতা। বর্তমানের সামনে অতীত উবে যায় না? তা ছাড়া কলকাতায় বন আছে? বর্ধমানে, নদীয়ায়, আসানসোলে?

অতীত চলে গিয়ে বর্তমান যখন আসে, তখন ত পরিবর্তনও হতে থাকবে। একদিন সকলেই দেখতে পাবে, পাচ্ছেও তা, সে রাভা, মেচ, কোচ, অথবা রাজবংশী হক, তার ধানজমির উত্তরে বা দক্ষিণে, পূর্বে অথবা পশ্চিমে যা আছে, তা অন্য অনেকের ধানজমি। বৃষ্টি নামে নামে মনে হয় এমন মেঘের আকারের বন নয়। আর তার ফলে আরও নানা রকমের পরিবর্তন হবে, হচ্ছেও তা। যেমন এটা না হয় রাজ্য যার সীমা ছিল, সেই সীমার বাইরেও অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যগুলোর মধ্যে অরণ্যকে গোলগোল করে কেটে নিয়েই তো চা বাগান। সেইসব অরণ্যের অধিবাসীরা ভয়ে ভয়ে দূরে চলে গেল, হাতি, বাঘ, গণ্ডার, মোষ, মানুষ। কিন্তু ধরাও পড়ে, পোষও মানে। সেই চা বাগানগুলোতে কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী, নেপালি, মুণ্ডা সব মিলে একটা নতুন পোষা মানুষজাতি তৈরি হচ্ছে, হয়েছে। যেমন বনের প্রান্তে, বনে ঢুকেও যে অসুর জাতিটা বাস করত, কোথায় গেল? যেমন নদীর কূলে কূলে, বর্ষায় তৈরি হওয়া খালে,

নালায়, সেই সরস, সবুজ, লম্বা ঘাস খেয়ে যে বুনো মোষরা বৃদ্ধি পেত, তারাই বা ? মোষ তো আছেই, লাঙল টানতে, গাড়ি টানতে, কাঁধে ঘা, বিখাজ, চোখে পিচুটি, হাড আর চামড়ায় তৈরি তারা।

এটা জীব বিজ্ঞানের তত্ত্ব হয়ত যে খাদ্যহ্রাস পেলে জীবনও হ্রাস পায়, শুধু সংখ্যায় নয়, আকারে আয়তনে। যেমন হাতি নামে না। নামলেও কদাচিৎ, পানাঘন্টি, জয়ন্তী কুমারগ্রামের প্রান্তে হয়ত। সংখ্যায় জোর আট দশটিই হবে। তাও সে দলে সবচাইতে বড দাঁতালটি হয়ত বা আট ফুট দাঁডায়। সাডে দশ ফুট দাঁডাবে যে হাতি, তা আর জন্মায় না। বনের ছায়া মরলে খালনালা ছোট নদীগুলো শুকিয়ে যাবে, ঘাস হবে না, মোষ কি করে সংখ্যায় আর আকারে বাডবে ? সেই অসুর জাতিটাও যাব কালো চেহারার পুরুষবা কখনও ছ ফুট দাঁডাত, তাবাও সংখ্যা আর আকারে কমে যাবে, তা স্বাভাবিক। অন্ন আর গৃহ দুই যদি চলে যায় সব প্রাণীর মত মানুষও দিশেহারা হয়, দল ভেঙে যায়। হয়ত তাদের কেউ চা বাগানেব সেই নতুন জাতে মিশে গেছে, হয়ত তাদের দু একজন আলের পর আল টপকে চলা শত শত মাইল বিস্তৃত ধান আর গ্রাম, রেল আর মোটর রাস্তা, ছোট ছোট ফ্যাক্টরি আব দোকান, ইলেকট্রিসিটি আর রাজনীতির ফর্দাফাঁই আধুনিকতায় চলে এসেছে।

যেমন জিন্নি, অথবা তিন্নি নামে এই কালো রঙের স্ত্রীলোকটি। শ্যামল কালো, ছোট ফাঁদের টিকলো নাক, বড বড চোখে অসাধারণ বড, কালোর চাইতে ববং বাদামী রঙের মণি, কানেব লতিটা বেশ বড আব তাতে কলমেব মত মোটা খডকে পরা, লম্বা আঙুল আর কাচা জাম রঙেব হাতের তেলো—কালোয় সেই লালেব আভা, আর তা বলতে ঠোঁট দুটিও। বেশ লম্বা পা আব তা চোখেও পডছে, কারণ হলুদ ঝিঙেফুল শাডিটা হাঁটু পর্যন্ত, তা বলতে হাত দুখানাও কাঁধ থেকেই চোখে পডে, শাডি যোগাড করা কঠিন, জামা কি ভাবে হয় ? গলায় বেতের কিংবা হলদেটে শাদা প্লাস্টিকের পাটিহার, আর কোমরে পিঠের দিকে গুঁজে রাখা বেশ বড একটা কাটারী। অসাধারণ লম্বা।

কিন্তু তাই বলে, সেই সাডে তিন হাত ছাডিয়ে লম্বা হলেও, তাকে নির্দ্বিধায় অসুর জাতের হয়ত বলা যায় না। যখন বন ছিল, বনের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে অনেক সময়ে মোষের বাথান থাকত। কুডি পঁচিশ থেকে একশ দেডশ মোষ। সে সব বাথানের মানুষেরা কিছু ধানের জমি করত, কিন্তু তাদের ব্যবসার পণ্য ছিল মোষের দুধ আর মোষ। দুধ তো মানুষের খাদ্যই, দুধ, মাখন, ছানা শহরে, বড গ্রামে ধনীদের লাগবেই। আর মোষও লাঙল দিতে, গাডি টানতে ; রাজার শিকারের জন্য বাঘের খাদ্য বনে বেঁধে

রাখতে, রাজার পূজায় বলি দিতে—সে সব অবশ্য বাচ্চা ধরনের মোষ যাদের শিং তখনও ছড়ায় নি। রাজা নেই, তার শিকারের বাঘ নেই, রাজার পূজাটা থেকে গেছে, বলি এখনও হয়। এরকম পরিবর্তন আরও হয়েছে। বন যেমন বুনো মোষের দরকার, বাথানের মোষেরও তেমন। বাথানের মোষই বা বনে ছাড়া কোথায় চরবে? সুতরাং বন পিছিয়ে গেলে, গ্রাম থেকে দূরে সরলে বাথানও তাকে অনুসরণ করত। বাথানের ভৈইষীগুলো বনে চরতে অনেক সময়ে বুনো মোষদের দেখা পেত, বুনো মোষেরাও কোনো কোনো সময়ে বাথানের ভৈইষীদের সঙ্গে মিশতে আসত। কোনো কোনো সময়ে বুনোতে আর বাথানীতে পৃথক করাই যেত না। দুধ বেশি হোক না হোক, সেজন্যই মোষের দাম বেশি হত গোহাটায়। এমনও হতে পারে যারা মোষ নিয়ে বনে ঢুকত, আর যারা বনেই বাস করত, তাদের এক পক্ষের একজনের সঙ্গে অন্য পক্ষের আর একজনের দেখা হয়ে যেত। ফলে এসব বাথানের মানুষদেরও কারো কারো চেহারায় টিকলো নাক আর বড় চোখ আর জামরঙের হাতের তেলো দেখা যেত। তেমন বনে যারা নিজেদের অসুর বলত তাদের মধ্যেও হঠাৎ চওড়া নাক, ট্যারচা ধরনের চোখ, কতকটা হলদেটে রং-এর মানুষ দেখা দিত। কিন্তু এসবই তখন, যখন বন পালিয়ে যাচ্ছে, বাথান উঠে যাচ্ছে, বনের মোষ আর বনের মানুষ, বাথানের মোষ আর বাথানের মানুষ কমে যাচ্ছে।

মোল্লাতের এরকম মনে করার একটা কারণ আছে। বন যখন বনের মানুষকে বেআব্রু করে চলে গেল, ছোট শালবাড়ি আর বড় শালবাড়ি নামের সেই দিগন্তব্যাপী শাল বন কেটে বসানো গ্রাম দুটোর মধ্যে কয়েক শ একরের ছোট বনটি কয়েক শ মাত্র ছোট শাল গাছ অবশিষ্ট রেখে মিলিয়ে গেল, তখন জিন্নি একটা ভৈষী আর তার একটা এঁড়ে একটা বকনা বাছুর নিয়ে ছোট শালবাড়ি গ্রামের সীমায় উঠে যাওয়া বাথানটায় সূর্যের আলোর জালে ধরা পড়ে গিয়েছিল। বেআব্রু হওয়া কালো এক মেয়ে, তার এক ভৈষী, তার এক এঁড়ে বাছুর, এক বকনা।

মোল্লাতের মতে এই বাথান আর বনের নিকট সম্বন্ধের মধ্যেও ধনোৎপাদন পদ্ধতির খেলা আছে, স্নেহ ভালোবাসার কিছু নেই। বন ছাড়া কোথাও পাবে মোষের খাদ্য? গ্রামের মাঠ যদি তা ঘাস হওয়ার মত হয় তবে তা কারো ধানের মাঠ। অন্যদিকে গ্রামের থেকে অনেক দূরে চলে গেলেও বাথান রেখে লাভ থাকে না। কে কিনবে তোমার দুধ? ছানা নিয়ে না হয় দশ মাইল যাওয়া আসা করা চলে, মাখন নিয়ে না হয় সপ্তাহে একদিন কেউ বিশ মাইল দূরের শহরেই গেল। কিন্তু বনই যদি ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতে থাকে? ততদূরের বনে মোষ নিয়ে

ঘোরাই সারা। আর সে রকম মোষ রাখা আর বনের মোষকে তোমার নিজের বলা একই কথা।

কিন্তু এসব মোল্লাত ভাবত একসময়ে। এখনও ভাবে কি? কিংবা মনে পড়ে কি তার যে এসব সে ভাবত? অথবা সে না জানলেও, বুঝতে না পারলেও এসবই তার আবেগে স্মৃতিতে জড়িয়ে অবচেতন হয়ে আছে, সেই কালচে-সবুজ মেঘলা আলোর মাঠ যার উপরে তার বিচারবুদ্ধি সারা দিন ধরে খেলা করে। আব সে বিচারবুদ্ধি যেন সে রকম এক বালক যার ক্রমশ জুটে যাওয়া সঙ্গীদের কাউকে বা তার পিতামাতা ডেকে নিয়েছে, কেউ কেউ বা স্কুলে পড়তে গিয়েছে, যে ক্রমশ একা আর নিঃসঙ্গ হযে গেলেও সেই মাঠেই খেলা খুঁজে খুঁজে ঘুরছে।

সে যেন অতীতকে খানিকটা দেখতে পায় অতীতের একটা বিশেষ পর্যায় থেকে, কিন্তু অতীত পরম্পর সংলগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত আসে না। আর বর্তমানকে সে যেন দেখতেই পায় না। তার চোখের কোনো দোষ নেই, চোখের মণি দুটো একটু খয়রা জাতের হলেও বেশ স্বাভাবিক। উপরের পাতাটা বেশি ভারি, আর কোণের দিকে দিকে নীচের পাতার উপরে বেশি ঝুঁকেছে মনে হয় বটে, কিন্তু তাতে দেখতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বরং তার বসার বা চলার ভঙ্গি ত যেন সতর্কভাবে লক্ষ্য করছে সে এমনই। এমনকি অনেক সময়েই সে যেন ভয় পাচ্ছে, অন্তত বিস্মিত হচ্ছে, এমনভাবে তার ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকে। শুনতেও পায় সে। তার প্রমাণ তো এখনই দেখা যায়। সে বুঝতে পারছিল না সে কতদূব চলে এসেছে, কিংবা সকাল থেকে তখন বেলা কতদূর এগিয়েছে। তুরুককাটা শহর আর গ্রাম যেখানে মিশেছে, গ্রামের ছনের ছাদের বাড়িগুলোর মধ্যে একটা দুটো করে ইট আর টিনের বাড়ি দেখা দিচ্ছে, একটা বাড়ির সামনে একটা সাইকেল-রিকসাকে মেরামত করা হচ্ছে, চায়ের দোকানগুলো একশ মিটার পর পর দেখা দিচ্ছে। তার ক্ষুধা পেয়ে থাকবে, সে জন্য সে কিছুক্ষণ থেকেই চায়ের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়াচ্ছে। আর এটা সে বুঝেও বুঝছে না। সে মোটর বাইকটার শব্দ বেশ শুনতে পাচ্ছিল, আর তারপরে ঝকঝকে লাল রঙের সেটাকে দেখতেও পেল। বাইকে কৈচন্দ্র বর্মন। তার পিছনে, পিনিয়নে, লাল টকটকে শার্ট পরা একজন ভয়ঙ্কর চেহারার মানুষ। খুব লম্বা চওড়া অনেক পেশীযুক্ত কুস্তিগীর কিন্তু নয়। বরং হালকা চেহারা। সম্ভবত নেশায় শুকনো শরীর। বাঁ হাতের কয়েকটা আঙুল নেই, ডান গালে একটা ক্ষতচিহ্ন শুকিয়ে দড়ির মত উঁচু হয়ে আছে। এসবেও কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবটার সবটুকু নয়। সব ভয়ের ব্যাপারেই যেমন অলৌকিকতা থেকে যায়, তার ক্ষেত্রেও তেমন কিছু আছে। অলৌকিক বলেই বলা যায় না, সেটা

তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অথবা মুখের সেই কড়া ভঙ্গিতে। অলৌকিকের ইয়ত্তা হয় না। অনেক নাম তার। অবশ্যই তার সব নাম সকলে জানে এমন হয় না। সকলেই না হ'ক অনেকেই জানে তার সব কয়েকটা নামের সঙ্গে একটা দুটো করে খুনের ঘটনা জড়িত আছে। কিন্তু অবশ্যই এ জায়গাটা থেকে কয়েক শ মিটার দূরের থানার লোকেরা কোনো নামেই তাকে আজ পর্যন্ত খুঁজে পায় নি। সে এদেশের লোকও নয়। সে দক্ষিণবঙ্গের কোনো অঞ্চলের লোক হবে। নতুবা এমন স্মার্ট হয়? এখানকার ব্লক অফিসে সে নাকি পিওনের চাকরি করে। সে যে খুন খারাপির মত বাজে কাজে জড়াবে, তা হলে সে সেই অফিসের হাজিরা খাতায় রোজই উপস্থিত থাকে কি করে? এসবও তার সম্বন্ধে ধারণাকে অলৌকিকের পর্যায়ে নিয়ে যায়। যা অলৌকিক নয়, তা এই যে পকেটের ছোরাকে প্রস্তুত করা, আর তা বসিয়ে দেয়ার ব্যাপারে, সে সব সময়ে দু-তিনটা বাক্য আগে থাকে। প্রতিপক্ষ যখন ভাবছে এক্ষেত্রে ছোরা দরকার হবে কিংবা হবে না, এই মানুষটি ততক্ষণে ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। ব্লক অফিসের পিওন হিশাবে সে অবশ্য খোকনেন্দ্র দাস। মোম্নাতের একবার মনে হল পিনিয়নের উপরে বসা এই লোকটিকে সে চেনে যেন। কিন্তু এরকম মনে হওয়ারই বা কি অর্থ, তার পক্ষে, যে নিজেকেই চিনতে পারছে না। তাছাড়া দৃশ্যটা বদলেও গেল।

খোকনেন্দ্র দাস মোটর বাইকের পিনিয়ন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল। আরাম করে দাঁড়ানোর জন্য কোমরে দুই হাত দিল সে। তার চোখ রাস্তাটার সে অংশটায় যেখানে একটা বাঁক। এখন, ধনোৎপাদনের পদ্ধতি বদলে গেলে সমাজ, সংস্কৃতি আর সেই সঙ্গে ভাষাতেও পরিবর্তন আসে, নতুন শব্দ অথবা শব্দযোগ অহরহ সৃষ্টি হতে থাকে। যেমন 'সমাজভিত্তিক বনস্জন', যেমন 'ফাটা কাপড়', যেমন 'হংকং একসপ্রেস', অথবা 'হংকং মার্কেট'। কোনো কোনো সময়ে এসবের ইয়ত্তা অভিধানেও পাওয়া যায় না। যেমন 'ফাটা কাপড়' বলতে বিশেষ কোনো ধরনের কাপড় বোঝায় না। সীমান্তের ওপর থেকে পলিস্টার, অ্যাক্রিলিক ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি নতুন, কিন্তু ব্যবহার-মলিন এরকম দেখতে দলামোচড়া পাকানো, যে প্যান্ট, শার্ট, ফ্রক, কোট ইত্যাদি কাস্টমস্‌কে ফাঁকি দিয়ে সীমান্তর এপারে এনে বিক্রি করা হয়, তাকে 'ফাটা কাপড়' বলে। যে লোকাল ট্রেনটা কাছের জংশন থেকে ছেড়ে সীমান্ত পর্যন্ত দুবার যায় ও দুবার আসে, যাতে সারাদিনেও কোনো স্টেশনে একটা বা দুটোর বেশি টিকিট কাটা হয় না, অথচ যা বিনা টিকিটের যাত্রীর চাপে ফেটে পড়তে চায়, তাকে বলা হয় 'হংকং একসপ্রেস', যেহেতু সেই ট্রেনগুলোর যাত্রীরা সকলে সীমান্তের ফ্রি ট্রেড জোনে যাওয়া আসা করে। যেমন যেকোনো বড় শহরের যে কোনো বড় রাস্তার ধারে, হয়ত পুলিশ থানার একশ গজের

মধ্যে এইসব 'ফাটা কাপড়', চীনা টর্চ, ছাতা, হাত ব্যাগ, কলম, চীনা ও জাপানী পলিস্টার ইত্যাদি থান কাপড় বিক্রির যে বাজার তাকে 'হংকং মার্কেট' বলে। 'সমাজভিত্তিক বনসৃজন' বলতে রাস্তার ধারে কিংবা সরকারি অফিসের সামনে বিশেষ করে ইউক্যালিপটাস, কখনও বা কদম গাছ লাগানো বোঝাচ্ছে। রাস্তাটার সেই বাঁকটায় রাস্তাটার দুধারেই সমাজভিত্তিক ইউক্যালিপটাসের সারি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে 'ফাটা' কাপড়ের বোঝা ঘাড়ে দুইজন অল্পবয়সীকে আসতে দেখা গেল। লাটপাট করা সেই প্যান্ট, শার্ট, টিশার্ট, ফ্রকের সংখ্যা দুজনের কাঁধে এত বেশি যে তারা যেন নুয়ে হাঁটছে। খোকনেন্দ্র, পরে অনুমান হল, তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে যেন নিজের ঘরে পায়চারি করছে, অথবা সে যেন সার্কাসের একজন খেলোয়াড়, এরকম ভঙ্গিতে সে ফাটা কাপডওয়ালাদের দিকে এগিয়ে উদাম ভঙ্গিতে দাঁড়াল। প্রথম ফাটা কাপড়ওয়ালা তাকে পার হয়ে গজ পাঁচেক এগিয়েছে, দ্বিতীয় ফাটা কাপডওয়ালা তার মুখোমুখী প্রায়, সে দ্বিতীয় ফাটা কাপড়ওয়ালাকে চড় মারল। কাপড়ের বোঝা সমেত মাটিতে পড়ে, তাতে জড়িয়ে গিয়ে, বিস্ময় কাটাতে তার এক মিনিট সময় লেগে থাকতে পারে। যারা একটা লোকাল ট্রেনকে কবজা করে ফেলেছে, যারা সীমান্তের সীমান্তরক্ষী ও কাস্টমস সাহেবদের পরোয়া না করে, সীমান্ত টপকে মাল নিয়ে যাওয়া আসা করে, তারা নির্জীব, নির্বীর্য নয়। কাপড়ের বোঝা সমেত সে উঠে দাঁড়াল, তার চোখমুখ হিংস্র, দস্তুর হয়ে উঠল, কিন্তু সে সবিস্ময়ে দেখল ইতিমধ্যে খোকনেন্দ্রর হাতে ন ইঞ্চি, দোধার, স্প্রিং এর ছোরা শক্ত এবং উদ্যত। নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারল, খোকনেন্দ্র এমন পার্টির সঙ্গে যুক্ত, যারা হংকং একসপ্রেসে যে পার্টির রবরবা তার একেবারে বিপরীত, নতুবা 'ফাটা কাপড়' সঙ্গে থাকতেও অন্য কেউ এভাবে তাদের আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। তারা আর না এগিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল, হয়ত বা রেল স্টেশনে গিয়ে তাদের একসপ্রেসের অপেক্ষা করতে।

তাদের অনুমান মিথ্যা নয়। গতবারের অঞ্চলপ্রধানের নির্বাচনে খোকনেন্দ্র দাঁড়াতে পারে নি কারণ সে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার নয়। তারপরেই মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে জিতে সে ইতিমধ্যে এস ডি ও, এস ডি পি ও ইত্যাদির সমান মানের মর্যাদায়। এম এল এ হওয়াটা নানা কারণে কঠিন। একই কথা। সে প্রাইমারি পাশ নয়। কিন্তু এ অঞ্চলটায় এখন তাদের পার্টিরই প্রাধান্য, যার মূলে সে।

—খোকনেন্দ্র ফিরে এসে তাদের মোটর বাইকের কাছে দাঁড়াল।

প্রকৃতপক্ষে ফাটা কাপড়ওয়ালাদের হিশাবের ভুল। নতুন এই রাস্তাটা আর সমাজভিত্তিক ইউক্যালিপটাসের সারি দেখে তাদের আন্দাজ করা উচিত ছিল। তিন

বছর আগে তারা এ পথে শহরে যাওয়ার জন্য সটকাট করে থাকলেও, তখন সে পথটা ছিল একটা পচা হাজা পুরনো নদীর শাখার পাশ দিয়ে, তখন গ্রামটার নাম ছিল দলদলি। যখন আগের গ্রামেই শুনেছিল, গ্রামটা এখন 'নয়াবস্তী' নাম নিয়েছে, তখনই তাদের বোঝা উচিত ছিল।

দৃশ্যটা আবার বদলাল। একটা ট্রাক এগিয়ে এল ক্রমশ পথটা দিয়ে। মোটর বাইকটাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল সেটার গজ দশেক দূরে। ট্রাক থেকে দুজন নামল। একজন শার্ট আর ধুতি পরা। অন্যজন খোকনেন্দ্রর যমজ যেন। কিংবা এরকম বলা ঠিক হল না। সে বয়সে খোকনেন্দ্রর চাইতে কিছু ছোট হবে। আর এখনও কড়া নেশা ধরে নি বলে, তার টিশার্টের হাতার নীচে হাতের যতটুকু চোখে পড়ে তাতে বোঝা যায় তার স্বাস্থ্য এখনও ভাল।

কৈচন্দ্র বর্মন, সভাপতি, এতক্ষণ তার মোটর বাইকের উপরেই বসে ছিল। এবার সে নামল। ধুতি-শার্ট পরা সেই লোকটি কৈচন্দ্রর কাছে এগিয়ে এল। কাঁধের ঝোলা থেকে দশ হাজার টাকার চকচকে বড় নোটের একটা বাণ্ডিল দিল। টাকাটা কৈচন্দ্র পকেটে রাখল। দুজনে পাশাপাশি মোটর বাইকের কাছে এসে দাড়াল। তাদের গায়ের উপরে, মোটর বাইকের উজ্জল রঙে দিনের আলো ঝকঝক করছে। দু পাচ মিনিটের মধ্যে আট দশজন প্যাণ্ট আর শার্ট, কিংবা প্যাণ্ট আর টিশার্ট পরা কিশোর ও যুবক সেই নয়াবস্তীর এ বাড়ি সে বাড়ি, এ দোকান সে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তাদের কয়েক-জনের কাঁধে কুড়োল। দু তিনজন ধরাধরি করে একটা করাত আনল। তাদের কয়েকজন ফিরে গিয়ে দু তিন রকমের স্থলতার কয়েক কুণ্ডলী দড়িও নিয়ে এল। সে সব কিছু, আর সেই আট-দশজন ট্রাকে উঠল। তখন খোকনেন্দ্র মোটর বাইকের সঙ্গে লাগান ইনস্ট্রুমেণ্ট ব্যাগ থেকে একটা স্টেনগান, একটা করাতে কেটে ছোট করা হয়েছে এমন দুই নলের শটগান বার করে ট্রাকের সেই প্যাণ্ট ও টিশার্ট পরা অ্যাথলিটকে দিয়ে, পরে দুজনেই ট্রাকে উঠল। ট্রাকটা ছেড়ে দিল, তা বেশ জোরে আর ধুলো উড়িয়ে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ সব চাইতে কাছের বন, যেখানে লুকিয়ে কাঠ কাটা যায়, তা এখন প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। তার চাইতে কাছে এখনও দু এক টুকরো বন আছে বটে, তাতে কিন্তু লুকিয়ে কাটা যায় না; সরু সরু দূরে দাঁড়ানো কয়েকটা শাল, মাত্র সেখানে অবশিষ্ট।

ট্রাকটা চলে গেলেও সেই ধুতি-শার্ট পরা লোকটি যার নাম অমল তরুরাজ তার তখনও কিছু কাজ অবশিষ্ট ছিল। যারা ট্রাকে উঠল তাদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক (যা দিনে একশ টাকা করে) সেই কুড়োলওয়ালাদের ওয়ারিশদের দিতে হল, কৈচন্দ্র চিনিয়ে দিলে।

এই ব্যবস্থাগুলো সবই স্বাভাবিক আর যুক্তিযুক্ত। ট্রাকটা কৈচন্দ্রর। চল্লিশ কিলোমিটার যাওয়া আসার ভাড়া সাধারণত দশ হাজার হয় না। কিন্তু এ:ক্ষত্রে তা হয় এজন্য যে খোকনেন্দ্র এবং তার সঙ্গী অ্যাথলেটকে এসব ট্রিপে দু হাজার করে দিতে হয়, আর ড্রাইভারও এক হাজারের কমে যেতে চায় না। তা হলে কৈচন্দ্রর ট্রাক ভাড়া পাঁচ হাজার থাকলে তা কি এমন বেশি হল? এসব ট্রিপের যে কোনো একটিতেই ট্রাকটা বাজেয়াপ্ত হয়ে যেতে পারে। বনে যখন ঢুকছে তখন ট্রাকটার নাম্বার প্লেটও থাকবে না। এক লাখ টাকা দামের ট্রাকের রিস্ক নেই কি?

ট্রাকটা ঠিকঠাক ফিরতে পারলে ষাট সত্তর হাজার টাকার কাঠ হয় বটে, কিন্তু প্রতিবারেই তা হবে এমন কথা নেই। হয়ত ট্রাকটা বেকায়দায় খড়ির কাঠ নিয়ে ফিরল যার দাম বড়জোর দু-তিন হাজার হতে পারে। একবার ত ড্রাইভার খালি ট্রাক নিয়ে ফিরেছিল। তাতে আহত রক্তাক্ত খোকনেন্দ্র ছিল, আর ছিল খোকনেন্দ্রর সেবারের সঙ্গী, তার গুরুস্থানীয় সেই আর এক অ্যাথলেটের পাতায় ঢাকা উলঙ্গ মৃতদেহ। আর সব শেষ কথা, এসব ব্যাপারে হাত দেবার আগে বছরে ষাট সত্তর হাজার টাকা খরচ করে বনের কুপ ডাকতে হয় না? কুপে ঢোকার অনুমতি না থাকলে, বনে ঢোকা যায়? বনে ঢুকে, না হয়, যেখানে কুপ নিলাম হয় নি সে সব অঞ্চলেও পৌঁছানো যায়, কিন্তু বনে ঢুকতে বেরতে কুপের খরিদ্দার এই পরিচয়টা থাকা চাই।

কৈচন্দ্রর মনে এই একটা ব্যাপার কখনও কখনও খচ্‌খচ্‌ করে, যে অমল তরুরাজ কৈচন্দ্রর বিপরীত পার্টির লোক। যদিও অমল তরুরাজের একটা ব্যাপার এই আছে, সে সব পার্টির সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলে। আর যদি অন্য পার্টির কথা বল, কৈচন্দ্র নিজের সভালু দাদার কথা মনে করল, 'তাঁয়, সেই মৈচন্দ্র, ত এলাও গিরি, এলাও জোতদার, যদিও বিশ তিস বছর বাদে আর গ্রামপ্রধান না হওবার পারে।'

মনের মধ্যে এই খচ্‌খচ্‌ করাটা কোনো কাজের কথা নয়। ট্রাকটা রওনা হয়েছে এখন, অশুভ চিন্তা করা খুবই খারাপ। মনকে বরং খুশি রাখতে হয়। সে অমল তরুরাজকে বলল, 'আইসেন, চা খায়া নি।'

অদূরে পথের ধারের চায়ের দোকানটায় বসল তারা। চা দিতে বলল। সিগ্রেট ধরাল। এখানে শহরের কেউ কৈচন্দ্রকে অমল তরুরাজের মত মহাজনের সঙ্গে এক দেশলাই কাঠি থেকে সিগ্রেট ধরাতে দেখবে না। এই সময়েই কৈচন্দ্র সেই চায়ের দোকানটার সামনে পাগলাটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ্য করল। আর তখন সে অনুভব করল, 'এটা পাগলই হয়। দেখো মুখটা কেমন হাঁ হয়্যা আছে। দেখো হাড়ের জোড়-গুলা, হাত দুখান কাঁধ থাকি খুলি যাইবে।' আর এই সব পাগলের কোনো কোনো

সময়ে অলৌকিক শক্তি থাকে। অন্তত সাধারণের চাইতে বেশি যোগাযোগ থাকতে পারে অজ্ঞাত-চিন্তার জগতের সঙ্গে। ছেঁড়া খাকি প্যান্ট, আর ছেঁড়া খাকি শার্ট পরা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখে, এমনই যেন অবাক হয়ে দেখছে। কৈচন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, 'রে পাগলা, খাবু? চা খাবু, বিস্কোট?' সে দোকানদারকে বলল, 'ইয়াক ভাল্ করি খাওয়ান তো। চা দেন, বিস্কোট, মামলেট।'

যোগ্নাত্ত খাওয়ার কথায় চাওয়ালার ছাপরার মাটির বারান্দায় থেবড়ে বসে পড়ল। চাওয়ালা একটা প্লেটে দু-তিন স্লাইস কাঁচা রুটি আর এক গ্লাস চা এনে দিলে, সে, ক্ষুধার্ত যেমন খায়, তেমন করে খেতে শুরু করল। আর তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কৈচন্দ্রর মনে হল পাগলই বটে, কিন্তু দেখাচ্ছে যেন বনের পাহারাদার, পাগলই বটে কিন্তু দেখায় যেন ছয়পাই ফৌজ। সেবার বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে এমন কিছু এদিকে এসেছিল। না, কখনই না। তাই বলে এই পাগলটা পুলিশের গোয়েন্দা হতে পারে না। আচ্ছা, বসো, থানার দারোগাকে জিজ্ঞাসা করবে। কোন চিন্তার থেকে কোন চিন্তার খেই ধরে মানুষ তা বলা যায় না। মোটরবাইকে উঠেও কৈচন্দ্র পিনিয়ানে বসা অমলকে বলল, ওটা পাগলাই কিন্তু কেমন কেমন লাগে। অমল বলল, 'তোমার কি মনে হয় ওটা গোয়েন্দা।' 'ধুর' ধুর' এই বলে কৈচন্দ্র পথে মন দিল। কিন্তু তার থেকেই নিজের সঙ্গে তার সতানু দাদা মৈচন্দ্রের তুলনাটা মনে এসে গেল তার। সে মৈচন্দ্রের ছনের ছাদ, বারার বেড়ার, পাকা ভিতের ঘরগুলোকে দেখতে পেল যেন। ভিত পাকা, মাঝিয়া এলাও কাঁচা। বিশ ত্রিশ বছর অঞ্চলপ্রধান থেকেও এই ফল। আরও দু বছর অঞ্চলপ্রধান থেকে, খয়রাতি আর মাটিকাটার টাকা হাতে পেলে, হয়ত, মাঝিয়া পাকা হত। কিন্তু ওইটুকু করতে বয়স পঁয়ষট্টি হয়ে গেল। কখনও সভাপতি হওয়ার কথা কল্পনাতেও ছিল না। বিডিও তো সাহেব। সে দূরের কথা তার আফিসের কেরানিদের সামনেও উঠে দাঁড়াতে হত খাতির জানাতে। এই ত দেখা গেল বিশ বছর ধরে। গ্রামের মানুষ গ্রামেই পড়ে থাকতে হল। গ্রামের লোকরা মানত ঠিকই, হয়ত পাঁচ গ্রামের পঞ্চায়েত কথামত ভোট যোগাড় করত। এম এল এ ভোটের আগে ঘন ঘন দেখা করতে আসত। কিন্তু একশ বিঘা জমি ছিল, গিরি হয়ে রায়তদের মাঝখানে বাস করা হত। কিন্তু বিশ বছরে সেই এম এল এ-দের আইনেই একশ থেকে ক্রমে ত্রিশ হল জমি। আর প্রসেশনও বার করতে পারা যায় না। ভাবো, হাদলা বর্মনের কোতলের পরে কজন লোক আসে আর তুমি ডাকলে।

তারপর কৈচন্দ্র নিজের বাড়িটাকে দেখতে পেল। গ্রামে নয়, শহরেই বলতে হবে। পাঁচ ছ কাঠার উপরে আধুনিক দোতলা বাড়ি। দোতলাটা এখনও শেষ করে নি।

লোকের চোখ টাটানো অভ্যাস আছে। সভাপতি হিশাবে তিন বছরে তার বেশি করাও যায় না। আগামী দু বছরে শেষ হবে। তা ছাড়া তার মধ্যেই ট্রাকটাকে কিনতে হয়েছে। বলবে সভাপতির অ্যালাউন্সে হয় না? কে না-জানে, তা হয় না। আচ্ছা, আচ্ছা, বিডিও যে মাইনা পায়, তাতে তার ফ্রিজ আর টিভি হয়? মোপেড হয় অঞ্চল প্রধানদের? আচ্ছা, আচ্ছা মন্ত্রীরা কত টাকা বেতন পায়? গাড়ি আর তিনতলা বাড়ি হয় শহরের মাঝখানে? ছাড়ো ইগলা কথা। যা হয়, তা হয়। আরও দেখ। বিডিওকে দেখলে উঠে দাঁড়াই? উলটা। বিডিও অফি.সর কেরানি বাবুদের দেখলে? আরে তারা ত পার্টিরই লোক প্রায়।

'আচ্ছা আচ্ছা' কৈচন্দ্র সতালুদাদা মৈচন্দ্রর সঙ্গে মনে মনে কথা বলে ফেলল। 'আচ্ছা এলাও তোমরা জোতদার। ছিল। আচ্ছা, তো, দেখেন তোমরা কি করছেন। সেইবার নির্বাসক তো আবাস করি দিছেন দলদলির পারত। নাইন করি করি বাড়ি.করি দিছেন মন্ত্রী আসছে। শহর থাকি ভিখারি ধরি ধরি বসাছেন। এলা কাউ আছে সে বাড়িত? বর্ষায় বর্ষায় পচি পচি মাটিত মিশি গেইছে। আচ্ছা, আছে দুইঘরত দুই পরিবার। একটায় বুড়াবুড়ি। সকাল থাকি রাইত তক মরণ কবে আইসে ভাবে। আর একটাত এক বিধবা আর তার এক ছাওয়া। খায় কি? তো শোনেন পিন্সান করি দিছি। কাঁয়? মুই। তোমরা পারছেন? আর দেখেন তোমার নির্বাস-আবাস হইল নবাবস্তি। এটে এলা রংপুরিয়া সবাই। এই দুইশ ঘর বসি গেইছে। যাইবে না। ছমাসের অন্দর র‍্যাশন কার্ড করি দিছং। এলা তো ভোটার হয়্যা গেইছে। কন মোক ছাড়া কাকে বা ভোট দেয়? আর তোমার সেই নির্বাস-আবাস থাকি মানষিগুলা কোটে গেইল? কাঁয় দেয় তোমাক ভোট। আব এই নবাবস্তি বাকি তিনশ জন যাইবে প্রসেশন করি একেবার যদি ডাক দেং।'

কৈচন্দ্রর ঝকঝকে মোটরবাইক সেই নির্লজ্জ সূর্যের আলোতে ঝলকাতে ঝলকাতে সমাজভিত্তিক ইউক্যালিপটাস বনের আড়ালে চলে গেল। এই আলোয় এখানে কিছুই কিছুই ঢাকা নেই, কিছুই আক্রুতে কোমল নয়, মেঘলাদিনের আলোয় যেমন কোনো কিছুই অলৌকিক নয়। চায়ের দোকান, ট্রাক, মোটরবাইক, স্টেনগান, টাকার বাণ্ডিল, দড়ির কুণ্ডলী সবই সকলের চোখের মণিতে ছায়া ফেলেছে। মোল্লাতের বেলাতেও তা অন্যরকম হয় নি। কিন্তু এগুলো যুক্ত হয়ে, তাবপরে তার মস্তিষ্কে কোনো সাড় আনছে না। কাজেই ধান উৎপাদন পদ্ধতি কিংবা ধনউৎপাদন পদ্ধতির বিষয়ে তার কোনো কৌতূহলই হল না।

খাওয়া হলেই চায়ের দোকান থেকে উঠে সে হাঁটতে থাকবে, দেখবে ধানজমি, গ্রাম,

চায়ের দোকান, সাইকেল সারানোর দোকান, চায়ের দোকান পানের দোকান, বাড়িঘর, কাপড়ের দোকান, টিনের বাড়ি, কাঠের বাড়ি, চায়ের দোকান, সাইকেল-রিকসা, বাড়ি, রেডিওর দোকান, অফিস, ব্যস্তসমস্ত মানুষ, কাঠের বাড়ি, কংক্রিটের বাড়ি, রেশন শপ, অফিস, টিনের বাড়ি, সাইকেল সারাই। যতই সে চলুক একই দৃশ্য ঘুরে ঘুরে পথের দুপাশে চলতে থাকবে। যদি এসব থেকে তার মনে কৌতূহল জাগত কিই বা বুঝত সে? এই অফিসগুলোতে হাজার হাজার লোক বেতন পায়, ওই বাসগুলোতে হাজার হাজার যাত্রী কনডাক্টরকে টাকা দেয়, সাইকেল সারাইয়াওয়ালা টাকা পায়—এগুলোকে কি সে ধনোৎপাদন বলবে? কিংবা 'ফাটা কাপড' বিক্রি করার পয়সাকে ধন বলবে। অথবা যে টাকায় সভাপতির দোতলা বাড়ি উঠতে থাকে তাকে? প্রকৃতপক্ষে মুহূর্তের জন্য স্টেনগান, কুড়োল, দড়ির কুণ্ডলী দেখে কিছু যেন মোন্নাতের চোখের মণির চাইতে গভীরে, কানের চাইতেও পিছনে নড়াচড়া করে উঠছিল। সেখানে স্বপ্নের মত কিছু একটা তৈরি হতে যাচ্ছিল। যেন অথৈ জলের থৈথৈ ঢেউ, আর সেখানে তিমির মত মাছগুলোকে মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছে মানুষেরা। তারপরে সেই গল্পটা তার মনে এগোল না। সেখানে কেউ বলল না, তিমি শিকার যেমন ধনোৎপাদন, বনের বনস্পতিকে কাঠের গুড়ি করে ট্রাকে আনাও তেমন ধনোৎপাদন। বলল না, সেই থৈথৈ ঢেউয়ের সমুদ্র যেমন কারো নয়, অর্থাৎ সকলের, এই বনও তেমন কারো নয়, সকলেরই। সমুদ্রও অসীম। বনকেও তেমন অসীম মনে হয় না? আর, দুই-কেই কেউ তৈরি করে রেখেছে ধনোৎপাদনের জন্য!

আর তারপরে রোদে ঝলসানো সেই মাঠে সেই একা একজনের নিঃসঙ্গ হয়ে খেলা করে যাওয়া, যখন আর সকলকে তাদের বাবা-মা খেতে ডেকে নিয়েছে, কিংবা তারাই স্কুলে চলে গিয়েছে।

কিন্তু মোন্নাতের এই পাগলামির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, দু-একবার তার নিজের অতীতের একটা দুটো গল্প মনে পড়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয়, সে সব গল্প আর তার মনের থেকে ঝরে পড়বে না যেন, যেন সেগুলোর যোগফল একটা নতুন ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে যেতে পারে আবার।

এটাকে অন্যভাবেও দেখা যায়। খুব সহজেই বলা যেতে পারে তার স্মৃতি অচেতন হয়েছিল জাগরূক হচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলতে হবে এটা বিশেষ কিছু কথা নয়। মানুষমাত্রের স্মৃতিই অচেতন প্রায় থাকে, মানুষের প্রয়োজন মত তা জেগে জেগে ওঠে যখন যতটুকু যে দিকে দরকার। যদি স্মৃতির কথাই বলতে হয়, তবে এরকম বলতে হবে, যে তার স্মৃতি যেন অমাবস্যার আকাশের গুহায় আবদ্ধ জলাশয় হয়ে গিয়েছিল,

যেন কি এক দুর্ঘটনায় নীচে থেকে, যেমন অগ্নিগিরির উদগারে হতে পারে, সেই চোখের জলের মত উষ্ণ কিন্তু কালো জল উঠে এসে তার স্মৃতির স্থাপত্যগুলোকে, ভাস্কর্যগুলোকে ডুবিয়ে একটা একটানা তড়াগ হয়েছিল। আবার ছোট ছোট ঘটনায় সে জল কোথাও কোথাও সরে যাচ্ছে, শ্যামল শষ্প আবৃত বনভূমি বা কোনো ভাস্কর্যর কিছু অংশ বা কোনো স্থাপত্যের চূড়া চোখে পড়ছে। অন্য কথায়, কিছুই মনে পড়ছিল না, এখন মনে পড়ার মত কিছু বিষয় স্মৃতিতে এসেছে, সেগুলো আর সম্ভবত আগের মত একেবারেই হারিয়ে যাবে না।

মোম্লাতের এটা এক বৈশিষ্ট্যই, কারণ সকলের বেলাতেই এরকম নাও হতে পারে, যে তার এই স্মৃতির ভূমি জেগে ওঠার ব্যাপারটা, দেখা যাচ্ছে, কোনোরকমের উগ্র, তীব্র অথবা প্রচণ্ড হিংস্র অন্তত হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে সূচিত হয়। অথবা তার স্মৃতি-ভিত্তিক ব্যক্তিত্ব যেন এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ উগ্র, তীব্র, প্রচণ্ড ঘটনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেই ঘটনাটা দূরে সরে গেলেও সক্রিয় হয়ে ওঠার ব্যাপারটা স্মৃতিতে থেকে যায়, কাঁপতে থাকে, যতক্ষণ না আবার তেমন প্রচণ্ড কিছু না ঘটছে।

যেমন সেই ঘটনাটার কথা উল্লেখ করা যায়—যার ফলে তার স্মৃতিতে বন, গ্রাম, ধানজমি, রাঙা মেয়ে এসব যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় শৈশবের আবহাওয়া তৈরি করেছে। পথ ধরে চলতে চলতে যখন সেই বনটার কথা মনে পড়ে তার, তখন সে এরকম অনুভব করে সেখানেই সে জন্মেছে, তার আগে কিছু থাকা বিশ্বাস করা যায় না। তখন থেকেই যেন সে বুঝতে পেরেছিল সে মোম্লাত।

মোম্লাতের তখন চারদিন হয়ে গিয়েছে বনে। তার কি খুব জ্বর? তার কি এমন ব্যথা যে শরীরের ডানদিকটা অসাড় হয়ে গিয়েছে? তার কি ক্লান্তিকেও আর অনুভব করা যায় না এমন ক্লান্তি? ক্ষুধা? পিপাসা? কিছুই মনে হচ্ছিল না তার। সে অবসান চাইছিল। অবসান যাতে তার ক্লান্তি, ক্ষুধা, বুক পোড়ানো পিপাসা, ব্যথা, জ্বর সব একসঙ্গে চূড়ান্ত হয়ে মিলিয়ে যাবে। যে লাঠিটাকে, যা নিশ্চয় কোনো রাখালের গরু তাড়ানো লাঠি যা তেমন ভেঙে পড়া সেই কুটিরের কাছে ছিল, যা পেয়ে সে ভেবেছিল, তা হলে এযাত্রা বেঁচে গেলাম নিশ্চয়, সেটাকে অপ্রয়োজনের বলে ফেলে দিল। সামনে ওটা জল। যেন শেষবারের মনের জোরে জলটাকে সে এমন উৎলে দেবে, যে তা নিজেই তার ঠোঁটে এসে লাগবে, আর সেই স্নিগ্ধতাই অবসান। লাঠিটা ফেলে দিলেই অবসান হয়। সে নিচু হল, বসে পড়ল, শুয়ে পড়তে চেষ্টা করল। তার তখনকার মনের অবস্থার এটাও এক সূচক, যে লাঠিটা সে কোথায় পেয়েছে তা সে মনে করতে পারছিল না। একটা পা আর এই লাঠিটা—তারই সাহায্যে চারদিনে এই বনে চলেছে সে।

তার ডান উরুটা। তার ডান উরুটা। ভেঙেছে? গুলিতে ঝাঁজরা হয়েছে? আগুনে পুড়েছে? অবসানটা ওখান থেকে উঠে আসছে, যদি—হে বন, হে গোপনীয়তা, হে শাল, তাড়াতাড়ি কর। বনে ঢুকতে পেরে, সে যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রথম সন্ধ্যাতে হেসে উঠেছিল। দেখ, দেখ, তাকে কিনা কোনো মহকুমা শহরের জেলখানা কিংবা লাঠিধারী সান্ত্রীরা আটকে রাখবে! দেখ, দেখ, তাকে আটকে থাকলে কি না চলে! নিশ্চয়ই সে বনটা উরুর মরণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও পার হয়ে যাবে। উরুর জন্যই ত পার হতে হবে। এখন সময় কোথায় বসে থাকার! অবশ হয়ে আসছে, কিন্তু দেবি হলে ফুলে যাবে, জর হবে, তার আগে অ্যান্টিবায়োটিক চাই। সে জন্যই বন পার হয়ে অন্য শহর চাই। দ্বিতীয় দিনে তখন জর হয়েছে, রুমাল, আর কাপড়েব কোঁচা ছিড়ে বাঁধা উরু থেকে রক্ত পডা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু উরু ফুলে সে বাঁধনকে অসহ্য করে তুলেছে। ভেঙেছেও কিছু নিশ্চয়। পচে যাচ্ছে? সে নিজেকে বলেছিল, আচ্ছা, আচ্ছা, ভেবে দেখ, স্কটের কথা না হয়; সেই বরফ মরুর উপর দিয়ে। ফ্রস্টবাইটে হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, অসাড় ক্ষত শুধু, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে চলতে হাঁটুও অসাড়। মাংস খসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে আসবে। কুকুরের কিডনি আর লিভারই ত একমাত্র খাদ্য ছিল, আর তারই ফলে মুখের চামড়া খসে গিয়ে রক্তাক্ত মাংস শুধু সেখানে। আরে তোমার ত একটা পা আব দুখানা হাত সম্পূর্ণ সুস্থ। জ্বরে কি এসে যায়? ক্ষুধা? আর হাসিও না। তৃতীয় দিনে সে চলতে চলতে হাঁপাচ্ছিল। আর নিজেকে মাঝেমাঝে ধমকাচ্ছিল। কে তোমাকে জল খুঁজতে বলেছিল? পিপাসা? নদী কখনও সোজা চলে? বাঁকে বাঁকে তোমাকে ঘোরাচ্ছে না? আর কতটুকু জলই পেরেছ খেতে? এই পা নিয়ে নদীতে নামা যায়? ভেবে দেখ, শহরটা এখনও কত দূরে জান না। অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টি-টিটেনাস এসব দবকাব না? এসব নিয়েই তো ট্রেনে ওঠা দরকার। তবে তো কলকাতা। তবে চিকিৎসা। তবে জবাবদিহি। চতুর্থ দিনে সকাল থেকেই সে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছিল, মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলছিল। ঠোঁট শুকিয়ে কালো। জ্বরে মুখ লাল। গোটা ডান পাশটাই অবশ। দু-তিন পা চলে একবার দাঁড়াচ্ছে লাঠিতে ভর দিয়ে। বুক ধাই ধাই। অসম্ভব দেখছি এই বন পার হওয়া। কে বলেছিল, রাতে মাটিতে শুতে? আগের দু রাতের মত গাছে হেলান দিয়ে রাত কাটানো যেত না? গুলি খাওয়া বাঘ কখনও ঘুমায়?

নদীটা সেখান বনের পায়ে চলা পথটার খুব কাছে এসেছে। যেখানে সে দাঁড়িয়ে, তার কিছুদূরে গোটা তিনেক মোষ চরছে, তা সে দেখতে পেল না। অন্য পাশে নদীতে নামতে নামতে যেমন পশু বা মানুষ পায়ে পায়ে গড়ানে ঘাটের মত চেহারা দেয় নদীর পাড়কে, তেমন কিছু একটা আছে, তাও সে দেখতে পেল না। সে আশা করল এবার

সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত অবসান আসছে। লাঠিটা পড়ে গিয়েছিল, এবার সেও ঘাসে শুয়ে পড়ল। হাঁপাতে লাগল। তার চোখের উপরে পর্দা পড়ছে যেন, যেন তা কাচের মত চকচক করছে, আর তার ফলে সে খুবই কম দেখছে। তা সত্ত্বেও দেখতে পেল সে, কয়েক হাত সামনে খানিকটা যেন শাদা তুলো মাটির উপরে অল্প অল্প ওঠানামা করে নড়ছে। কোনো প্রাণীর চূড়ান্ত শেষ পরিণতি? সে অবস্থাতেও যেন সে উঠে বসার চেষ্টা করল। কেন ছোট প্রাণীর অবশিষ্ট পশমগুলোকে একটা কালো গুবরে পোকা তার গর্তে নিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সে আবার গা ছেড়ে শুয়ে পড়ল। এখানেই অবসান। এখানে গায়ে আলো পড়ছে। ঠাণ্ডা জলটাকে চোখে দেখা যাচ্ছে।

মানুষের অবসান হতে কষ্টকর দীর্ঘ সময় লেগে যায়। সে আচ্ছন্ন ঘোরে ধীরে ধীরে নামছে ঠিক তখনই সে দেখতে পেল। নদীর পাড়ের সেই গড়ানে মাটির পথে কি যেন নড়ছে। না, প্রাণী নয়। কালো। কিন্তু মানুষের বাচ্চা। আর তখনই সে দেখতে পেয়েছিল, যেন রায়ডাকের বর্ষায় খেপা জল পাথরের চাঁইএ ধাক্কা খেয়ে, পাক খেয়ে কোনো রসাতলে নেমে যাচ্ছে। সে দেখতে পেল, একবারে গপ্ করে টোপ গেলা মহাশোলটাকে কায়দা করতে পিছনে সরে গিয়ে, ছিপে টান দিতেই কে একজন সেই ফুটন্ত শাদা ফেনায় ভাঙা রায়ডাকে পড়ে গেল। কে যেন বলল 'বাচ্চা গেইল রে।' আর কি উপায় আছে? কেউ পারে বাচ্চাটার ছোট দুখানা হাত ধরতে, যা সেই জলের বিষে ছটফট করে নড়ছে। তীরের মানুষরা, পাথরে চাঁইয়ে চাঁইয়ে দাঁড়ানো মানুষরা, 'করো কি, করো কি' বলে পাগল হয়ে যাওয়া মানুষটাকে ধরতে গেল। কিন্তু সেই ফুটন্ত পাক খাওয়া ফেনা উগরানো রায়ডাকের হাঁ থেকে বাচ্চাকে ফিরাতে ঝপাং করে কেউ লাফিয়ে পড়ল।

আর তখনই কে যেন তাকে বলতে লাগল, মোম্নাত, মোম্নাতরে, মোদনাথ মোদনাথ, বাচ্চাটা গেইল রে।

মোম্নাতের রায়ডাকের এই ফোঁসানো, ফুটন্ত, ফেনিল জল দেখার স্বপ্নটার খুব সহজ ব্যাখ্যা হয়। জ্যোতি নিবে আসা চোখের সামনে নদীর জল, তা সে যতই মৃদুবাহিনী হোক, আর তার পাড়ে টলতে পড়ে যাওয়ার মত একটা শিশু, তার শরীরের মধ্যে যে কষ্ট, তা ত জলে ডুবে আকুপাকু করে দম হারিয়ে অসাড় হয়ে যাওয়ার মতই, আর সে নিজেই শৈশবে পাথরের পিছল চাঁই থেকে তেমন পড়ে গিয়েছিল রায়ডাকে, আর তার বাবা যে নাকি মোম্নাতের মার মৃত্যুর পর থেকে সতত উদাসীন, লম্বা দাওটা, যা জীবনের একমাত্র সম্বল, তা হাতে করে বনে চলে যাবে স্থির করেছিল, সেই লাফিয়ে পড়েছিল রায়ডাকের সেই ফাঁদে; মোম্নাতকে তুলে এনেছিল।

ওটার অবশ্য সহজ ব্যাখ্যা হয় না। তুলনা হয় বটে। শিকারীদের বইতে আছে, মানুষখেকো বাঘ বন্দুকে ঘায়েল হয়ে জমি নিয়েছে, রক্তের গন্ধে মাছি ভনভন করছে, আকাশ থেকে শকুনরা দেখতে পেয়ে পাক খেতে শুরু করেছে। শিকারী একটা শক্ত আড়ষ্ট মৃতদেহ দেখতেই পাচ্ছে যেন, ঠিক তখনই নাকি সেই মৃত মানুষখেকো শেষবারের মত লাফিয়ে পড়ে শিকারকে ঘায়েল করেছে।

তুলনায় অবশ্য এই এক অসুবিধা থাকে কিছুটা মিললেও অনেকটাই' মেলে না। শিকারী, না হয়, মানুষখেকোর শত্রু। মেলাতে গেলে বলতে হয় 'বাচ্চাটা'র, সেই শিশুটার মৃত্যুই কি মোন্নাতের শত্রু ছিল ? যদিও অবসান বলে যাকে সে কামনা করেছিল তাও মৃত্যুই। কেউ জানে না কি করে সেটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ কেউই দেখে নি। ডাক্তাররা বলে বটে, বহুদিন থেকে যে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী আকস্মিক বজ্রপাতে সেও হঠাৎ উঠে বসতে পারে। মোন্নাত মৃত্যুর আবেশে ছিল, তার দেখার কথাই ওঠে না। তিন্নি অন্তত ত্রিশগজ দূরে, আর এদিকে পিছন ফিরে, নদী থেকে শিঙাড়া পানফল তুলছিল, তার পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। সে একটা চাপা গর্জনের মত শব্দ, কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চিৎকার কান্নার। সে পিছন ফিরে দেখেছিল নদীর গড়ানে পাড়ে তার ছেলে গড়িয়ে নামছে, কে একজন তার উপরে লাফিয়ে পড়ল।

মানুষ কি বাঘ হয়, মানুষ কি অজগর হয় ? জলের মধ্যে থেকে, পানফলের দাম ঠেলে দৌড়ানো যায় না। সে লক্ষ্য করল তার শিশুটা ওই একটা বাঘ-মানুষের গ্রাসে বটে, কিন্তু আর জলে গড়িয়ে পড়ছে না। তিন্নি স্থির করল, সরাসরি সামনাসামনি আক্রমণ করে ওই পুরুষ রাক্ষসটাকে কাবু করা যাবে না। সে কয়েক হাত দূরে নদীর পাড়ের একটা গাছের আড়ালে তীরে উঠল, পিঠকোমর থেকে কাটারিটা হাতে নিয়ে, পিছন থেকে ছেলেধরা এই নতুনধরনের রাক্ষসকে আক্রমণ করা জন্য পা টিপে অগ্রসর হল।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম মনে হল তার। সে তিন চার হাতের মধ্যে এসে পড়লেও রাক্ষসটার সাড়াশব্দ নেই। ছেলেটা কাঁদছে, রাক্ষসের বাঁ কাঁধ আর বাঁ হাতের নীচে সে চাপা পড়েছে যেন। কিন্তু রাক্ষসটাই তার পাশে মাটিতে মুখ থুবড়ে, আর তার শরীর আর মাটির মধ্যে যেন রক্ত ছড়াতে আরম্ভ করেছে। তা হলে সে প্রথমে যা দেখেছিল সেটাই ঠিক। সে দেখেছিল শিশুটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর একটা মস্ত হাত শূন্য থেকে ঝুলে এগিয়ে আসছে তাকে ধরে ফেলতে।

তিন্নি ছেলেটাকে মানুষটার হাত আর কাঁধের ফাঁদ থেকে বার করল। আদর করল, পরনের ভিজে শাড়ি দিয়ে ধুলো মুছিয়ে দেখল, কাটে নি কোথাও। কিন্তু তার-

এবার অবাক লাগল, মানুষটা মরেই গেল নাকি। তার খটকা লাগল মানুষটাই তার 'বাচ্চা'কে বাঁচাতে গিয়ে মরল? সে তার শিশুকে মোষগুলোর কাছে, আগে যেখানে তাকে রেখে সে জলে নেমেছিল, পৌঁছে দিয়ে, সন্তর্পণে মানুষটার কাছে ফিরে এল। তিন্নি জানেই ত, সে স্ত্রীলোক, আর এটা অচেনা বেটাছাওয়া। সে নিজেকে কিছু দূরে রেখে হাত বাড়িয়ে মোন্নাতের মাথাটাকে সোজা করত গেল, পরখ করতে গেল শরীরটা ঠাণ্ডা আড়ষ্ট কি না।

সে চমকে উঠেছিল, উনানে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি তত গরম হয় না। 'বাপুরে, জর দেখং। জরত ভিরমি গেইছে'

মোন্নাতের স্মৃতিতে আছে: সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার শীত করে উঠছে যেন নদীতে ডুবে থেকে। সে জিভ নড়িয়ে ভিজে ঠোঁট থেকে জল তুলে নিতে চেষ্টা করছে। তাবপর সেই স্ত্রীলোকটি এক মাটির ঘড়ায় জল নিয়ে এসে ঘড়ার মুখে হাত চাপা দিয়ে তার সর্বাঙ্গে জলের ধারানি দিচ্ছে। তার চারদিকে জল কাদায় থৈথৈ। সে বোধ হয় বেআব্রু। শীতে গা কেঁপে উঠল। সে দৃষ্টি স্থির করে, সেই লম্বা কালো মেয়েটিকে দেখল। মোন্নাতের স্মৃতিতে আছে, বড় বড় চোখের সেই কালো মেয়ে, যার পরনে খুব খাটো হলুদ শাড়ি সে তার যে বুকের আধখানা দু-এক মিনিট থেকে মোন্নাতের চোখে পড়ছিল, সেটাকেই যেন মোন্নাতের ঠোঁটের উপরে ধরেছিল, আর উষ্ণ সুস্বাদের তরল-জীবন তার মুখ, গলা, বুক সারা শরীরে ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছিল।

এটা অবশ্যই ঠিক নয় যে সেই কালো তিন্নির শরীর থেকে তার শরীরে জীবনের ধারা আসছিল। পাশে রাখা বাঁশ-চোং থেকে আরও ছোট তেমন বাঁশ চোং-এ ঢেলে ঈষদুষ্ণ মোষের দুধ ঢালছিল তিন্নি তখন, মোন্নাতের কিছু ফাঁক করা ঠোঁটের ফাঁকে। খুবই সন্তর্পণে, খুবই ধীরে। গলাত লাগি না যায়।

মোন্নাত, অবশ্যই, মনে করতে পারে না, কতবার তিন্নি কত ঘড়া জলে তাকে আপাদমস্তক স্নান করিয়েছিল, কতক্ষণ সেজন্য সময় নিয়েছিল সে। সে লক্ষ্য করেছিল, তার পিঠের নীচে ভিজে ঘাম, গায়ে জামা নেই, গায়ে তত জলও নেই, প্রায় শুকনো, তার জর নেই, বরং শীত করছে, দুধটা খুব গরম হলে ভাল লাগত।

কিন্তু তারপর সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল মোন্নাত। অন্ধকার একটা ঘরে মানুষের সাড়ায় ঘুম ভাঙলে, সে দেখেছিল একটা বাঁশের মাচায় সে শুয়ে আছে, একটা ছেঁড়াখোঁড়া হলদে শাড়িতে তার গা কিছু কিছু ঢাকা। তার ধুতিজামা কিছু ধারে কাছে নেই। আর কুপি জেলে কাকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে তিন্নি সেই ঘরে ঢুকছে।

মোন্নাত এখন ধারণা করে তার পরিচয়কে একেবারে গোপন করে ফেলার জন্যই তার

ধুতি আর জামাকে সরিয়ে ফেলেছিল তিন্নি। সেই লোকটিকে কি বলেছিল তিন্নি, তা জানা যাবে না।

কত রকম জীবিকা হয় মানুষের! যে মানুষ বনে থাকে এখন তারও বিলাইতি চিকিৎসার ইচ্ছা হয়। বনের বাইরে মাইল দু এক দূরের গ্রামে এসে বসা এই কম্পাউণ্ডার হাটের দিনে দিনে গ্রামের মানুষদের, কখনও কখনও বনের মধ্যে দুচার মাইল ঢুকে গিয়েও চিকিৎসা করে। হয়ত সে হতচ্ছাড়া গরিব না হলে, তিন্নি শুনেছে ওষুধ চুরি করে চাকরি যাওয়াতেই সে এই গ্রামে, সে বনে আসত না দু-এক টাকার জন্য। বনে এলে তার আর একটা লাভ হয়, বিনা পয়সায় এক আধ হাঁড়া মদ গিলতে পায়। সে এরকম না হযে, যদি ডাক্তার হত, বোধ হয় সেই অন্ধকার ঘরে মাচার উপরে দেখা সেই রোগীকে চিকিৎসা করতে সাহস পেত না, যেমন সে করেছিল।

মোন্নাতের মনে আছে সেই হতচ্ছাড়া বাঁকা হয়ে যাওয়া বুড়োটা তিন্নিকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'তুই যে কলু তুই তীর বিঁধছিস আগ খ্যায়া। কিন্তুক কাঁউ গুলি মারছে রে। দারোগার কোমরত যে ছোট বন্দুক, তারই হইবে।'

তিন্নির বড় বড চোখের বাদামী মণি দুটো সেই কুপির আলোতে যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কম্পাউণ্ডারের আজকাল গ্রামের তীর বেঁধা, বল্লম বেঁধা, বোমার টুকরো, পাইপগানের গুলি বেঁধা মানুষকে চিকিৎসা করতে হয়। আর তখন সে প্রশ্নও করে না। প্রশ্নে লাভ নেই, পরে প্রাণ যেতে পারে। সে বলেছিল, 'বোধ হয়, ত গোডালি ভাঙছে, বাঁধি দে। আর ঘাৎ তোর বনোলা ওষুধ দিবি, দে। কিন্তু বড়ি খাওয়া লাইগবে, আর ইনজিকশন। তোর কথাত শহরৎ বাসে গেইছি আসছি, ওষুধ আনছি। তোর বিশ টাকা লাগি যাইবে।'

কম্পাউণ্ডার তখনই একটা ইনজেকশন দিয়েছিল। আর সেই রাত থেকে বড়ি খাওবা শুরু হযেছিল মোন্নাতের। বড়ি আর দুধ, বড়ি আর দুধ। গরমজলে ঘা ধোয়া আর ওষুধ লাগানোর যন্ত্রণা। কঞ্চি আর পাতা দিয়ে জড়ানো গোড়ালিকে সোজা রেখে দিনের পর দিন শুযে থাকা। সেই প্রথম সন্ধ্যায় কম্পাউণ্ডার তারপরে এমন হাড়িয়া চকোৎ খেয়েছিল যে তিন্নিকেই তাকে আর তার সাইকেলকে বন পার করে গ্রামের পথে রেখে আসতে হয়েছিল।

একবার নয়, আরও দুবার এসেছিল কম্পাউণ্ডার। কতদিনের জমানো সম্বল খরচ করে ফেলেছিল তিন্নি, কে জানে? আয় তো শুধু একটা মোষের দুধ, আর বনের চৈ, নদীর পানফল, কখনও একটা বন-কাছিম। আর সেই সব আয় করার পণ্যগুলো মোন্নাতের জন্যই তখন লেগে যাচ্ছে।

একদিন মোন্নাত উঠে বসতে পারল। দুই পায়ে ভর দিতে দাঁড়াতে পারল। আর তখন তার অবাক লাগছে। তিন্নি সারা দিনের অনেক সময়েই ঘরে থাকে না। সে তার ছেলেটাকে পিঠে বেঁধে নেয়, কাটারিটাকে তখন সে পেটকোমরে গুঁজে নেয়। কিন্তু সেই দীর্ঘ সময়ের জন্য চলে যাওয়া যেন মোন্নাতের সুবিধার জন্যই। হয়ত দুটো কুচলা মাছ, হয়ত একটা বন-কাছিম ধরে আনে সে, যা হয় পুড়িয়ে কিংবা চৈ দিয়ে সাঁতলে মোন্নাতকে ভাতের সঙ্গে খেতে দেবে। কতদিন ছিল মোন্নাত সে অন্ধকার ঘরের মাচায়, তা কিন্তু মোন্নাত বলতে পারবে না। আর ততদিন তত দীর্ঘদিন ধরে শুধু দুধ, কিংবা শুধু মাখন আর ভাতে চলে না, বোধহয় পুরুষের।

তখন বোধ হয় মোন্নাত হেঁটে বেড়ায় দু পায়ের উপরে। আর বর্ষাকাল এসেছে বনে। কখনও দিন থাকতে অন্ধকার হয়ে আসছে মেঘে। কখনও হালকা বৃষ্টি হয়ে আবার আলো ফুটছে—অন্যসময়ে সেই মেঘলা আলো যেন বনকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। বোধহয় তার আগেই মোন্নাত তিন্নির ঘর-গেরস্থালিকে আবিষ্কার করেছিল। এক বিঘা মত হবে কোদালে কোপানো জমিটা। যাতে জল ধরে রেখে রোয়া বুনতে দেখল সে একদিন তিন্নিকে। একদিন নদীর ধারে সে তিন্নির শোলকচুর ভুঁইটাকে দেখল। শটীর চাষটা সে নিজে করে না। বুনো শুয়োরের অত্যাচার কমেছে বলে, বনের সেই ফসল ভালই হবে। তিনটে মোষ তিন্নির। একটা দুধ দেয় আর দুটোই তার বাচ্চা। বকনা মোষটার শিং ইতিমধ্যে এক হাত করে। ছোট এঁড়েটার শিং ইঞ্চি তিন-চার করে বেরিয়েছে। বর্ষার ধুয়ে ধুয়ে মোষগুলোর শরীর ঝকঝকে, তিন্নির শরীর চকচকে। তার চুলগুলো যেন পাট, পাট, আর আরও ঘন কালো। অতটুকু জমি কিন্তু একদিনে সবটুকু জমিতে রোয়া লাগাতে পারে না তিন্নি। হয়ত সেটা দ্বিতীয় দিন। এক হাঁটু কাদা, শাড়িটাতেও কাদা জল, যতই গুটিয়ে পরুক তা। স্নানের অসুবিধা তিন্নির কোনোসময়েই নেই নদীটার জন্য। তা হলেও এখন আরও সুবিধা। নদীতে ত জল বেড়েছেই, বনের মধ্যে ঘুরতে ফিরতেও স্নান হয়ে যায়। এখন কালো কালো কদম গাছগুলোতেও হলুদ হলুদ সুগন্ধ ফুলের বর্তুল। কালো তিন্নি হলুদ ছাড়া পরে না।

এই সময়ে গায়ে ঘামের গন্ধ থাকে না। চলতে ফিরতে গায়ে গা লাগলে গরম লাগে না। বরং ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর শির শির করলে কাছাকাছি বসলে ওম, আরাম।

এই সময়ে বনে কষ্টও। সব কৃষকেরও কষ্ট। খাদ্যের অভাব। অসুখ বিসুখ বেড়ে যায়। জলের প্রাণী এখন ধরা পড়ে না। পাখপাখালি কোথায় লুকায় কে জানে। কিন্তু

ঘরে আটকে থাকতে হয়। সূতা সুতালির কাজ করতে হয়। গল্প করতে হয়। অসুখ না থাকলে, গানও।

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। দুপুরে আঁধার দরজার বাইরে। আর বনের বৃষ্টির শব্দে খুব কাছে বসে কথা না বললে শোনা যায় না। তিন্নি চুপ করে বসেছিল, মোল্লাত চুপ করে বসেছিল। দরজার বাইরে অন্ধকার। বৃষ্টির শব্দ, ব্যাঙের ডাক, ডাহুকের ডাক আলাদা আলাদা করে বোঝা যায় না। গন্ধটা মাটিতে বর্ষাজল পড়ার গন্ধ নয়। কাজেই কদমেরই হবে, যদি হয়। তিন্নি ভাবল, এতদিন মানুষটা মাচার একপাশে ভাঙা গোড়ালি আর উরুর ঘা নিয়ে পড়ে থাকত, এখন তা নয়। এখন বুঝতে হবে সেই একই মাচার একপাশে যদি সে আর তার বাচ্চা, অন্যপাশে কিন্তু পুরুষই। আর রাতে জোর বর্ষা নামলে ঘরের ভিতরেও শির শির ঠাণ্ডা হয়।

মোল্লাত জিজ্ঞাসা করল, 'তো, তোমার বাচ্চার বাপ কোটে বা, কাঁয? এতদিনেও না আইসে।'

তিন্নি গালে হাত দিয়ে দরজার বাইরে জলের ঝাপটায় গাছগুলোর পাতানড়া দেখতে লাগল।

তিন্নির শিশু কিছুক্ষণ আগেও দুধ খাচ্ছিল। এখন 'কাপড়াত্যাতা' জড়িয়ে মাচার উপরে ঘুমাচ্ছে। তিন্নি গলা উঁচু করে তাকে দেখে নিল। বলল, 'কাঁয় জানে।'

তিন্নি আর একটু ভাবল। সেই অস্পষ্ট আলোয়, তার মুখে সেটা ব্রীড়া কিনা বোঝা যেতে পারে না। কিন্তু সে চোখ নিচু করে বলল, 'বনর সাহেব হবার পায়, বনর রক্ষী হবার পায়। হইবে একজন।' সে ভাবল অমলতাসের হলুদ হলুদ থোকা থোকা ফুলের কথা, যা এলোখোপায় গুঁজে নেয়া যায়। সে অবশ্য বলতে পারে না, তার চোখের কোণের মত লাল, কিংবা তার ঠোঁটের জাম রং-এর মত শাড়ি পড়লে কেমন দেখায় তাকে। তার সোঁদাল হলুদটাই ভাল লাগে এখনও। কিন্তু তার ছেলেটা বড় হয়ে যাচ্ছে, দুধ ছেড়ে দেবে। আর তার ভৈবীটায় দুধ সেই পাঁচ ছসের থেকে কমতে কমতে এখন এক দেড়সের। এড়েঁটাও এক বছর ছাড়িয়ে গেল।

মোল্লাত জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বয়স কত হইবে বা?'

'এক কুড়ি তিনি চারি।' তিন্নি সলজ্জ হেসে বলল, 'তোমার বা কত হয়?'

'এক কুড়ি তিনিচারি।'

দুজনাই দুজনেই দিকে তাকিয়ে হাসল।

দু-তিনদিন পরে এরকম অনুমান হল বর্ষাটা দিন পনেরর জন্য গেল। আবার যদি নামেও তেমন একনাগাড়ে থাকবে না। যে রকম একদিন তিন্নি রান্না, খাওয়ার খুব

অভাব হয়েছে, বন ধুঁধুল আর ভাত, রসুন আর ভাত, কত খাওয়া যায়। চাল বা তেমন আসছে কোথা থেকে? এসব কারণে সে হাটে যাবে সকালে। ফিরতে দেরি হবে। সে ঠিকঠাক ফিরবে। মানষিটা যেন থাকি যায়। তিন্নি সেদিন ঘুঁটে পুড়িয়ে খুব সকালে ভাত রান্না করেছিল। তিতকুটে বন ধুঁধুল, রসুন কোয়া আর কলাগাছের ক্ষার দিয়ে পাশাপাশি বসে খেয়েছিল সে আর মোন্নাত। তারপরে সে হাটে গিয়েছিল। যাওয়ার সময়ে বলে গিয়েছিল, 'তো, মানষি, পানি না খান। এলা বনর পানি খারাপ। পিপাসা ধরে, চকোৎ খায়া নেন।' চোলাই মদের হাঁড়িটাকে সে দেখিয়ে দিয়েছিল মোন্নাতকে। তিন্নি বেরিয়ে যেতে যেতে ভেবেছিল, 'এটা কি আশ্চর্য, মানষি। কিছু বুঝির পায় না।'

ফিরতে প্রায় রাত করেছিল তিন্নি। ঘরের ভিতরে গাঢ় অন্ধকার হয়েছে তখন। অন্যান্যদিন ঘুঁটের উনানের আভা থাকে, কখনও কিছুক্ষণ কুপি জ্বলে। মোন্নাত সেজন্য দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর তা বরং ভাল হয়েছিল। বাতাস সেদিনও ভিজে, ব্যাঙ তখনও ডাকছে, কিন্তু মেঘলা মেঘলা জোছনা বনের মধ্যে হালকা হালকা হলুদ দাগের মত। তার মধ্যে দিয়ে অবশেষে মোষের গলার কাঠের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেয়েছিল মোন্নাত। তার উৎকণ্ঠার শেষ হল। আর তখন সে অবাক হতে লাগল, এমন হল কেন? ভৈষীটা থামল সেই দরজার কাছে, আর তিন্নি নামল ভৈষী থেকে। সেদিন অনেক হাট করেছিল তিন্নি। চাল, ডাল, সরষের তেল, নুন, লঙ্কা আলু, শুটকিমাছ। এসবই একটা শাড়ির এদিকে পুটুলি করে বাঁধা, আর মোষের পিঠে ছিল। কিন্তু তার ছেলে যেমন তার পিঠে বাঁধা থাকে, এক হাতে বুকের কাছে ধরা ছিল একটা কাগজের প্যাকেট। তাতে ছিল মোন্নাতের জন্য চকচকে পাজামা আর শার্ট।

'বাপুরে, তোমরা হাট শেষ করি ফেলছেন!'

তিন্নি তাড়াতাড়ি রান্না করতে বসল। ভাগ্যে তার ঘুঁটে জমা করা থাকে। ভাগ্যে তার নিজের তিনটে মোষ আছে। সে চাল, ডাল, আলু, লঙ্কা, নুন একসঙ্গে ফুটিয়ে অমৃত রান্না করে ফেলল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। ছেলেটাকে আগে খাইয়ে মাচার উপরে তুলে দিয়ে, সে আর মোন্নাত একটা থালাতেই সে গরম সুখাদ্য ঢেলে নিয়ে পাশাপাশি বসে খেতে শুরু করল। তখন মোন্নাত লক্ষ্য করল, এ শাড়িটাও হলুদ। এই বেটি হলুদ ছাড়া অন্য রং দেখে না। কি করে জানল, হলুদ তাকে এত মানায়? এই শাড়িটা নতুনও, তার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মোন্নাতের মনে হল, একরকম ফুলগাছ আছে বনে যাতে অজস্র হলুদ ফুল ফোটে।

খাওয়া হলে তিন্নি বলল, 'তোমরা নৌতুন পাজামা পিন্ধেন না? আচ্ছা তো কালি স্নান করি পিন্ধেন।'

চকোতের হাঁড়ায় চকোৎ বেশি ছিল না। তাও ত তৈরি করতে হয়। আর বর্ষার টানাটানির দিনে তারও ঘাটতি পড়ে। দুজনে একই চোঙে চকোৎ ঢেলে নিয়ে মাচায় বসল। এবার ঘুমাতে হয়।

তখনই ভুল করে বসলে মোন্নাত। সে চকোতের চোঙটা নিজের ঠোঁট থেকে সরিয়ে তিন্নির হাতে দিতে দিতে বলল, 'বাপুরে। তোমার এত্ত টাকা!'

তিন্নি বলল, 'খাও তোমরা আরও আরও, খায়্যা দেও।' চকোতেরই প্রভাবে যেন তার চোখ দুটো উজ্জ্বল, আর বিলোল। সে বলল, খিল খিল করে হাসতে হাসতে, 'আঁড়িয়া মোষটাকে আইজ দুইশ'ৎ বেচি দিছুং।'

'বেচি দিছেন? আঁড়িয়া। যেটার শিং উঠে কি নাই-উঠে!'

'হয় তো। বিবশার মত হাসল তিন্নি। তার নৌতুন হলুদ শাড়ির গন্ধটা যেন চকোতের গন্ধকে ছাড়িয়ে যাবে। সে বলল, 'দাম পায়্যা গেলাম। হিন্দুর পূজা হইবে না? তো আঁড়িয়া ভৈষ লাগে। কোটে পায় ভৈষ? ভৈষী থাকে, তোলাইয়া করা গাড়িটানা সেগুলা থাকে কিন্তুক ভৈষ কোটে আর? ভৈষই লাগে পূজায় কাটিবার। এলা বনৎ ভৈষ নাই বলি তো দাম।'

মোন্নাত স্তম্ভিত হয়ে গেল। গল্প করতে করতে চকোতের চোঙ ফিরিয়ে দিয়েছিল তিন্নি মোন্নাতকে। মোন্নাত চকোৎ মুখে তুলতে পারল না। কশাইরা মুচিরা গ্রামে এসে ভৈষের এঁড়েগুলোকে তোলাইয়া করে, তাই ত নিদারুণ কষ্টের। আর এ ত বলি। সে শুনেছে বটে হিন্দুদের পূজায় এমন বলির কথা। মোন্নাত যেন হাঁপাবে কষ্টে। সে মুখ তুলল। তিন্নিকে দেখতে গেল। সে দেখল, কুপির আলোয়, তিন্নির বড় বড় চোখের বড় বড় মণি দুটো ফেটে গেল বোধ হয়। তার গাল বেয়ে জল পড়ছে।

বোঝাই যাচ্ছে, (মোন্নাত কি তত নির্বোধ সে বুঝবে না?) এসবই তার জন্য। তাকে সুখী করতে। তাই বলে একটা প্রাণ? পূজার দেরি আছে। কিন্তু যে কিশোর আঁড়িয়া আড়কাঠির হাতে পড়েছে তার নিস্তার নেই। খড়্গ তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তার জন্য এত নির্দয়া হবে তিন্নি?

চোখের জলে মুখ ধুয়ে যাচ্ছে তখন, তিন্নি হাত বাড়িয়ে মোন্নাতের হাঁটুতে হাত রাখল। কিন্তু সেই রাতে মাচাটার ঠিক মাঝখানে সেই কালো এঁড়ে মোষটা তার, শিং বেরিয়েছে কি না-বেরিয়েছে, এরকম শরীরটা নিয়ে শক্ত হয়ে থেকে গেল।

খুব সহজ হিশাব। একজনের জন্য বর্ষার যে সঞ্চয় দুজনের ব্যবহারে তা বর্ষা শেষ

হওয়ার অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ধান উঠবে পূজার পরে, যদি ওঠে, কচু আর শটীও ঠিক তখনই বিক্রির মত হবে। আর শুধু একজনের সঞ্চয় দুজনে বসে খাওয়া নয়, চিকিৎসায় কতদিনের কত ঋতুর কত সঞ্চয় শেষ করছে, তা কে বলবে? তিম্নি নিশ্চয় মুখ খুলবে না।

সেদিন সকালে মোয়াত তিম্নিকে বলল, 'তোমার দাওখান দেন যদি, বনৎ যাং।'

তিম্নিও বুঝতে পারে নি, মোয়াতও না, সেই বনে যাওয়াটা চিরকালের মত হতে পারে।

মোয়াত কিছুক্ষণ চলার পরে যেন গল্প শুনতে পাচ্ছিল; 'দেখো তুই, বউ না থাকে তো রাভা দাও ধরি বনৎ-ই যায়, আর বা কোটে যাইবে?'

অন্য উদাহরণও আছে, সেই উগ্র, প্রচণ্ড, হিংস্র, হিংসাত্মক ঘটনার যা মোয়াতকে তার স্মৃতিতে ফিরতে সাহায্য করে।

দাও হাতে নিয়ে মোয়াত বন থেকে আরও গভীর বনের দিকে চলতে থাকলে অবশেষে সে পাহাড়ের কোলে চলে গিয়েছিল। তার সৌভাগ্য, প্রথম দিন শেষ হওয়ার আগেই সে বনের মধ্যে মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি পথ দেখতে পেয়েছিল। বনে সেরকম পথের একটাই অর্থ, নদীতে কেটে না দিলে, সে পথ কোনো মানুষের বস্তিতে নিয়ে যাবে। বর্ষা, শরৎ, শীত সে চলেছিল। বনের মধ্যে বনবাসীদের ছোট ছোট বসতি থাকে। যদিও তারা আর বনের মানুষ নয়, বরং বনবিভাগের দয়ায় পাওয়া ছোট ছোট জমিতে যারা মকাই ফলায়, নিজেদের হাতের তৈরি কাঠ, খড়, বাঁশের তৈরি বাড়িতে হলুদ আর শীর্ণ হয়ে হয়ে বাস করে। তাদের হয়ে, তাদের সঙ্গে, এমনকি বনসাহেবের দয়ায়, তাদের মত কাজ পাবে মোয়াত এরকম আয়োজন হয়েছিল। এরকম হয়ে উঠছিল, সে নিজের তৈরি ঘরটাকে বিছানায়, মশারিতে রান্নার বাসন কোসনে ক্রমশ বাসযোগ্য করে তুলবে। এমনকি পাহাড়ের প্রায় কাছাকাছি সেই বনে, বন-সাহেবের বাংলোর চারদিকে একটা ছোট শহুরে শহুরে গ্রাম, যার পাশ দিয়ে সরু একটা মরচে ধরা রেললাইন আছে, একটা দুটো চায়ের দোকান আছে, ট্রাক চলার মত রাস্তা আছে,—এসব সে আবিষ্কার করেছিল। সে রকম এক চায়ের দোকানে বসে থাকতে থাকতে সে একদিন একপাল পোষা মোষকে চলতে দেখেছিল গলায় কাঠের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। তাদের মধ্যে তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এমন এঁড়ে-বাচ্চাও ছিল। আর একদিন সে সেই শহুরে সাহেব বাংলোর গ্রাম ছাড়িয়ে আরও কিছুদূর গিয়েছিল পাহাড়ের দিকে। সেখানে ছেড়ে যাওয়া এক নদীর খাতে প্রচুর ঘাস, এক কোমর উঁচু হবে সে সব ঘাস। মোয়াত ভাবছিল তীর ধনুকে যদি একটা শশা মারা যায়। কিন্তু একজন কাঠকুড়ানো বনবাসী

তাকে সাবধান করেছিল, খবরদার। ওদিকে খালি বাইসন। মারি দিবে। মোন্নাত তবু এগিয়েছিল। আর প্রায় মোষের মত চেহারা কিন্তু মোষ নয় এমন ধুমোল প্রাণী-গুলোকে দেখতে পেয়েছিল। মর্দা, গাই, বাচ্চা। দেখ ফিন্ন মর্দা ত ঠিকেই।

তখন শীতকালও প্রায় শেষ হচ্ছে। চায়ের দোকানটার সামনের একটা অযত্নে বাড়া গাছে হঠাৎ হলুদ হলুদ ফুল দেখতে পেয়েছিল মোন্নাত। আর এমন এক ব্যাপার যে তার চোখের সামনেই ডালগুলো থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে ফুলের পরিমাণ বাড়তে লাগল। আরও বাঁদরলাঠির ফুল। কালো কালো বাঁদরলাঠিকে ঢেকে ঢেকে থোকা থোকা হলুদের ঝরনার মত। তারপর দিন, তারপরের দিনও, বনের মধ্যেও সোঁদাল দেখতে গেল সে।

তাছাড়া সে ত শুনেছিলই দক্ষিণে আর বন নেই। যে যার খুশি মত কেটে ফেলছে বন। আর তা শুনে মনে হচ্ছিল, কদিন থেকে, বন নাই থাকে মানুষ কোটে বা থাকে? সে ত কিছুদিন ধরে পয়সাও জমিয়েছে। একদিনও মদ চকোৎ খায় নি আর। হাতের সেই তার ধনুকের কথা ভাব। তার বনের প্রতিবেশী, কিস্নু সোরেন এটাকে তার কাছে বাঁধা দিয়ে বোতলের মদ খাচ্ছিল। লোহা পরানো চারটা পাখ্না বাঁধা তীর, আর ছোট ধনুকটা। বোতলের মদ খারাপ'। ধনুক বাঁধা দিতে কিস্নুর চোখে জল ছিল। চোঙে করে চকোত অন্য কথা।

একদিন সকালে মানুষ সমান উঁচু একটা সোঁদাল দেখতে পেয়ে সে মন ঠিক করে ফেলল। জমানো পয়সা আর দেশলাই পায়জামার ট্যাকে গুঁজে, কোমরে নৌতুন গামছাটা বাঁধল সে। তার মধ্যে লম্বা দাওটাকে গুঁজে, ধনুক আর তীর চারটাকে হাতে নিয়ে সে হন হন করে হাঁটতে আরম্ভ করল। একটা মুস্কিল ত আছেই। বন যদি কেটে ফেলে থাকে তবে কি বনের পুরনো পথ চেনা যাবে? এক ভরসা নদীটা। সে তখন নদীটাকে ডান হাতে রেখে উত্তরে চলেছিল, এখনও বাঁ হাঁতে কিছু পরে নদীটাকে পাচ্ছে সে। দ্বিতীয় দিনের বিকেলে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সেখানে সেই বুনো পথের দুধারে লতা ঝোপ ঝাড় থাকলেও বড়গাছ নেই। বড়গাছ কেটে নেয়ার পরে দু-এক বছর আগে লাগানো শালচারা। সে দেখতে পেল বুনো শুয়োরের একটা ছোট দল। দুটো মর্দা যাদের কশে যেন দাঁত দেখা দেবে এমন। গোটা তিনেক মাদী। বোধ হয় একবারেরই বাচ্চা সবগুলো। তখন ত বিকেলের তামাটে আলো। আর তার মধ্যে কালচে তামাটে সেই প্রাণীগুলো ঘাসের শিকড় খাচ্ছে। মোন্নাত হুরর্ হাই করে তেড়ে গেল। উচিত ছিল না তেমন ছেলেমানুষি করা। দলটা ছুটে পালাতে লাগল। সে আবার হুরর্ হাই করে এগোল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একটা থমকে

দাঁড়াল। কি হচ্ছে দেখতে গিয়ে সমস্ত শরীরটাকে ঘুরিয়ে মোন্নাতের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। মোন্নাত তীর-ধনুক সমেত হাত তুলে বলল, যাঃ ভাগ্। কিন্তু তার কথের দাঁত মুখের বাইরে দু-চার আঙুল দেখা যায় কি না যায়, শুয়োর দাঁতালটা তেড়ে এল। বিপদ গণল মোন্নাত। বিশ হাত দূরেও নয় আর। দুমুঠিতে ধরা যায় এমন একটা দুটো শালই মাত্র কাছে। মোন্নাত চট করে তেমন একটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। শুয়েরেটা তার দু হাতের মধ্যে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। বেশ কয়েক গজ গিয়ে শুয়োরটা বুঝতে পেরেছিল, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সে ফাঁকা জায়গাটায় থমকে দাঁড়াল। উত্তেজিত হয়ে প্রস্রাব করল। মোন্নাত গাছ কয়েকটার আড়াল ছাড়তে না পেরে দাঁড়িয়েই ছিল। শুয়োরটা আবার তেড়ে আসবে মনে হতেই মোন্নাত তীর ছাড়ল। শুয়োরটা ঘাড়ের উপরে বেঁধা তীর নিয়েই ছুটে এল। দ্বিতীয় তীরটা ঘাড়ের বাঁ দিকে বরং নীচে গলার দিকে বিঁধল। শুয়োরটা লক্ষ্য স্থির রাখতে না পেরে মোন্নাতের হাত পাঁচেকের মধ্যে দিয়ে তাকে পার হয়ে যাচ্ছে যখন, মোন্নাত তৃতীয় তীরটা তার পাঁজরায় বসিয়ে দিল।

এক সমস্যাই হল মোন্নাতের। হাত ত্রিশেক দূরে শুয়োরটা আধঘণ্টা ধরে নিথর পড়ে আছে। এদিকে দিন শেষ হয়ে যাবে। এটাকে ফেলে চলে যাবে? সে মুচকি মুচকি হেসে ফেলল। সে কাছে এগিয়ে পিছন দিক থেকে একটা একটা করে তীর খুলল। আরও দশ মিনিট দাঁড়াল, তারপর শুয়োরটার পিছনের একটা পা ধরে, সেটাকে টেনে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। সে তাড়াতাড়ি চলার চেষ্টা করল, শুয়োরটাকে যদি তিন্নির কাজে লাগতে হয়, তাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে। কিন্তু শুয়োরটা ভারি, বেশ ভারি। আধমণের বেশি হয়ে যাবে। তিন্নি কি শুকিয়ে রাখতে পারবে।

কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল।

প্রথম দিন সে ঝোলায় রাখা বাসি রুটি খেয়েছিল নুন দিয়ে আর নদীর জল। দ্বিতীয় দিনে তেমন দুখানা রুটি আর নদীর জল খেয়েছিল। ঝোলার মধ্যে এখন কিছু ভাজা ভুট্টা আর কয়েকটা আধপাকা টকো ভুটিয়া সন্তরা তেমনি টকো লালচে ভুটিয়া আপেল যা সে তিন্নির ছেলের জন্য সঙ্গে নিয়েছিল। আলো ফোটার কোনো সম্ভাবনা না দেখে বরং চড়া যায় এরকম গাছ দেখতে পেয়ে দ্বিতীয় রাতটা তাতেই কাটাল সে।

তৃতীয় দিনেও তখন তার ঘণ্টা পাঁচেক চলা হয়েছে। তার তখন ভয়ই করছে সে ভুল পথে এসে পড়েছে হয়ত। ভরসা, সে নদীটাকে আবার দেখতে পেয়েছে কিছুক্ষণ আগে। সে ভাবল শীতের রাত বলে শুয়োরটা পচে নি কিন্তু টেনেই বা কি হবে। বরং পথের ধারে রেখে এদিকে ওদিকে পায়ে চলা পথে ঘুরে দেখতে পারে তিন্নির ঘরটাকে

দেখা যায় কি না। বন যখন এভাবে কেটে ফেলেছে তখন তিন্নি নিশ্চয় সরে যাবে। দেখ না, যেখানেই দাঁড়াও, এখন ডাইনে বাঁয়ে, সামনে, কত দূর পর্যন্ত গাছের ফাঁকে ফাঁকে কতদূর দেখা যায়। আগে পায়ে চলার পথের দুপাশে সবুজ সবুজ কানাত থাকত বনের।

এরকম সময়েই সে মোষের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেল। তার ক্লান্ত রাতে না ঘুমানো মুখ স্বস্তিতে আনন্দে ভরে উঠল। সে ঠিক করল শুয়োরটাকে সেখানে রেখেই সে এগাবে, তিন্নিকে খুঁজে বার করবে। বরং পরে দুজনে মিলে শুয়োরটাকে আবিষ্কার করে হাসাহাসি করবে। সে নিজেকে বলল, 'ধ্যাৎত্যারিকা, সোঁদালের ডাল আনলু না কেনে? তিন্নির কালো খোঁপায় সোঁদালের ফুল। সে ভাবল নৌতুন গামছাটা মাথায় জড়িয়ে নেবে নাকি? 'ধ্যাৎতারিকা, মানষি কইবে কি।'

সে বেশ তাড়াতাড়ি এগতে থাকল। এই ত শটীবন। এইত পানিকচু শোলাকচুর খেত। হোই না তিন্নির ঘর।

কিন্তু সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভয়ে ঘেমে উঠল। যেখানে তিন্নির সেই ছোট্ট ধানখেত যার এপারেও খানিকটা জমি আগাছা কেটে তিন্নি সাফ করে রাখত। বর্ষার আগে ছেলেকে নিয়ে বসত তিন্নি সেখানেই। এক মুহূর্ত, দুই মুহূর্ত খুব বেশি হলে। আর মোন্নাতের হাত ত্রিশেক দূরে। তিন্নি, তিন্নিই তো! দুজন মানুষ। একজন পিছন থেকে তার কাটারি সমেত দুহাত চেপে ধরেছে, অন্যজন সামনে থেকে তার কোমরের শাড়ি খুলে ফেলেছে। এক মুহূর্ত, দুই মুহূর্ত। মোন্নাত নড়তে পারছে না। হে বন, হে আকাশ, হে নদী। সামনের লোকটি সেই উলঙ্গ শরীরের উরুর উপরে, আর পিছনের লোকটি সেই শরীরের বুকের উপরে। আ ছিঃ আ লজ্জা। এ কেউ দেখে? মোন্নাত কি ছুটে পালাবে? নদীতে ঝাঁপিয়ে ডুববে? ঘেন্নায় তার পেট থেকে রক্ত উঠে আসছে গলায়।

কিন্তু তখনই কেউ বলল, 'রে মোন্নাত, মোন্নাত রে। তুই দুহাতে এক মহাজনক, তুই দুই তীরে দুই জোতদারক—রে মোদনাথ।'

নিঃশব্দে মোন্নাত কাছের ঝোপের আড়ালে চলে গেল। তখন তার নিঃশ্বাস শাঁই শাঁই করছে। মুখটা হাঁ হয়ে বাঁ দিকে বেঁকে গিয়েছে। ফোঁপাচ্ছে সে, সেই বিকৃত হাঁ দিয়ে। হঠাৎ সে পাথর হয়ে গিয়ে ধনুকটা তুলল। এক। তীরটা উরুর উপরে বসা লোকটার পিঠে গিয়ে বিধল। কিন্তু তা তখন দেখার সময় ছিল না মোন্নাতের। দুই আরও এই তিন। তিনটে তীর পিঠে মেরুদণ্ড ঘেষে চার পাঁচ ইঞ্চি করে বসে গেলে মানুষের পক্ষে একবারের বেশি আর্তনাদ করা সম্ভব হয় না, বোধ হয়।

দৃশ্যটা অবশ্যই বদলে গিয়েছিল। উরুর উপরের সাফরিম্যুটও কাত হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লে, বুকের উপরের সাফরিম্যুটও নদীকে তুলবার জন্য উঠে পড়েছিল। আর সেই মুহূর্তেই মোচড় খেয়ে উঠে দাঁড়াল তিন্নি। তার কোমর থেকে খসে পড়া কাটারিটা সেই বুকের উপরে বসা· অর্ধ উলঙ্গ সাফরির মুখে পড়ল। সে হাত দিয়ে ঠেকাতে গেলে আঙুলে পড়ল কাটারিটা। ততক্ষণে মোন্নাত পৌঁছে গিয়েছিল।

আর তারপরে মোন্নাত শাড়িটা পরিয়ে দিয়েছিল তিন্নিকে। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর হয়ে বসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছিল। পরে দুজনেই নদীতে নেমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিল।

কিন্তু তার আগে বুদ্ধিটা খানিকটা তিন্নির, খানিকটা মোন্নাতের। মোন্নাত বলেছিল তুই তোর ছাওয়া আর ভৈষী ধরি বন থাকি ভাগি যা। নদীটা পার হয়্যা যা। শহরৎ থাকি যাইবি।' তিন্নি বলেছিল, তুই বা কি করিস? তোক না ওইটা দেখি ফেইলছে। নাই মরে ওইটা। তোর পাজামা শার্টের কথা যেহ্ বলি দেয়। তুই মরাটার জামা প্যান্ট পরি নীবু?'

'রক্ত তো।' কিন্তু ততক্ষণে মোন্নাতের এক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হিংস্র অস্তিত্ব তার স্মৃতিকে মন্থন করে জেগে উঠেছে।

তিন্নি আধঘণ্টার মধ্যে ছেলেকে পিঠে বেঁধে ভৈষীটার পিঠে বসে নদীর ধারে ধারে নদী পার হওয়ার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে ছুটতে থাকলে বকনা মোষটা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল। মোন্নাত মৃতদেহটা থেকে সাফারিস্যুট খুলে পরে নিল। পিঠের উপরে মরা আড়ষ্ট শুয়োর-টাকে নিয়ে প্রথম সুযোগেই নদী পার হয়ে ওপারের বনে গিয়ে উঠল। তখন তাকে দূর থেকে দামি স্যুট পরা বনবিভাগের রক্ষী বলেই মনে হচ্ছিল।

কৈচন্দ্র মোটরবাইক নিয়ে শহরে এসে পড়েছিল। অমল তরুরাজ শহরের সীমার বাইরে নেমে সাইকেল রিকসা ধরল। কৈচন্দ্র তার বাইকের গতি বাড়িয়ে দিল। আর তখনই তার মনে চিন্তা দেখা দিল। গত বছর থানায় তার ট্রাকটা হারিয়ে গেছে বলে যে ডায়েরি করেছিল, সেটাকে কি আবার তাগাদা দিয়ে রাখবে আজ? একটা মৃদু অনুযোগ —তোমরা কিছুই কর না, দারোগা সাহেব। কৌশলটা সে ভালই করছে। প্রথমবার ট্রাকটা বনে গেলেই সে বুদ্ধিটা করে ফেলেছিল। তার ট্রাক চুরি করে কেউ যদি বনে নিয়ে গিয়ে ধরা পড়ে, তার কি দোষ। দেখ মুহুরির বুদ্ধি উকিলের বুদ্ধির চাইতে কিছু কম নয়। তারপর এক বছর ধরে ট্রাকটা যাওয়া আসা করছে শহরের উপর দিয়ে, থানার সামনে দিয়েই বলতে পার। পুলিশ কি ট্রাক থামিয়ে দেখে নাকি কোনটা কোন ট্রাক। আর তা দেখলেই বা কি হত? হেসে বললেই হত, 'ধরো কেনে সিগ্রেট, তোমাক

কওয়া হয়, নাই, ট্রাকটার ড্রাইভার মদ খায়া মোওয়ামারিত পড়ি ছিলো।' এরকম ঘটনা ঘটে নি। কাজেই তার ট্রাকটা এখনও হারানো ট্রাকই হয়ে আছে।

কৈচন্দ্র স্থির করল—আজ এমন বিশেষ কিছু ঘটে নি যার জন্ত দারোগাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে, তার ট্রাকটা হারানো-ট্রাক। সে বরং পার্টি অফিসে যেতে পারে। সেখানে কেউ-না-কেউ থাকবে। আর পার্টি অফিসে একটা ওয়ালক্লক থাকলেও কোনো সময়েই সেটা ঠিক চলে না। আধঘণ্টা এদিক ওদিক থাকেই। মনে করো তার হাতঘড়িতে এখন সাড়ে দশটা আর পার্টি অফিসের ঘড়িতে এখন যদি দশটা হয়, কি দশটা বাজতে দশ মিনিট, তা হলে সে যদি তার হাতঘড়িটাকে পার্টির ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়? তা হলে নয়াবস্তিতে তার যাওয়া, অমল তরুরাজের যাওয়া, ট্রাকটাকে নিয়ে খোকনের বনে যাওয়া কিছুটা ঘটে না, কারণ সেই আধঘণ্টাটা হারিয়ে যায় যার মধ্যে সেসব ঘটেছে।

কৈচন্দ্র নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। আর শহর কমিটির অফিস ঢুকে আর একবার তার প্রমাণ পেল। সে অফিসের ওয়ালক্লকে তখন সাড়ে নটা। সে শহর কমিটির সেক্রেটারির দৃষ্টি আকর্ষণ করল ঘড়িটার দিকে। ঠাট্টা করল। একজন তাকে সময় জিজ্ঞাসা করলে বলল তার ঘড়িটা আধঘণ্টা ফাস্ট। সে হিশাবে এখন দশটা হবে ঠিকঠাক। সময়ের ব্যাপারটা মিটে গেলে সে খবর জিজ্ঞাসা করল। শহর কমিটির অফিসে শুধু অচল ঘড়ি থাকে না, ইস্তেহার ছিল, পার্টির সংবাদপত্র ছিল। শহর কমিটির সেক্রেটারি বল, 'আর কি ইলেকশান এসে গেলো। আগে বড় ইলেকশান। তার ছ-মাস ন-মাসের মধ্যে ব্লকের ইলেকশন।' কৈচন্দ্র অবাক হয়ে গেল। তার মুখে চিন্তার চিহ্ন পড়ল। আর এক বছর দেরি নেই। এমন ঝপ্ করে ইলেকশন এসে পড়বে, ভাবা যায় না। তাকে ত অনেক কিছু ভাবতে হবে। আর কিছু না হক বাড়িটাকে।

সে ব্লক অফিসে যাওয়ার নাম করে উঠে পড়ল। কিন্তু আদৌ এটা ব্লক অফিসে যাওয়ার সময় নয়, ইলেকশন যদি অত কাছে এসে থাকে। খানিকটা সৎ লোক না হলে, অন্তত সে রকম স্থনাম না থাকলে ভোটে অস্থবিধা আছে। কিছু মানুষ কোনো পার্টিরই না। তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থাও করতে হবে।

মনের এরকম অবস্থায় তার নিজের গ্রাম আর মৈচন্দ্রর কথা মনে পড়ে যায়। এখনও তা হল। সে শহরের মাঝামাঝি গিয়ে নতুন পিচ পড়েছে, এমন ডান দিকের রাস্তাটার বাঁক নিল। রাস্তাটা আগেও ছিল। ইট আর সুরকির ছিল তখন। আর গাছপালার আড়ালে, শহরে সীমান্ত ঘেঁষে, অন্তত মিউনিসিপ্যালিটির শেষ লাইট পোস্টটার দশ-বিশগজ দূর থেকে ছোট শহরের ছোট বেশ্যাপল্লীটা ছিল। এখন পিচ হয়েছে রাস্তার।

নতুন লাইটপোস্ট আর বসে নি। কিন্তু রাস্তায় পিচ পড়ার খবর পেয়ে বেশ্যাপল্লির এপারে ওপারে নতুন নতুন ছোট ছোট পাকা বাড়ি উঠছে। দু-এক বছরে সবটাই মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ঢুকে যাবে।

কি একটা ব্যাপার, ইচ্ছা না থাকলেও ওই ছোট টিনের ছাদের ইটের বাড়িগুলোর দিকে মানুষের চোখ পড়েই। কৈচন্দ্র ঠিক করল সে পথের ধারের গাছগুলোর দিকে দেখবে। এই রাস্তাটা বাড়িয়ে তার গ্রামের দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার অনেকটাই হাত আছে। অনেক টাকার খরচ। রাস্তাটাকে জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়ার সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিল, সভাধিপতি এসেছিল, ইঞ্জিনিয়ার এসেছিল, সমাজভিত্তিক বনসৃজনের মানুষেরা এসেছিল। পথের দুধারে গাছ লাগান হয়েছিল। তখনই, অবশ্যই, সে সব গাছে ফুল ফোটে না। কল্পনাতে সেসব গাছকে মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠে ফুলে ঢেকে যেতে দেখতে হয়। মৈচন্দ্রও ছিল সে সময়ে সেখানে। কি আশ্চর্য! ফুল ধৈরছে ও। কৈচন্দ্র অবাক হল। লাল, হলুদ, কৃষ্ণচূড়া,—নানা ইগুলা কৃষ্ণাচুড়া নয়, কাশিয়া। কেনে? ক্যাসিয়া। শহরে এমন আছে। কিন্তুক ফুল ধরে নাই। এখানকার মাটি ভাল। হৌলুদটা দেখ। বান্দরলাঠি হইবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ফুলগাছগুলোকে এড়িয়ে কৈচন্দ্রর চোখ বেশ্যাপল্লীর বাড়ি কয়েকটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। বাপুরে, ইমরা আবার ভৈষও রাখে। সে পল্লীটার শেষ সীমায় একটা মোষ বাঁধা আছে দেখল। সে মনে মনে বলল, ব্রুরুরুম্। তার বাইক এইসব দৃশ্য এড়িয়ে ব্রুরুম্ শব্দ করে দ্রুততার গতিতে চলে গেল।

তো, মৈচন্দ্র তার সতালু দাদা, হয় কি না হয়? সে ঠিক করল, গ্রামের বাড়ি, যা মৈচন্দ্র এবং তারও বাড়ি বটে, সেখানে গেলে স্নান খাওয়া দাওয়া হতে পারবে, আলাপ আলোচনাও হতে পারবে।

এটা একটা কৌতুকের ব্যাপার, রহস্যের ব্যাপার। সে তার সতালুদাদাকে ভালবাসে, কিন্তুক—। বাপের মত স্নেহ কিংবা তার চাইতেও বেশি স্নেহে মৈচন্দ্র তাকে মানুষ করেছে। সেইটাই—। তার নিজের যদি চল্লিশ হয়, মৈচন্দ্রর পঁয়ষট্টি হবে। সেইটাই—।

কৈচন্দ্রর মনের মধ্যে কেউ বলল, সেই পাপে তোমার নিজের একটাও ছেলেমেয়ে নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলে নিল। পাপ কি করে বলবে, কি প্রমাণ? হতে পারে, সে তার পিতার মৃত্যুর পরে জন্মেছে; হতে পারে, তার যতদূর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যে ঘরে সে আর তার মা ঘুমত, সেই ঘরেই তার সতালুদাদাকে সে ঘুমাতে দেখেছে অনেক সকালে ঘুম ভাঙার পরে। তার মাও এখন পঁয়ষট্টি বছরের

বুড়ি। সে নিশ্চয় তার সতালুদাদা মৈচন্দ্রকে ঘৃণা করে। 'না, না ঘৃণা কেনে?' সেই ঘরই ত বাড়ির সব চাইতে মজবুত ঘর, আর কাঠের সিন্দুক চৌকিটাও সেই ঘরে। তো, ঘরের অধিকার কাঁউ ছাড়ে নাই।'

ভ্রুরুরুম্। কৈচন্দ্র তার বাইকের গতি বাড়াল।

সেই চৌকি সিন্দুক নিশ্চয় সেই ঘরের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল। কোনভাবেই কোনো দরজা দিয়ে বের করা যায় না। এমন সিন্দুক সে আর কোথাও দেখে নাই। আসলে মানুষ আর সমাজ এক নয়। সমাজের হিশাবে তো উমরায় জোতদার পার্টি, ওই মৈচন্দ্র।

কৈচন্দ্র মনে মনে হাসল। এবার ইলেকশনের কথা উঠলেই, উঠবেই তো, সেজন্যই সে যাচ্ছে, এবার ঘায়েল করে দেবে।

পাকা উঁচু পিচের সড়ক থেকে ডানদিকে প্রায় তেমনই উঁচু কিন্তু কিছু কম চওড়া মাটির রাস্তা চার পাঁচশ গজ চলে গিয়েছে। তার শেষে সুপারি গাছের সারির মধ্যে দিয়ে কয়েকটা টিনের, কয়েকটা খড়ের চৌরী ঘর দেখা যাচ্ছে। প্রায় একটা পাড়ার মত। ওটাই মৈচন্দ্র আর তার ভাই, ছেলে, ভাইপো ইত্যাদির বাড়ি কিংবা পাড়া। এই কাঁচ পথটা যে মৈচন্দ্রর সুবিধার জন্যই অঞ্চলপ্রধান মৈচন্দ্র করিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মৈচন্দ্রর নিজের অংশের ঘরগুলোর সামনে গিয়েই থেমেছে সেটা। আর মৈচন্দ্রর নিজের অংশের একেবারে সামনের ঘরটা, যেটা বড় ধরনের টিনের চৌরী, যার ভিত পাকা, মেঝে মাটির হলেও, তার বারান্দায় দূর থেকেই কয়েকজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে।

ভ্রুরুরুম্ ভ্রুরুরুম্—কৈচন্দ্রর লাল হোণ্ডায় যত শব্দ তার মুখের শব্দ তার চাইতে 'জোহের' হয়ে থাকবে। বারান্দায় দাঁড়ান একজন পুরুষ বলল, 'বাপুরে, কাকার হোণ্ডার চ্যায়া কাকারই বেশি পাওয়ার দেখং।'

কৈচন্দ্র হাসিমুখে তার বাইক থেকে নামতে নামতে বলল, 'তোমরা সগায় আছেন দেখং। ভাল হইছে। ইলেকশন না আসি গেইল।'

বারান্দায় মৈচন্দ্র ছিল, তার সহোদর ভাইদের একজন ছিল, মৈচন্দ্রর প্রাপ্তবয়স্ক দুই ছেলে ছিল, মোটরবাইকের শব্দে মৈচন্দ্রর কনিষ্ঠ ছেলে অন্দর থেকে বেরিয়ে এল। তাদের দু-একজনের পরনে শুধু উঁচু করে পরা ধুতি, খালি গা। মৈচন্দ্রর নিজের পরনে ধুতি আর আধময়লা হাফ হাতা পাঞ্জাবি। মৈচন্দ্রর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে সম্ভবত বড়টির খালি গা। সে সম্ভবত বারান্দায় আসার আগে ধান নিয়ে কিছু করছিল। তার চুলে দু-একটা খড়ের কুচি আছে। মৈচন্দ্রর দ্বিতীয় ছেলেটির পরনে পায়জামা আর শার্ট। সে কোথাও যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল। তার সাইকেলটা ঘরের ভিতে ঠেস দিয়ে রাখা। মৈচন্দ্রর বড় ছেলের বয়স যদি পয়ত্রিশ-ছত্রিশ হয়, এটির বয়স ত্রিশ হবে।

মৈচন্দ্রর তৃতীয় বা কনিষ্ঠ ছেলে যার নাম কৃষ্ণচন্দ্র, যে বাইকের শব্দে বেরিয়ে এল, তার বয়স কুড়ি একুশ হবে। তার পরনে প্যাণ্ট আর শার্ট। বয়সের আর পোশাকের পার্থক্য সত্ত্বেও তারা এক গোষ্ঠীর, একই বংশের তা বোঝা যায়। হলদেটে ফর্সা লম্বা ধরনের গড়ন। মৈচন্দ্র আর তার সহোদর ভাই-এর বেশ বয়স হয়েছে, তা তাদের এক মাথা করে পাকা চুলে আর মুখের কোঁচকানো চামড়ায় বোঝা যায়।

কৈচন্দ্র বারান্দায় উঠে বারান্দায় রাখা বেঞ্চিগুলোর একটায় বসে বলল, 'নে বাড়িত কয়া দে। চা উ খোয়া। গরম ধরি গেইছে।'

মৈচন্দ্রর সহোদর ভাই বলল, 'গরম ধরছে, তো চা ক্যানে। বাতাসা পানি খা।'

মৈচন্দ্রর বড ছেলে, সে কৈচন্দ্রর সমবয়সী, বলল, 'সে গরম নো হয়। ইলেকশনের গরম। হয় না?'

কৈচন্দ্র হেসে বলল, 'সে তো একশাল দূরে। এলাই গরম ধৈরছে তোর।'

মৈচন্দ্রর ছোটছেলে অন্দরে চায়ের খবর দিয়ে ফিরল। মৈচন্দ্র বলল, 'ভাত খাবু তো?'

'মাছ আছে?'

মৈচন্দ্রর ছোটছেলে কৈচন্দ্রর দুপুরের খাওয়ার কথাও বলতে হাসতে হাসতে অন্দরে গেল।

কৈচন্দ্রর বক্তৃতা দেয়ার দু-চারটে বৈশিষ্ট্য আছে। তার প্রথমটি ডান হাতের তর্জনীর ব্যবহার। সেই তর্জনী কখনও মাছ ধরার কোঁচের মত পয়েন্টকে বিঁধতে নীচের দিকে ঝপ্ করে নামে, কখনও বাঁয়ের থেকে ডাইনে তরোয়ালের মত চলে, কখনও যুক্তির শেষ কথা বোঝাতে তার তর্জনী বুড়ো আঙুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খুব জোরে তুড়ি বাজায়।

'তো', কৈচন্দ্র বলল, 'ক এলায় কাক ভোট দেয়া ঠিক করছিস?'

মৈচন্দ্র বলল, 'এই শাল অমল তরুরাজকে দিলে কেমন হয়?'

কৈচন্দ্র ঝপাং করে তার তর্জনীকে নীচে নামাল। হো হো করে হাসল, 'দেখছিস? একশাল বাদে ভোট। এলাই ঠিক করি ফেলছিস চোরটাক ভোট দিবু। মোরে বুঝি দোষ?'

'চোর? কি চোর করছে তরুরাজ?'

অমল তরুরাজের কাঠ চুরির কথা মুখে এসে গিয়েছিল কৈচন্দ্রর। শেষ মুহূর্তে গপ্ করে সে কথাটা গিলে নিয়ে বলতে পারল। 'হুম্।' তার মনের মধ্যে থেকে হারানো ট্রাক, খোকন, তার সঙ্গীরা, সেই গুলিগোলার ব্যবস্থা ইত্যাদি সরাতে একটু দেরি হল। কাঠ না হয় কাটা যায়, কিন্তু এই গুলিগোলার ব্যবস্থা তার ভাল লাগে না। 'কিন্তুক,' সে বলল, 'এলাও কি ফুল পাট্টিক ভোট দিস তোরা?'

মৈচন্দ্রর সহোদর বলল, 'মুন পার্টি কৈস ক্যানে, যার মুন খাই তারে ভোট।'

কৈচন্দ্র হেসে ফেলল, 'সেই না কতা। পৈলা কলু রাজা। বাদে কলু রাজা যাক-রাজ্য দিছে তাঁয়ে রাজা তাঁরে মুন। তো এলা কয় শাল থাকি কাঁয় রাজা? কাঁয় মুন খোয়ায়? যাঁয় মুন খোয়ায় তাঁক তো ভোট দিবু, না কি?'

মৈচন্দ্র হেসে বলল, 'তুই না কছিস এলা কাঁউ রাজা নাই। সগায় বাজার থাকি-মুন কিনি খায়।'

কৈচন্দ্র যুক্তিটার উত্তর দিতে না-পেরে একটু দমে গেল। কিন্তু একটু পরেই আবার বলল, 'আচ্ছা, ছাড উগলা কথা। তিশ শাল ওই তরুর পার্টি ধরি থাকি কি হইছে-তোর? একশ বিশ বিঘা জমি—এলা না তিস বিঘা।'

মৈচন্দ্রর সহোদর বলল, 'তোরই পার্টি করছে তো।'

কৈচন্দ্র হেসে বলল, 'গ্রামৎ বসি থাকিস, জানবু না কিছু। কাঁয় কারছে তোর ওই জমিধরা আইন? তোরই মুন-পার্টি। জানি রাখ।' কৈচন্দ্র তার ভালো যুক্তিটাকে তর্জনী দিয়ে গেঁথে ফেলল।

মৈচন্দ্রর বড় ছেলে বলল, 'আচ্ছা, না হয় নতুন পার্টি ধরি তুই জিতি গেইছিস, আচ্ছা, না হয় সভাপতি হয়্যা গেইছিস, কিন্তক—'

কৈচন্দ্র বলল, 'তুই ভাবিস, আমি ঘরং খায়া বনং ভৈষ চরাই? তো, পইলা, বন বা কোটে আর? ভৈষ বা কোটে? দুসরা, উমরা তিস শাল প্রধান থাকছে, পাইছে কি? করছে কি? বিডিও সাহেব মোর গ্রামৎ কিছু গম দিলে ভাল, বিডিও সাহেব মোর গ্রামৎ কিছু মাটি কাটা কাম হলে ভাল।' এই না করছে তিস্ শাল? বিডিও দেখি চেয়ার ছাড়ি উঠি দাঁড়াইছে। হেডক্লাক দেখি হাত মোচডামুচড়ি কচ্ছে। করে কি নাই করে?'

মৈচন্দ্রর সহোদর বলল, 'তুই নাই-করিস?'

কৈচন্দ্র এ অদ্ভুত কথা শুনে হেসে ফেলল। তর্জনী উদ্ধত করল। সে বলল, 'জমানা' পালটি গেইছে রে, পালটি গেইছে। মোর পার্টি বনং ভৈষ চরায় না। এলা মোক সভাপতি সাহেব কয়, কি না-কয়, শুনি আয়। এলা কাঁওএ কারো অধীন নাই রে।' বিডিওক দেখি চ্যার ছাড়ং মুই?'

মৈচন্দ্রর মেজ ছেলে হেসে বলল, 'আচ্ছা। কাকা তুই না-হয় রাজবংশী থাকি সাহেব হয়্যা গেইছিস, কিন্তক ভাত দশজনার কি হইছে?'

'হয় নাই?' কৈচন্দ্র একটু হাতড়েই যুক্তি খুঁজে পেয়ে জোরে জোরে হাসল। বলল, সে, 'আচ্ছা, তুই শার্ট পাজামা পিঁধছিস ক্যানে? বাজার যাবু? না। তো? ওহো,-

তুই না এসডিও অফিসত কেরানি। আফিস যাবু? দশটাত আফিস তো। এলা বারোটা বাজি যায়। এলাও এটে আছিস? এলা ক, দশজনার লাভ হয় কি না-হয়। আগত কি করছিস, এলা কি করিস?' কৈচন্দ্রর তর্জনী বাঁ থেকে ডাইনে গেল।

মৈচন্দ্রর মেজ ছেলে কিছু বিব্রত হয়ে বলল, সে একা নয়। এখন সব অফিসেই এরকমই প্রথা। দশজনেই এরকম করে। তাতে সুবিধা হওয়ায় কৈচন্দ্র তর্জনী ঝপ করে মাটির দিকে নামিয়ে পয়েন্টাকে বিঁধে ফেলল।

মৈচন্দ্র শান্ত হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এটাও তোর পার্টি করছে? তোর পার্টি দেখং সবই করে।'

কৈচন্দ্র বলল, 'করছে তো। উমরায় তো মোর পার্টির না-হয়, উমরার কিন্তুক সুবিধা হয়্যা গেইছে, বারো বাজে, আফিসত না যায়।'

মৈচন্দ্রর ছোটছেলে চা নিয়ে এল। কৈচন্দ্র যে যুক্তিতে জিতে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। সে সেটা বোঝাতে জোরে শব্দ করে চায়ে চুমুক দিল। সে অন্য যুক্তিও ভেবে নিল সেই সুযোগে।

একটু পরেই সে বলল, 'দাদা, তোক কথা দিই, আগত সে ইলেকশনং দাঁড়াছিস, এলা আর দাঁড়াবু না। তোর অমলতরু হারি যাইবে, তুইও হারি যাবু। লজ্জাত পড়ি যাইবি।'

মৈচন্দ্রর সহোদর বলল, 'কেন, তা কবু তো।'

'আ-হাঃ। তোর গ্রামং এলা উমরায় না মেজোরটি।'

'উমরায় কেন কবু। খুলি ক।'

'হোই না রংপুরিয়া ইফুজিগুলা।'

'কায় বসাইছে ওলোক? তুই-তো।' মৈচন্দ্র বলল।

'হামি? হামি কি করছি? র‍্যাশন কাড করি দিছং? তার আগত কাঁয় আনছে? কনট্রাক্টর আনছে কি না মাটি কাটিবার? তো এটকার মানষি তের টাকা নেয়, উমরা নেয় দশ টাকা। তো লোভ লাগি গেইছে, যায নাই। পাছে না খায়া থাকে, র‍্যাশন কাড করা লাগে কি নাই-লাগে?'

'ফিরি যায় না ক্যানে?' কৈচন্দ্রর সেজভাই বলল।

'ক্যানে ফিরি যাইবে? আমার পার্টির এগ্রে তো কয়া দিছে, উমরা আমারে আত্মীয়। আইসবে তো। তো ক', ঠিক কি না ঠিক? আগত ত সগায় ইণ্ডিয়ার ছিটিজেন, পাছত তো বাংলাদেশী। কেনে না আইসে?'

মৈচন্দ্রর সেই প্যান্ট শার্ট পরা ছোটছেলে কৃষ্ণচন্দ্র যে এই আলোচনায় দূরে দূরে

থাকছিল, সে মিটমিট করে হেসে বলল, 'আচ্ছা, কাকা, তো, এরশাদ রংপুরিয়া হয় কি না-হয় ?'

'হয় তো।'

'উমরা ইণ্ডিয়া স্বাধীন হওয়ার আগে থাকি ইণ্ডিয়ার ছিটিজেন হয়, কি না-হয় ?'

কৈচন্দ্র একটু ইতস্তত করে বলল, 'হয় তো।'

'ভাবি দেখ, কাকা। এরশাদ তো আত্মীয় হৈল। উমরায় যদি বিশ হাজার আত্মীয় ধরি আসে যায়, র‍্যাশন কার্ড করি দিবু তো ?'

'হুঁ। তুঁই দেখং কাকার মুখত কথা কইস।' কৈচন্দ্র তেড়ে উঠল।

মৈচন্দ্রর বয়স হয়েছে। কয়েক পুরুষ মারপিট হাঙ্গামায় যেতে হয় নি বলে সে এ ব্যাপারগুলোতে সম্ভবত ভীরু। সে বলল, 'মোওয়ামারিত ফির ডাংপিট হইছে, দুইজনা মরছে। তো বৈশাখত মোওযামারিত হইল তো, শাবনত গোঁসাইথানত তিনজনা মরছে। ফিন এলা মোওয়ামারিত একজনা।'

'হইবে তো।'

'ভাল না-হয়।'

'হুঁঃ। সংগ্রাম করা লাইগবে, লডাই করা লাইগবে।' কৈচন্দ্র তার তর্জনী ডান থেকে বাঁয়ে, বা থেকে ডানে নিল।

মৈচন্দ্রর সহোদর বলল, 'উমরার পার্টি, আর তোর পার্টি মিলি নাকি একই জায়েন্ট পার্টি।'

'হয় তো।'

মৈচন্দ্র বললো, 'ইয়াত যাইস না। তোর পার্টির ছয় জনাক নাকি ধরছে।'

'ধরছে তো ফিন ছাড়ি দিছে।'

মৈচন্দ্রর বড়ছেলে বলল, 'দুসরা পার্টির এম্লে নাকি মামলা তুলি নিতে বলছে। যার যার আত্মীয় মরছে তায় নাকি মামলা তুলি নিতে চায় না।'

'নাই নিবে। বিচার হইতে হইতে দশ বছর। তার আগত দুইবার আরও ভোট হয়্যা যাইবে। যায় কি না-যায়! আর আগত যদি বিচার হয়্যা যায়, দণ্ড পাইয়া যায়, জেহেল থাকি ছাড়ি দেবে। দেখি নিস।' কৈচন্দ্র তুরি দিল।

'আচ্ছা, কাকা,' কৃষ্ণচন্দ্র বলল, 'তোমার ব্লক থাকিই তো, এই সড়কের প্ল্যান করছে। সভাধিপতিক বলি বলি সড়কটা নাকি করছ। তো পাশের ব্লকে, শোনং, তোমার এই পুবপশ্চিম সড়ক থাকি পুব-থাকি-দক্ষিণ সড়ক হইবে। হওয়া ধরছে। মাটি কাটা সুরু হয়া গেইছে। তো তোমার সভাধিপতি কি এরোপ্লেনে উড়ি উড়ি দেখছে, সড়ক করলে কি হইবে ? উমরায় কি ইঞ্জিনিয়ার পাশও করি নিছে।'

'খু্স্। উমরায় হুকুম দেয় তো, তোর ইঞ্জিনিয়ার সড়ক দাগি দেয় কাগজত।'

'আচ্ছা, কাকা, তোমার সড়কত লাভ কি হইল?'

'বাস যাইবে, বাস। তুই দেখি নিস।'

'তোমার বাসত প্যাসেঞ্জার বা কাঁয় হয়।' আচ্ছা হউক তা। সড়কর মাটি কাটি তো গ্রামত টাকা আসছে, ভোট হয়্যা গেইছে। ভাল্ই। কিন্তু জল বাধি গেইছে। আগত এ গ্রামত জল জমছে?

'জলে জমে তো কি হয়? ফ্লাড্ হয়্যা যাইবে। গম দিম, টাকা দিম। হুম্। দেখি নিস্। হুম।'

'আর ওই ব্লকর ওই সড়কটা হইলে তো দু সড়কর মাঝের জমি বিল হয়্যা যাইবে।'

'যাইবে? যাইবে।' কৈচন্দ্র যুক্তিটাকে হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, 'শোন, শোন। তেমন হয়্যা যায় খারাপ কি হইবে? নিবিড় মাছচাষ প্রকল্প করি দিম। সেটাও না আছে।'

মৈচন্দ্রর কনিষ্ঠ ছেলেটি কৃষ্ণচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠে বলল, কাকা, তুমি এলাও জোকার থাকি গেইছ।'

কৈচন্দ্র খুব রেগে গেল সে বলল, 'তুঁই ভাতিজা হয়্যা এমন কইস? মুই জোকার? তোক কাঁখত করি বেড়াছি। তোক ইঞ্জিনিয়ার করির পড়ানোর ধরছি। এলা মোক জোকার কলু? তো, তুই যেদু ভাবি থাকিস আমার শহরর বাড়িটা তোর হইবে, ভুলি যা। আজ থাকি ভুলি যা। জামাইক দিম্, তো তোক্ দিম না।' কৈচন্দ্র জোরে শব্দ করে তুরি দিল।

'না দেন, নাই দেন কিন্তু বিটি কোটে তোমার যে জামাইক বাড়ি দেন? রাগ করিয়া কিই বা কন, কাকা।'

কৈচন্দ্র মুখ গম্ভীর করে বলল, 'জামাই থাকিল হয় তো জোতজমা বাড়ি তাকএ দিলং হয়। তোক দিমু না হয়।'

মৈচন্দ্র উঠল। বলল, অনেক বেলা হইছে রে। চল এলা ছান খাওয়া করি। পাছত ভোট কি করা করিস।'

মানষিটা পাগল হয়্যা গেইছে। কিন্তু শব্দটা 'মানষিটা' কেন? কারো কাছে কখনও কি পূর্ব পরিচিত মনে হয় তাকে। কারো কি মনে হয়, এদিকে, এ অঞ্চলে, মোদনাথ রাভা নামে কোনো কিশোর, পরে যুবক হিশাবেও বিশেষ গুণে অনেকের পরিচিত হয়ে উঠছিল? অথবা তার অর্থ কি এরকম, যে এই এখন পাগল, ভাল হক, মন্দ হক আগে মানুষ ছিল? চেনা কঠিনই ত, যদি পূর্বপরিচিতই বা হয়। চুল দাড়ি বেড়ে

বেড়ে মুখের কতটুকু বা দেখা যায়। না-খেয়ে না-খেয়ে রোগা। একই ত পোশাক— ছেঁড়া খোঁড়া প্যাণ্ট আর শার্ট। হাতপায়ের নখ বেশ বড় বড়ই। এ শহরেরই কোনো বাড়ির ছেলে—যে সারাদিন এমন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে বাড়ি ফিরে যায়, খায়, ঘুমায়? না-ফিরলে মা একা গোপনে রাত জেগে বসে থাকে? অথবা এদিকের কোনো গ্রামের ছেলে—কোনোদিন ক্ষুধা টের পেলে আবার গ্রামে ফেরে? কিংবা অন্যকোনো শহরের বাসিন্দা, হঠাৎ একদিন এই শহরে এসে, আর ফিরে যাওয়ার কথা মনে করতে পারছে না? মোদনাথ যদি হবে—সে ত বেশ ফরসা চেহারার একজন ছিল।

যাই হক, খায় কি? পাগল হলেও কিন্তু খেতে হয় অনেক সময়ে; না খেয়ে যে কোনো রাস্তা ধরে শহরের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়ালে, পাগলও দু পায়ের উপরে খাড়া থাকে না। পাগলও শেষ পর্যন্ত একটা প্রাণীই বটে।

আবার দেখ, কেউ কেউ নাকি দেখেছে, শীত, গ্রীষ্ম বোধ নেই, নদীটদি দেখতে পেলে প্যাণ্ট আর শার্ট তীরে রেখে জলে নেমে যায়। কেউ কেউ নাকি এমনও দেখেছে ভর দুপুরে নির্জন জায়গায় টিউবওয়েল পেলে জামাটামা সমেতই মনের আনন্দে স্নান করছে, যেন হাত ঘষে ঘষে জামা প্যাণ্টও সেই জলে পরিষ্কার করে নিচ্ছে।

মানুষ তো আর সত্যি খারাপ নয়। দয়া ধর্ম আছে, অলৌকিকে বিশ্বাস আছে। এরকম একটা ধারণা জন্মাচ্ছে সে যদি কখনও কোনো দোকানে বসে খায়, সে দোকানে সেদিন বিক্রি ভাল হয়। এরকম ধারণাও আছে, শনি মঙ্গলে গৃহস্থর বাড়িতে সে যদি হঠাৎ ভর দুপুরে খেতে চায়, তবে গৃহস্থর শনি মঙ্গলের ফাঁড়া কেটে যেতে পারে।

কিন্তু এমন ঘটনা নাকি ঘটেছে, দু একজন বলে, তাকে খেতে দিয়ে সেই সুযোগে কাজ না করে খেতে নেই, ভিক্ষা করাটা খারাপ এসব ধরনের উপদেশের বাড়াবাড়ি কেউ করলে তার চোখ দিয়ে কখনও কখনও টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়ে।

সব চাইতে কৌতুকের ব্যাপার করেছে কিছুদিন থেকে এই ছোট শহরের আরও ছোট বেশ্যা পল্লীর কোনো কোনো মেয়ে। কতদিন এরকম থাকবে জানা যায় না— তাদের সেই অনির্বচনীয় ফ্যাশানটা, যা ক্রমশ প্রথা হয়ে যাবে এরকম সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। হয়ত কালে পরিত্যক্ত হতে পারে। কিন্তু পাগলটাকে তারাই বরং নিয়মমত খেতে দিচ্ছে সে দুপুরের কোন সময়ে উপস্থিত হলেই হল। এমনকি তারা নাকি এরকমও বলে, কাল তোর ঘরে খেয়েছে, আজ আমার ঘরে খাক। যেন সন্তোষী মার মত একটা নতুন বিপদনাশন কোনো সামাজিক ধর্ম সৃষ্টি হতে পারবে, অপার অকূল সময়ের থেকে নিজের মঙ্গলকে এনে দেবার কোনো উপায় হতে পারে।

কিন্তু এরকমও যখন সে খাচ্ছে তখন ভাতের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সে নাকি, কোনো কোনো দিন, কেঁদে ফেলে, নিঃশব্দেই, চোখে জল এসে যায়।

আর এ সবের মূলে নাকি সেই বেশ্যাটি যে এখনও স্কুলের মেয়ের মত ফ্রক পড়ে, যে মাথায় সাড়ে চার ফুটও হয় কি না হয়, অথচ চোখের কোলে কাজল দিয়ে আর ঠোঁট টকটকে লাল করে বাজারে যায়, কথাবার্তায়. নড়াচরায় বুঝিয়ে দেয়, গায়ে হাত দিতে পার।

সেই নাকি একদিন বলেছিল, 'এই মানুষটা, খাবে ?'

'হ্যাঁ, তো।'

'এখানে কি খাবে ? বাড়িতে যাবে আমার, তবে তো।'

তখন নাকি পাগলটা তার পিছন পিছন হাঁটতে আরম্ভ করেছিল।

খানিকটা গিয়ে স্ত্রীলোকটি পিছন ফিরে সে রকম দেখে আর চারদিক নির্জন দেখে বলে ফেলেছিল। সে বেশ্যা। তা জেনেও কি পাগল তাব বাড়িতে গিয়ে ভাত খাওয়ার কথাই ভাবছে ?

পাগল নাকি বলেছিল, 'হ্যাঁ, তো।'

কিন্তু একেবারে পাগল নয় বোধ হয়। ভাত খাওয়ার জ্ঞান টনটনে। এমন কি সেই স্ত্রীলোকটি বললে, তার ঘরের পিছন থেকে কাটারি দিয়ে কলাপাতাও কেটে এনেছিল সেই প্রথম দিনেই।

আবার পাগলও। সেই স্ত্রীলোকটির বাড়িতে খেতে বসে, কিংবা সেই পল্লীরই অন্য কোনো স্ত্রীলোকের ঘরের দরজায় খেতে বসে একদিন যে গল্পটা করেছিল সে, বার বার অনুরোধ করলেও সেই একই গল্প বলে। এরকম অবস্থায় যেমন কোনো কোনো পাগল একটা মাত্র গানের একটা কলিই মনে রাখতে পারে। অসম্ভব গল্প। কিন্তু নতুন নয়। এ অঞ্চলে বয়স্কদের অধিকাংশই সম্ভবত জানে, কারও না কারও মুখে সে শুনে থাকবে। এই অঞ্চল থেকে দক্ষিণ দিকে চলতে থাকলে একটা নাকি রাজ্য ছিল। দক্ষিণ থেকে কেউ এসে সে রাজ্যের রাজধানী দখল করতে পারত না। প্রকাণ্ড উঁচু মাটির প্রাচীর ছিল। দশ-বিশ মানুষ উঁচু, আর সে প্রাচীরের গোড়াও ছিল পঞ্চাশ ষাট হাত চওড়া। এখনও নাকি দেখতে পার। পাঁচশ বছরের বৃষ্টিতে গলে নি, দক্ষিণের নবাবের কামানের গোলায় ভাঙে নি, সাহেবরা রেললাইন বসাতে বাইরের প্রাচীরের খানিকটা কেটে নিলেও, গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দে বোঝা যায় গাড়িটাকে উঁচুতে উঠতে হচ্ছে। এখন জাঙ্গলের মুখে কি বা হয়। যাই হক সেই রাজধানীতে ছিল আইদেবতির মন্দির। আর সেই আই রক্ষা করত রাজাকে, রাজ্যকে। সে আই-এর কাছে ছাগ বলি হত, মোষ বলি হত আর বছরে অন্তত একদিন একটা অন্তত মানুষ বলি হত। যে সে

মানুষ হয় না। নিখুঁত হওয়া চাই, স্বাস্থ্যের হওয়া চাই, নতুন যুবক চাই। অছুতে হবে না, ব্রাহ্মণে হবে না, স্ত্রীলোকে হবে না। যুদ্ধের বন্দী হলে হয়। কিন্তু যুদ্ধের বন্দী ত প্রায়ই খুঁতো হয়ে যায়। সেজন্য প্রজাদের মধ্যে বরুআলি খেল তৈরি হয়েছিল। এই এক সম্প্রদায় সাধারণ প্রজাদের মধ্যে থেকে যারা স্বতন্ত্র। যারা বছরে একবার অন্তত একটি করে যুবক যোগান দিত বলির। রাজার পেয়ারের সম্প্রদায়। গোটা সম্প্রদায় নানা সুবিধা ভোগ করত সেজন্য। ভাল দোফলা জমিগুলো পেত, খাজনা দিতে হত না, রাজার বনে যথেচ্ছ শিকার করতে পারত। তারপরে বছরে, একদিন সেই সম্প্রদায়ের একটি যুবককে বাছাই করে নিত দেউরিরা। নরসুন্দররা তাকে সুন্দরতর করে দিলে, চন্দন, সুগন্ধ তেল মাখিয়ে স্নান হয়ে গেলে, তাকে সোনা রূপার অলঙ্কার পরিয়ে, পট্টবস্ত্র পরিয়ে, আই প্রদক্ষিণ করিয়ে প্রাচীরের সেই 'মাশান' অংশটায় তাকে নিয়ে যেত দেউরিরা, যেখানে খড়্গে, গলা কেটে গেলে তার মাথাটা প্রধান দেউরি ধরে রাখতে পারে, যখন ধড়টা প্রাচীর থেকে নিচে পরিখার জলে গড়িয়ে পড়বে। তারপর তামার থালায় মাথাটা পেত আই। সে জন্যই ত সেই খেল, সম্প্রদায়টা, বরুআলি, অত তাদের সুবিধা দেয়। অন্যরকমও হত। কোনো কোনো সময়ে কেউ বা বলত সে ভোগী হয়ে গিয়েছে, সামনের বছরের পূজায় বলি হওয়ার জন্য আই স্বয়ং তাকে ডেকেছে। তখন তার মত সেই একবছরের জন্য সৌভাগ্যবান আর কে? ভোগ্য পণ্যই বল আর ভোগ্যা যুবতী বল সবই তার ইচ্ছায়ত্ত। এমনকি রাজার প্রাসাদে, রাজার মত সোনার থালায় সে খেতে ইচ্ছা করলে, রানীর সঙ্গে ঘুমাতে ইচ্ছা করলে তাকে কেউ বাধা দেয় না। নিষেধ করে না সেই একবছর সময়ের জন্য।

'বলিস কি, পাগলা, রানীর সাথে ঘুমায়?'

'হ্যাঁ তো।'

'বছর শেষ হলে তার মাথাও থালায় করে আইএর সামনে দেয়।'

'দেয় তো।'

'তার পর?'

তারপর যদি তার মনে আসবে তা হলে আর সে পাগল-মানষি কেন? একদিন কলাপাতা কেটে এনে ভাত খেতে বসে খেতে পারল না। তার চাইতে ভাতে হাত দিয়ে যে কখনও কখনও তার চোখে জল আসত, সে ছিল ভাল। যেন তার শরীরের ভিতরে কষ্ট হচ্ছে কোথাও, ভাত থেকে গরম ধোঁয়া উঠতে দেখেও খুশি হচ্ছে না। বরং চোখ দুটো বড় বড় আর ধারালো হয়ে উঠছে। সে কলাপাতায় ভাতটুকুকে মুড়ে নিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল।

'মানষিটা কিন্তক শহর ছাড়ি যায় না।' তাকে চায়ের দোকানে কখনও বাসন মাজতে দেখা যাচ্ছে। রোয়া বোনার সময়ে শ্রাবণের জমা জলের খেতে কেউ কেউ তাকে অন্যান্য চাষীদের পাশে দাঁড়িয়ে রোয়া বুনতে দেখেছে। কেউ বা তাকে তার সেই ছেঁড়াখোঁড়া প্যান্টটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিতে বললে, তেমন করে নিয়েছে। কিন্তু পাগল ত, রোয়াখেতের বাইরে শুকনো জমিতে এসেও প্যান্টের গুটানো পা খুলতে আর মনে থাকে না। শহরের বাইরে নতুন যে ইটের ভাঁটা সেখানেও মানসিটাকে কাদা তৈরি করে দিতে দেখা গিয়েছে। পাগলই ত। নতুবা আর সকলে যখন সাড়ে তের টাকা করে হিশাবে মজুরি নেয়, সে পাঁচটাকা করে পেয়ে তত খুশি মনে কোদাল দিয়ে কেটে কেটে দুপায়ে দলে দলে কাদা বানাতে থাকে কেন? এই ইটের ভাটা নাকি চিরকাল থাকবে। বাস ভাড়ার টাকা তৈরি হচ্ছে, 'ফাটা কাপড়ে'র বিক্রিতে টাকা হচ্ছে, মাটি কাটা, ফ্লাড্, খরা, ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্সের ধনোৎপাদন হচ্ছে, আর বনে এমন গাছও আছে যার যে কোনো একটা একটা ত্রিশ হাজার করে টাকা বানায়। তখন ইটের দরকার হয়। পাগল হলেও দেখে শিখতে দোষ নেই। বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা ইটের উপরে কাশ কেটে এনে চালা তৈরি করা যায়। তাতে বর্ষা আর শীত কমে যায়। সে রোজকার মজুরী থেকে একটাকা দুটাকা করে জমিয়েও যাচ্ছে। নিশ্চয় তা অন্য মজুরদের কাছে শুনে। তাকে যে সর্দার কাজে লাগিয়ে রেখেছে সে বলেছে শীতে ফাটা কাপড়ের হকারদের থেকে গরমের জামা আর প্যাণ্ট কিনতে চল্লিশ টাকা লাগবে। তা হলে বর্ষায় যে কাশি আর হাঁপানির মত হয়েছে শীতে সেরে যাবে।

ফাটা কাপড়ের হকার দুটো পড়িমরি করে চলে গেল, ট্রাকটা দড়িদড়া কুড়োল আর তিমি শিকারীদের নিয়ে চলে যাওয়ার কিছু পরে চকচকে মোটর বাইকটাও চলে গেল। পাগলা মানষিটা চা খেল, রুটি খেল। হাসি হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তারপরে চোখের মণি দুটো কেমন যেন নড়াচড়া করল, ডিগবাজি খেল যেন, আর তখন সে দু হাত তুলে দুপাশ থেকে নিজের মাথা চেপে ধরল। সে ভুলেই গেল কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানগুলোর কাছে যারা ছিল তারা বলাবলি করল।

'মাথাত ত কষ্ট। পাগল ত মাথা থাকি।'

'হয়তো মাটিতে শুইছে, কান দিয়া পোকা ঢুকি গেইছে মাথাত।'

'আজিকালি মাথাত ক্যানচার হওয়া ধৈরছে।'

সে সে রকম মাথা ধরে যেদিকে চোখ যায় সেদিকে হাঁটতে লাগল। কে যেন মনের মধ্যে কানে কানে ডাকার মত আবার এতদিন পরে বলছে—মোয়াত, মোয়াত, জাগি আছিস, না ঘুমালু।

মোদনাথ গরাদে দিয়ে বারান্দাটা, বারান্দার কোলে পাথরকুচি বিছানো উঠোন, উঠোনের শেষে খানিকটা দূরের জেলের গেটটাকে দেখছিল। যেরকম প্রথায় নতুন কাউকে আনা হয়, জেলর, ওয়ার্ডার, মেট, আসামী এইভাবে নতুন একজনকে আনতে দেখে মোদনাথ সেলের অন্ধকারের দিকে সরে গিয়েছিল। কিন্তু তখনই সে গানটা শুনেছিল, গানের গলাটাকে চিনেছিল, সুপ্রিয় না হয়ে যায় না। অবাক কাণ্ড, ছ-সাত মাসও হয় নি, আবার দুজনে একত্র। ও কি দেখেছে তাকে। দেখেই গান করছিল, প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়? সে গরাদে থেকে সরে গিয়েছিল বলে? কিন্তু তখন বুঝবার উপায় ছিল না, সুপ্রিয়কে ততক্ষণে তার সেলে ভরে দিয়েছে।

তিনদিন পরে বিকেলে বাতাস-খাওয়ার সময়ে পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুপ্রিয় বলল, 'চল, কলকাতায় যাই।'

'কেন? কি হবে?'

'কবিতা লিখতে পারবি, সাহিত্য সমালোচনা করবি। লুকাচ ত তোর মুখস্তই।'

'আর তুই?'

'হ্যাঁরে, মুচলেখা দিলে অভিনয় করতে দেবে না সিনেমায়?'

'এতদিনে তোর সেই পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। সেট তো আর তামাদি হয় না। তুই প্রফেসারিও পেয়ে যাবি।'

এরকমই ছিল সুপ্রিয়। ছ সাত মাস পরে প্রথম দেখা। অবিশ্বাস্য সমাপতনে, নতুবা একই জেলে আবার কেন? অথচ যেন রোজ দেখা হচ্ছে। কাল বিকেলের মুলতুবি কথাটা আজ হচ্ছে।

কিন্তু দিন পনের পরে, তখন বিকেলে পাশাপাশি বসে গল্প করলেও ওয়ার্ডাররা এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ায় না। সুপ্রিয় বলল, 'তুই সবটা ভেবেছিস নিশ্চয়, মোদনাথ। 'আমরা ভুল করেছিলাম' বলে যারা ফাঁসির দড়ি থেকে রেহাই পেয়েছে তারা বেশ প্রকাশ্যে প্রেস-কনফারেন্স করছে।'

'করছে।'

'যারা 'ভুল করেছিলাম আমরা' বলার সুযোগ পাওয়ার আগে মরেছে, তাদের কারও কারও স্ট্যাচু হচ্ছে।'

'হচ্ছে। মালা পাঠিয়ে দিবি?'

'আচ্ছা এটা কোন শহর, কোন জেল খবর নিয়েছিস?'

'কেন?'

'ভরাটুর চরে জলঘেঁষে মুখ থুবড়ে পড়েছিল রতন। তোর কি মনে হয়, সে জলে ভেসে যেতে পেরেছে, নাকি সেখানেই পুড়িয়ে দিয়েছিল তাকে পুলিশ?'

মোদনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'শ্যামল এলএমজি-র মুখে পড়েছিল। তার আর কি পোড়াবে? তার মাংস-টাংস পরে নিশ্চয় শেয়াল শকুন খেয়েছে। তা খাক, তিব্বতীদের নাকি এরকম সংকার। কিন্তু তার সেই চোখ দুটো? বেশ হয় যদি উই উঠে ওর চোখ সমেত সেই কোঁকড়ানো চুল সমেত মাথাটাকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে থাকে।'

'শ্যামল তোর মতই গান করত।'

'আচ্ছা, সেটা বোধহয় মহানন্দার কাশবন ছিল? আর কেমন সব অ্যাকসিডেণ্ট হয়! যে পায়ে ওর গুলির ঘা সে পাটাতেই সাপে কেটে দিল। নাকি সে পিছিয়ে পিছিয়ে পড়ছিল বলে সাপ সুবিধা পেয়েছিল। সাপে কাটা শরীরও কি বনের পোকামাকড় আস্তে আস্তে খেয়ে শেষ করে দিতে পারে। পোকাদের বিষ লাগেনা? তুহিন কিন্তু আমার কাছে দু প্যাকেট সিগারেটের দাম পেত।'

'কি হবে ভেবে?'

'আবার ধরা পড়লাম ত। সুরেনকে এবার বোধহয় আর কেউ ধরতে পারবে না। একবার 'ও মা' এরকম শুনেছিলাম। রাতুল হাসপাতালে। তোর সঙ্গে ত সুদামা ছিল।'

'তা হলে পাঁচে দুই আছি।'

'থেকে যেতে বলছিস?'

'উপায় কি? বোঝা যাচ্ছে সাব্‌জেইল। কিন্তু কোন শহর তা কি জেনেছিস? কাছে বন, কিংবা স্টেশন, কিংবা নদী আছে কি?'

দিন সাতেক পরে সুপ্রিয় বলল, যেমন সে বলে হাসতে হাসতে, 'সুবল, সুহাস, আর কালি কিন্তু এখনও কোনো বিবৃতি দেয় নি কাগজে। তুই দেখেছিস? তা ছাড়া তুই একটু তলিয়ে ভাব, সেই জোতদার কজন, সেই পুলিশের লোক কজন, সেই মহাজন তিনটে, তারা ত কোনো বিবৃতি দিতে পারবে না। কোনোদিন কলকাতায় যাবে না। তাদেরও অপমান ত।'

আরও দিন সাতেক পরে, কোর্টে নিয়ে যাওয়ার আগের দিন আবার, সুপ্রিয় বলল, 'লক্ষ্য করেছিস, মোদু, দ্বিতীয় বাঁকটা নেয়ার আগে একটা মরাসরা নদীর পার আর কিছু ঝোপঝাড় জঙ্গলও। কালই। ফেরার পথে। সান্ত্রীদের সঙ্গে এ এস আই এ-র সঙ্গে হেসে হেসে মিষ্টিমুখে কথা বলবি। যাওয়ার পথে, আসার পথে।'

'যাতে ওরা একটু নিশ্চিন্ত থাকে। তুই যদি বলিস এ এস আই এর কাছে থেকে সিগারেটও চাইতে পারি।'

'মন্দ কি? কিন্তু কেউ পিছন ফিরে তাকাব না। হতে পারে, মোদ্র, হয় তুই, না হয় আমি। দুজনে দুদিকে কিছুটা একসঙ্গে ছুটে, কি বলিস।' আমার মনে হয় সান্ত্রী আর এ এস আই শুট করার আগে ভাববে—'

'হতে পারে। হয়তো ভাববে শুট করার অর্ডার আছে কি না। তাই সুবিধা।'

মোন্নাত মাথা ধরে অনেক দূর চলে এসেছিল। সে হাঁপাতে লাগল। এখন ত তাকে এ অবস্থায় হাঁপানির মত টানতেও হয়। সুপ্রিয়কে মন থেকে বার করে দিতে সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। কিন্তু সেটা কি নিছক সমাপতন যে সুপ্রিয়, সে নয়। শুট করতে দ্বিধা হচ্ছিল বটে ওদের। কিন্তু সে কতক্ষণ। সুপ্রিয় কি ড্রিবল করে করে ছুটছিল। সে কি জিফ থেকে প্রথম লাফটা, তার চাইতেও খারাপ দিয়েছিল। কিংবা, কিংবা সুপ্রিয় কি ভেবেছিল এ অঞ্চলে এ অঞ্চলের মানুষ মোদনাথের যেমন সহজে মিশে যাওয়ার সুবিধা, তার তেমন সুবিধা হবে না? এরকম ভাবতে যত কম সময় লাগুক, সেটা দ্বিধাই, তাতে গতি কমে যেতে পারে।

শীত এসে পড়েছে, এবারের শীত কি রকম হবে তা নিয়ে কথা হচ্ছে। তুরুককাটা নামের এই ছোট শহরে, ডাউকিমারি নামের এই ব্লকে আর মরুচমতী নামে নদীটার উপরে এবার তেমন কুয়াশা নাকি দেখা যাচ্ছে না। অন্তত সে কুয়াশায় নাকি জলের ভাগ কমে যাওয়ায় তা আসমানি নীলের বদলে কালো হয়ে যাচ্ছে।

তা হক। শীতের আগে পূজা এসে পড়েছিল। তুরুককাটা শহরেরই হক, কিংবা ডাউকিমারি ব্লকেরই হক সরকারি কর্মচারীরা এবার একই সঙ্গে পূজা-বোনাস যা নাকি ফেরৎ দিতে হবে না, আর পূজা অ্যাডভ্যান্স যা নাকি ছমাসে ধীরে ধীরে কাটাবে তা পেয়েছিল। এবার পূজায় তুরুককাটার শহরবাসীদের অন্যান্য বড় শহরে ছুটোছুটি করতে হয় নি, মনের মত কাপড়ের জন্য। বাজারের দুই প্রান্তে দুটো দোকান পূজার কিছু আগেই কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে দোকান বড় করতে থাকলে, লোকে বুঝতে পারে নি, কেন, কি বৃত্তান্ত। কিন্তু মহালয়ার দিনেই এক দোকানে দিল্লি ক্লথ মিলস আর বোম্বে ডাইং, অন্য দোকানে ওনলি বিমল এসে পড়লে বেশ উত্তেজনা হয়েছিল। এরকম বলা হয় এ দুটো দোকানে বিক্রি বাড়লে তার দেখাদেখি অন্য সব দোকানেও বিক্রি বেড়েছিল। আর রেলস্টেশনের কাছে সেই সুযোগে ছোটছোট ত্রিপলের টুকরোর ছাদের নীচে সাময়িক একটা হংকং মার্কেট বসে গিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে আনা 'কাটা কাপড' আর আলুবাড়ি থেকে আনা 'চীনা কাপড়' সেখানে পাওয়া যাচ্ছিল।

এবার পূজায় কিন্তু আসল বৈশিষ্ট্য তুরুককাটা সিনে ক্লাবের উদ্বোধন আর মহালয়ার দিনেই তাদের 'প্রযোজনায়' ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেনের ছবি দেখানো। খুব ভিড়, অসম্ভব ভিড় হয়েছিল, সকলে টিকিট পায় নি। কিছু টিকিট ব্ল্যাক হয়েছিল।

মহালয়ার দু-তিনদিন পরে অন্য একটা ব্যাপার ঘটেছিল। মহাকবি কলেজের পূজার ছুটি হয়েছিল। পূজার ছুটির দিন ছাত্রদের যে দলই ক্ষমতায় থাকুক কলেজে, তারা বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে। স্বীকার করতে হবে, তুরুককাটায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যে কয়েকখানা পত্রিকা প্রকাশিত হয়—একলব্য, মেঘনাদ ও ব্রাত্যদেশ নামে তিনটে পত্রিকার কথা মনে রেখেও বলা যায়—তার মধ্যে কলেজের পত্রিকাটাকে মূল্যবান মনে করা হয়। গল্প থাকে, কবিতা থাকে, নিবন্ধ, সমালোচনা থাকে, কিন্তু তার বাঁধাই আর ছাপাই সব চাইতে ভাল হয়। সে যাই হোক, এবার সেই মহাকবি কলেজ বার্ষিক পত্রিকায় কলেজের অধ্যাপক জগচ্চন্দ্র বসাকের লেখা একটা ঐতিহাসিক নিবন্ধ বেশ সাড়া তুলে ফেলল। দুম করে এরকম একটা কেউ লিখে ফেলবে আর তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পাবে তা ভাবা যায় না। বিষয়টা একেবারে নতুন নয়। এর তার মুখে এর তার নিজের মত করে বলা গল্পটা শোনা যেতই, তাই বলে ছাপার অক্ষরে! আর মুশকিল এই ব্যাপারটা ইতিহাসের মত লাগে পড়লে। কামতাপুর রাজ্য ছিল, তা উড়িয়ে দেয়াও যায় না, আর তার প্রবল প্রতাপ ছিল সেই পাঠান আমলে তা সেই রাজ্যের রাজধানীর চারিদিকে তোলা সেই দশ-বিশ মানুষ উঁচু মাটির প্রাচীর, মাইলের পর মাইল জুড়ে যায় খণ্ড খণ্ড অংশ দেখে এখনও চেনা যায় যেন। জগচ্চন্দ্র সেই কামতাপুর রাজ্যের কথা, তার রাজাদের কথা, তার শেষ রাজার সঙ্গে দক্ষিণের সুলতানের তিন-তিনবার যুদ্ধের কথা, অবশেষে তার পরাজয়ের কথা, আর সে পরাজয় বিশ্বাসঘাতক এক পাত্র অর্থাৎছোটমাপের সেনাপতি কর্তৃক রাজপ্রাসাদে ঢুকবার গোপন সুরঙ্গ পথ দেখিয়ে দেয়ার গল্প। বিশ্বাসঘাতকের পক্ষে গোপন সুরঙ্গ পথ দেখান, জগচ্চন্দ্রের মতে, নতুন কিছু নয়, বরং সিম্বলিক অর্থ হয়ে গেছে তার। কামতাপুরের ক্ষেত্রে তার রক্তের সঙ্গে যুক্ত। এ সূত্রে লেখক বরুআলি খেল সম্প্রদায়ের এবং কারও কারও হঠাৎ 'ভোগী' হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ইংরেজিতে লেখা এথনোলজির বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়েছে। কামতাপুরের অধিষ্ঠাত্রী 'আই'-র সম্মুখে প্রতি বছর সব ব্যাপারে বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় বরুআলি খেলের একটি করে নিখুঁত যুবককে বলি দেয়ার কথা বলে নিয়ে, সে লিখেছে সেই যুদ্ধের বছরে পাত্রর ছেলে নিজেকে 'ভোগী' বলে ঘোষণা করেছিল। 'আই' নাকি তাকে বলি হতে বলেছে। আর সেই সুযোগে, ভোগীকে এক বছরের জন্য অবাধ ভোগ করতে দেয়ারই বিধান, পাত্রের

কোঙর গোপন সুরঙ্গ পথে রানীর শয্যায় ঘুমাতে যেত। কিন্তু সে বলি হয়ে যাওয়ার পর পুত্রহারা পাত্র নাকি দক্ষিণের সুলতানকে তৃতীয় যুদ্ধের সময়ে সুরঙ্গ পথে রাজপুরীতে পৌঁছে দিয়েছিল।

কিন্তু তখনও পূজা শেষ হতে বাকি। পূজার পরেও কোনো কোনো পত্রিকার পূজাসংখ্যা প্রকাশ পায়। একলব্য, মেঘনাদ, ও ব্রাত্যদেশ, কোনোটি পূজার মধ্যেই, কোনোটি পূজার কিছু পরে প্রকাশ পেলেও মহাকবি কলেজ-পত্রিকার নিবন্ধকে তীব্রভাবে আক্রমণ করল। একলব্যর হাতে বেশি সময় ছিল না। সে পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে লিখল: জগচ্চন্দ্র ইতিহাস লিখতে বসেছেন, কিন্তু দেখা যায় সব সময়েই তাঁর সহানুভূতি, দরদ, পক্ষপাত কামতারাজের প্রতি। তা যদি না হত তবে তিনি অনায়াসে দেখাতে পারতেন সেই শোষক রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের ক্রোধও ধূমায়িত ছিল এবং তিনি অনায়াসে শোষিত প্রজাদের দেখাতে পারতেন। 'মেঘনাদ' পত্রিকার নাম মেঘনাদবধ থেকে নেয়া। তা থেকেই বোঝা যায় তারা অবশ্যই কৃত্তিবাসের মত রামচন্দ্রকে প্রচার করার জন্য পত্রিকা চালায় না। তারা জগচ্চন্দ্রর রাজ-পক্ষপাতের কথা লিখবার পরে, দক্ষিণের সুলতানের পক্ষেও লিখবার যুক্তি ছিল, তা দেখাল। দক্ষিণের সুলতানের বাহিনী এ গ্রাম ও গ্রাম দখল করার সময়ে কিছু কিছু, তাদের পক্ষে যারা বিধর্মী তাদের, শিরচ্ছেদ যদি করেও থাকে, সে নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রের হত্যার মতই। তার তুলনায় প্রতিবছর আই এর সম্মুখে ধর্মের নামে একটি করে মানুষ বলি? গাজিরা ধর্মের নামে কিছু করে থাকলে, এত নৃসংশ ছিল না। সব চাইতে বেশি সময় পেয়েছিল ব্রাত্যদেশ। দীপান্বিতার দিন তারা পত্রিকা প্রকাশ করল। তার পক্ষে ততদিনে কলেজ পত্রিকা এবং সহযোগী দুটি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা পড়ে নেয়ার সুবিধা হয়েছিল। তারা বেশ বৈজ্ঞানিকভাবেই জগচ্চন্দ্রকে আক্রমণ করল। তারা জগচ্চন্দ্রের রাজন্যপক্ষপাতি-মানসের কথা ত বললই, উপরন্তু তারা জগচ্চন্দ্রকে আক্রমণ করার আরও তিনটি যুক্তি দেখাল। প্রথম: বরুয়ালি খেল শব্দটাই এদেশের নয়। ভুটিয়া রাজাদের দেশে এরকম বিশেষ সুবিধাভোগী এক সম্প্রদায় হয়ত ছিল। দ্বিতীয়ত: পূর্বাঞ্চলের তান্ত্রিকদের মধ্যে ভোগীদের মত ধাপ্পাবাজ হয়ত ছিল, কিন্তু পাত্রের পুত্রকে রানীর ব্যভিচারের অপরপক্ষ দেখালেই সমাজের দৃষ্টিতে তা বেশি বিশ্বাসযোগ্য হত। তৃতীয়ত: কামতাপুরের শক্তিমত্তার কথা তুলে পাগলকে খেপানোর ব্যবস্থা না হয়। সে ক্ষেত্রে একই দেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষের বদলে, গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে সংঘর্ষ শুরু হতে পারে। সেই সঙ্গে গোপন সুরঙ্গ পথে মুসলমান অনুপ্রবেশের কথা লিখে জগচ্চন্দ্র শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যা আমরা সমর্থন করতে পারি না।

যাই হক তুরুককাটা শহরে পূজার ঋতু পার হয়েছে, দীপান্বিতাও। একটা কৌতুকের কথা মনে পড়তে পারে। জগচ্চন্দ্র কি নিছক ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে লিখেছিল। অথবা কিছু তাকে প্রেরণা দিয়েছিল? কোনো পাগল-মানষি কোনো বেশ্যার কাছে যদি বরুয়ালি খেল অথবা ভোগীর কথা বলে থাকে, সে কি নিজেই বুঝতে পারছিল কেন তা সে বলছে? সেই বেশ্যা যদি কোনো দোকানদারকে গল্পটা বলে থাকে, তা হলে, জগচ্চন্দ্র সেই দোকানের ক্রেতা হলে, দোকানদারের কাছে গল্পটা শুনে, অনেকেই যে গল্প কিছু কিছু জানে সেটাকে গবেষণার ভঙ্গিতে লিখবার প্রেরণা পেয়েছিল সে?—এমন হতে পারে? কিংবা এমন হতে পারে যে বিষয়টা এক বিশেষ অঞ্চলে অনেকের মনে জোনাকির মত জ্বলে নিবে যায়, তা হঠাৎ একদিন যে কোনো একজনের মুখে স্পষ্ট শোনা যেতে পারে। অন্য ভাবেও বলা যায়। অধিক ফলনশীল আঁখ লাগান হচ্ছে, তত মিষ্টি নয় রস, কিন্তু বেশ মোটা মোটা হয়, বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি। সেগুলোকে লাগানোর জন্য পুরনো জাতের আঁখের খেত থেকে পুরনো জাতের সব চোপ তুলে ফেলে, আগুন দিয়ে জমি পুড়িয়ে নিয়ে, নতুন জাত লাগানো হল, কিন্তু বর্ষা পড়তে এখানে একটা ওখানে একটা করে সেই পুরনো জাতের অঙ্কুর দেখা দিতে পারে। অথবা মরুচমতীর চরটার কথা ধর। এক বর্ষায় দক্ষিণ পূর্ববাহিনী মরুচমতী দক্ষিণপূর্বের চাইতে বরং দক্ষিণে ঢুকে পড়েছিল, একটা বনকে, গোটা দুয়েক গ্রামকে, একটা বাঁধের মত পাকা সড়ককে ভাঙতে ভাঙতে-হঠাৎ 'দুর-ছাই' এরকম কিছু মনে করে পুরনো খাতে ফিরে গিয়েছিল। সেই পুরনো গ্রামগুলোর একটা নতুন তৈরি আকাশছোঁয়া পাকা সড়কের নীচে আর পুরনো খাত ঘেঁষে পাথর, লোহার জাল, শালখোঁটায় তৈরি বাঁধের মাঝখানে বালুর পাথার হয়ে জেগেছিল। সেই বালুর রাজ্যে প্রথমে কাশ, পরে হাতি ঘাস, আরও পরে ছোট ছোট কদম, শাল, শিমুল, সোঁদাল গাছ হচ্ছে। এসব কোথা থেকে এল তা বলা কিছু কঠিন নয়। মরুচমতী পাহাড় থেকে বন দিয়ে চলার সময়ে শিমুলের, শালের কল, সোঁদালের লাঠি, একটা দুটো কদম ফুলও ভাসিয়ে এনেছে হয়ত। কিন্তু হঠাৎ যদি সেই ঘাসের জঙ্গলে একটা ছোট গাছে লাল শিমুল ফোটে, কিংবা ছোট ছোট সোঁদালে সোনা রং দেখা দেয়—তা হলে অবাক লেগে যেতে পারে।

এখন শীত এসে পড়েছে এ কমই বলা হচ্ছে। শীত নয় শুধু ইলেকশানও। 'ফাগুন চৈতে হইবেই ইলেকশন, অঘ্রাণত ধান উঠি গেইলে হয়।'

ইটের ভাঁটাতেও কাজ হচ্ছে। যত লোক সাধারণত কাজ করে তার চাইতে বেশি লোক লেগেছে। একটা ভাঁটায় আগুন দেয়া হয়েছে। আর একটার জন্য ইট শুকনো হচ্ছে, বানানো হচ্ছে। ইলেকশানেই অনেক ইট লাগবে। অনেক ক্লাব হবে গ্রামে।

শহরে যে কত কাজ হবে কে আগে বলতে পারে? মোন্নাতের কাজের উন্নতি হয়েছে এই ছ সাত মাসে। এখন সে ছাঁচে কাদা পুরে ইট বানাতে পারে। সর্দার তাকে সাড়ে তেরর বদলে দশ দেয় হাজিরা। সে খুবই খুশি। তার টাকা জমে যাচ্ছে। খেতে দিনে পাঁচ টাকা লাগলেও, আর পাঁচ টাকা জমে। রাখে কোথায় এত টাকা তাই সমস্যা। সহকর্মীরা একদিন ধরে তার চুল দাড়ি কিছু ছোট ছোট করে দিয়েছে পূজার ভাঁটার আর সকলের মত সেও 'ফাটা কাপড়' কিনেছিল—একটা প্যান্ট, একটা শার্ট। শীত আরও বেশি করে পড়ার আগে সেই ফাটা কাপড়ের দোকানগুলো থেকে একটা সোয়েটার কিনবে।

মোন্নাত তার ভাঁটা থেকে একবেলা ছুটি নিয়ে স্টেশনের কাছে যাচ্ছিল যেখানে 'ফাটা কাপড়' ওয়ালারা নামতে পারে। তাদের কাছে কেনাকাটা করার এক সুবিধা সেই ফাটা কাপড়ওয়ালারা তার মতই হতশ্রী। ভাঁটা থেকে রেলস্টেশনে যাওয়ার জন্য শহরের ভিতরের পথ না ধরলেও চলে। রেললাইনের পাশ দিয়ে ধানখেত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যে পায়ে চলা পথ তা দিয়ে যাচ্ছিল সে। এতক্ষণ নির্জন ছিল পথ, হঠাৎ মানুষের গলার শব্দে সে নিজেকে সতর্ক করে নিল। তার ডানহাতের দিকের একটা আলের উপর দিয়ে দুজন মানুষ গল্প করতে করতে এগিয়ে এসে তার সামনে রেললাইনের পাশের পারে চলা পথটাকে ধরল। মোন্নাত মনে মনে বলল, একেবারে একা চলার চাইতে দলে থাকা ভাল। লোকের দৃষ্টি ভাগ হয়ে পড়ে, ঠিক একজনের উপরে তীক্ষ্ণ হয়ে পডে না।

তার সামনে সামনে যারা চলছে তাদের মধ্যে যে মাঝবয়সী তার পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি আলোয়ান, যে অল্পবয়সী তার পরনে প্যান্ট আর শার্ট। মোন্নাতের একবার মনে হল, মাঝবয়সী মানুষটাকে কি আগে সে কোথাও দেখেছে?

প্যাণ্টশার্ট পরা যুবকটি বলল, 'কাকা, ধানের তোমার ইগলা কি ছচকা? মাঝখানে কালা ভোগের চৌখোপ আর চারিপাশে হোলুদ পাকরি।'

কৈচন্দ্র বলল, 'আহবা, ধানোক বোলাইস কেনে।'

ভাইপোকে থামিয়ে দিয়ে ধানের জমিটা পার হয়ে সে বলল, 'আচ্ছা তা শোন। তুই না বিজ্ঞান পড়ছিস! ফুল থাকি রেণু যায়া না ফল। ভোগধানের ফুল থাকি পাকরির ফুলত রেণু যায়? কি না যায়? পাকরি বেশি ফলে ভোগ ফলে কম। তো এলা দেখ পাকরিত যদি সুগন্ধ হয়া যায় ভোগধান থাকি রেণু পড়ি, লাভ হইল কি-না-হইল।'

ভাইপো হো হো করে হেসে উঠল।

'হাসি কি ইয়াত?' কৈচন্দ্র বলল, 'আচ্ছা দেখ, তোর এই আইঅর—'

'আইঅর ? পাকরিও না হয় ?'

'অধিক ফলনশীল আইঅর। তো আইঅর আর তোর ভোগধান একই মাটিত হইছে একই সাথে মোলাই হইবে, একই সাথে সিজ্, পাছে একই সাথে মিলত যায়া চাউল হইবে। সেলা আইঅর ভোগ আর ভোগ আইঅর হয় কি না।'

'কাকা—!'

কৈচন্দ্র উত্তর না দিয়ে ভাবতে লাগল, বলল, 'দেখ পাছত কাঁয় আইসে। পাগলাটা দেখৎ।'

কৈচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ল। মোন্নাত কাছে গিয়ে পৌঁছালে তাকে বলল, 'তোমরা সেই পাগলাটা না হও ? মাথার বিষ কমছে বুঝি এলা। আচ্ছা, আচ্ছা, তো এলা নাম মনত আসছে ? মোর না-হয় তোমার-এ নাম।'

মোন্নাত বলল, 'ইটালু।'

'ইটালু ?'

'ইটালু ?'

'আচ্ছা। ভাল হইবে, ভাল হইয়া যাইবি ধীরে ধীরে।'

মোন্নাতকে সম্বোধন ভাইপোর মনোযোগ অন্যদিকে নেয়ার জন্যই। সুতরাং কৈচন্দ্র হাঁটতে শুরু করল। বলল, 'দেখ। হয় কি না-হয়। বাটার জুতা তো পিঁধছিস। আচ্ছা, ক, চামড়াটা দেখি কওয়ার পারিস কার ?—জবেহ করছে, না ফোলিডলের পোয়াল খায়্যা মরছে ? তো মোর ধান যেলা চাউল হয়্যা বস্তা করি কৈলকাত্তা যাইবে, কাঁয় কইবে আইঅর কি ভোগ ?'

'খ্যায়া বুঝির পায না ?'

'হুম্। তোর বুড়া ঠাকুদ্দা পাছিস। জোদ্দার পাছিস ? যে চৈ আর তেজপাতা দিয়া পোয়া পোয়া মাগুর রাঁধি টুকুস টুকুস করি ভোগ চাউলের ভাত খাইতে থাইকবে। আর বিহানত উঠি এক থাল কাঁচা ভৈষের দইঅত ভোগের চূড়া ছাড়ি সপাৎ সপাৎ করির খাইকবে। এলায় কৈলকাতাত জোতদার নাই কাঁউ। হুম্।'

কৈচন্দ্রর ভাইপো কৃষ্ণচন্দ্র হাসতে লাগল।

কৈচন্দ্র বলল, 'হাসিস ? কাকার কথাত হাসিস ? যাদবপুরত থাকি তুই কৈলকাত্তার মানুষ হয়্যা গেইছস দেখৎ। আচ্ছা এমন হবার পায়—তোর ডান পায়ের খান জবেহর আর বাঁও পায়ের খান ফলিডলের পোয়াল থাকি। বুঝির পাস ?'

'কাকা তোমরা ভ্যাজালদার হয়্যা গেইছেন।'

কৈচন্দ্র ভেড়ে উঠল। 'কি কলু ? এলাও ইঞ্জিনিয়ার হইতে তোর দুই শাল বাকি।

এলাই ভাইপো হয়্যা কাকাক ভ্যাজালদার কলু? জানিস এটেই বিশ বিঘা আছে মোর্ ভোগ আর আইঅর।'

'না-নেং তোমার জমি। মরি গেইলে দেখিস তোমার জমি বেচি দিছি।'

কৈচন্দ্র বলল, 'রে পাগলা, তুঁই দেখ। ইমরা ভাইপো হয়্যা কাকার জমি বেচি দেয়। ইটালুরে দেখ, ইমরায় আপ্ত-কাকাক মরি যাওয়ার কয়।'

কৈচন্দ্র একটু রাগ দেখিয়ে হাঁটতে লাগল। কিন্তু দু-মিনিটেই গতি কমিয়ে সে কৃষ্ণচন্দ্রকে কাছে আসার সুযোগ দিল। কৃষ্ণচন্দ্র পাশে এলে সে বলল, 'যেমন বাপ, তার তেমন ছাওয়া। ভোট আসি গেইছে আর খারাপ ডাক ডাকির ধৈরছে। তুঁই ভাবছিস কামতাপুরীরা এবার জিতি যাইবে? হুম্। পাগলারে, ইটালু, ভোটত নাম লিখাছিস? ভোট বুঝির পাইস? শহরের মানষি ভোট দিবু না কেনে?' কৈচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রকে বলল, 'আমরা কই দিল্লি, তো তার থাকি শিখি উমরা কয় কৈলকাতা বঞ্চনা করছে। হইবে তাত ভোট? মুখ ভ্যাঙ্গাইলে ভোট হয়? ক, ইটালু, তুঁই যেদ্‌ মুখ ভ্যাঙ্গাইস, তোক কাঁউ ভদ্রলোক কইবে? কিন্তুক ইয়াত আসল কথা তো কওে নাই। উমরা কইবে কামতাপুর চাই, কামতাপুরী ভাষা চাই, তো আমরা কও ফির উমর দেশভাগ করির চায়।'

ইটালু বলে ফেলল, 'তাহ কি হইবে?

কৈচন্দ্র হাসল, টকাস করে তুরি দিল। বলল, 'কি হইবে? যারা দেশ ভাগ হয়্যা এটে আসছে উমরায় না ছিকটি পারসেন্ট। উমরা ফির দেশ ভাগ করির দিবে? কাক ভোট দিবে কে?'

কৈচন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে কিছু বলবে ঠিক করল, কিন্তু তার আগেই কৃষ্ণচন্দ্র বলল, 'পাছে ভোগী না হন তোমরা।'

কৈচন্দ্র বলল, 'ও হো। সেই কারণত তুই কাকার জমি বেচি দেয়া ঠিক করছিস। ধরি নিছিস কাকা ভোগী হয়্যা গেইছে? আহবা! এটে কাঁয় বা বরুআলি খেল, কাঁয় বা ভোগী? মোওয়ামারিত তিনজনা গেইছে, তার একটা মোহম্মদী আর দুইটা রাজবংশী; গোঁসাইথানত তিনটা গেইছে তার 'দুইটা রংপুরিয়া' আর একটা রাজবংশী। বরুআলি খেল হইল? তুই কামতাপুরী হয়্যা গেইছিস। ইয়াক কয় বদলা। আচ্ছা, আচ্ছা, কাঁয় ভোগী? হাদলা বর্মনর না হয় আট বিঘা জমি ছিল, না হয় জোতদারের হয়্যা ধান আদায় করি দিছে, ভোট করি দিছে। ত ভোগী হইল? আচ্ছা, আচ্ছা, তুঁই দেখিস নাই। হাতকাটা দেবীক দেখছিস? ভদ্রলোক যাক কয়? ত যা শিখার মুই তারটে শিখছং। শহর থাকি আসি গ্রামত ঘুরছে, চাষীর সাথত বসি

আউস-ভাত আর কচুর শাক খাছে। উমরার হাত কাটি দিছে। উমরায় ভোগী ? আচ্ছা, আচ্ছ', গুটুঙ্গামারিত পূজার আগত প্রধান আর দুইজনা গেইছে। ভোগী কবু প্রধানক ? কেন গেইছে ? ভোগী বলিয়া। কারণটা কি ? দৌড়াইছে, ত বয়স ত খানেক হইছে। তখনত পা বাধি পড়ি গেইছে। ব্যস। তখনত পা না-বাইখলে ?...নে তোর ফাটা কাপড়া আসি গেইছে।' কৈচন্দ্র তুরি দিল।

কৈচন্দ্র, তার ভাইপো কৃষ্ণচন্দ্র, তাদের পিছনে কয়েক পা দূরে মোন্নাত-ইটালু। তুরুককাটা রেল স্টেশনের বিপরীত দিকে মাঠের মধ্যে, রেল স্টেশনের চত্বরের এদিক ওদিকে অন্তত আটদশজন ফাটা কাপড়ের হকার, হাতে, কাঁধে নানা রঙের রঙিন জামা, প্যান্ট, সোয়েটার, ফ্রক, গাউন বিক্রি করছে। উজ্জ্বল রং দেখে নতুন মনে হবে, কিন্তু হাতে নিলে ইস্ত্রিভাঙা, দলানো মোচড়ানো। কৈচন্দ্র তার ভাইপোর জন্য এ হকার সে হকার করে সোয়েটার আর প্যান্ট দেখে বেড়াচ্ছে। মোন্নাত পায়ে পায়ে চলে হকারদের মধ্যে এসে পড়েছিল। তাদেরকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড়ই। পূজার আগে জামাপ্যান্ট কিনবার জায়গাটা নির্জন ছিল, হকার একজনই ছিল, মোন্নাতের সঙ্গেই বরং ইটভাটার দু-চারজন কুলি ছিল। মোন্নাত জড়ের মত থাকলেও, তারাই তার জন্য প্যান্ট আর শার্ট পছন্দকরে দিয়েছিল, দামও ঠিক করে দিযেছিল। এখানে এত লোকের মধ্যে যদি সে ঠিক রং পছন্দ করে ফেলে, যদি দাম দস্তুর করে বসে, যদি পকেট থেকে টাকা বার করে ঠিকঠাক গুণে দিতে পারে ? মোন্নাতের নিজেকে ভয় করতে লাগল। নিজেকে সতর্ক করতে শুরু করল সে। একি হয় যে তার মাথার যন্ত্রণা সত্যি আস্তে আস্তে কমে আসছে ? সে সুস্থ হওয়ার পথে ?

কিন্তু আবার যোগাযোগের সম্ভাবনা হতেই সে তার সুযোগ নিল। সে কৈচন্দ্র আর কৃষ্ণচন্দ্রর খুব কাছে কাছে ঘুরতে থাকল যাতে তারা এদিক ওদিক ঘুরলে ছোঁয়া লাগে, সে চোখে পড়ে যায়। সে রকমই হল ব্যাপারটা। কৈচন্দ্র বলল, 'কি রে কাপড়া কিনবু ?'

কৃষ্ণচন্দ্র নিজের জন্য একটা নীল রঙের সোয়েটার পছন্দ করছিল, মোন্নাত আঙুল দিয়ে সেটাকে দেখাল। কৈচন্দ্র বলল, 'সোয়েটার কিনির চাস। টাকা লাগবে রে। পঁচিশ ত্রিশ লাগি যাইবে।' মোন্নাত এ পকেট ও পকেট খুঁজে ছোট ছোট নোট, খুচরো পয়সা বার করে হাতের তেলোয় রেখে কৈচন্দ্রকে দেখাল। তখন কৈচন্দ্র বলল, 'বস দামদর করি কিনি দেঙ্‌ একটা তোক।' কৃষ্ণচন্দ্রর নীল সোয়েটার কেনা হলে, কৈচন্দ্র অন্য হকারের কাছে গেল। তার কাছে নানা রঙের সোয়েটার ছিল। নীল আর সবুজের মাঝামাঝি রঙের একটা দেখিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, 'এটা নিবু।' মোন্নাত

ঘাড় নাড়লে, কৈচন্দ্র দামদর করে সেটাকেই কিনল মোন্নাতের জন্ম। বলল, 'একটু বড় হইবে। ত সাবান পানিত ধুইলে খানিক ছোট হইয়া ঠিক হইবে।'

সোয়েটার কেনা শেষ হলে কৈচন্দ্র আর তার ভাইপো শহরের দিকে ফিরল। খানিকটা দূ। তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে চলে দেখতে পেল পাগলটা তখনও তাদের পিছনে পিছনে আসছে। তারা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখল, তখনও সেই ইটালু তাদের সঙ্গ ছাড়ে নি। কৈচন্দ্র হেসে বলল, 'কি রে পাগলা, আমরা ত সোয়েটারটা ডাইং কিনিত দিবার যাই, তুঁইও কি তোরটা তাই করিস?' মোন্নাত ঘাড় নাড়ল।

তুরুককাটা শহরের আদালত অঞ্চলে ঢুকে কৈচন্দ্র সত্যি একটা ডাইং ক্লিনিংয়ে গেল। কৃষ্ণচন্দ্রর নতুন কেনা সোয়েটারটা ধুতে দিল। বলল, 'পয়লা ডিটল পানিত ধুবেন পরে যা করার করেন, রং যেন নাই উঠে।' দোকানাদার কৃষ্ণচন্দ্রর সোয়েটার জমা নিয়ে রসিদ দিলে কৈচন্দ্র তখনও দাড়িয়ে থাকা মোন্নাতকে বলল, 'কি ধুইস তোর সোয়েটার? টাকা লাগিবে কিন্তুক, পাঁচ টাকা লাগি যাইবে।' মোন্নাত আগের মতই ঘাড় নাড়ল। তখন কৈচন্দ্র মোন্নাতের সোয়েটার দোকানিকে দিয়ে বলল, 'রসিদ লিখি দেন পাগলারে, তোর এলাও নাম মনত রাখছিস? আচ্ছা! ত, লেখেন ইটালু। ইটালু কি রে? আচ্ছা, বর্মনই লিখি নেন। উমরার অত মনত নাই। ইটালু বর্মন হইল। কিন্তু দোকানি ভাই, কয়া দেও তোমাক, পাগলা বলি যদি কাপড়াটা মারি দেন ভাল হইবে না। মোক চিনেন কি? ত লিখি রাখেন, ইটালু বর্মন, ক্যারপ্ সভাপতি সাহেব ডাউকিমারা ব্লক।'

দোকানী গুঁইগাঁই করে ধুতে দেয়া কাপড়া কেন মেরে দেবে এসব কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কৈচন্দ্র বলল, 'বস্ বস্।' সে রসিদটা মোন্নাতকে দিয়ে দোকানীকে বলল, 'মনত রাখেন ইমরায় আমার ভাতিজা, উমরায়ও আমার ভাতিজা। কি করা যায়? একটা পাগলা হইলে দুসরাটাও পাগলা হইবে।'

কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিবাদ করল, 'কাকা—'

'বস্ বস্। তো, ইটালু, যদি ডাইং কিনির পাঁচ টাকা যোগাড় করির না পারিস ডাউকিমারির ব্লকত যাবু। জিআরের টাকা দেও। হইবে তোর কাপড়া ধোয়া। আর শালা তোর ভোটর কাগজও ঠিক করি দেও। যাইস কিন্তুক, হাঁ।'

কৈচন্দ্র হাসতে হাসতে ভাইপোকে নিয়ে অদূরের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল।

মোন্নাত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আবার কি কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে অনুভব করল, কেউ যেন পালাচ্ছে। ইটালু কি? তার এরকম অনুভব হল

তার আগে আগে কেউ হাঁটছে। সে হাঁটতে সুরু করল। ওহ, ইটালু দেখছি শহরে ঢুকে পড়ছে। সে এরকম অনুভব করল দেখা যাক তো সত্যি ইটালু পারে নাকি শহরে ঢুকে যেতে। অদূরে ত শহরের কেন্দ্রস্থল। আদালত, সরকারি অফিস, কি কালো কোট উকিল, মক্কেল, খাকিকোট পুলিশ, কালচে কালচে জিফ গাড়ি আর ভিড়, আর বোধহয় সবচাইতে বড় চায়ের দোকান। দেখো ইটালু চায়ের দোকানটার দিকে যাচ্ছে। মোন্নাত এ পকেট ও পকেট থেকে খুচরো পয়সা, ছোট ছোট নোটে কয়েক টাকা বার করে ইটালুর হাতে দিয়ে ঠিক করল ইটালুর গায়ে গায়ে লেগে থেকে দেখতে হবে ইটালু ওই শহরের মানুষদের ভিড়ে ঢুকে যেতে পারে কিনা।

মোন্নাত সেই চায়ের দোকানের সামনে এগিয়ে ধরা হাতের তেলোয় টাকা পয়সা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে এক পুলিশের দারোগা চা খেয়ে বেরতে বলল, 'আহা, পাগলাটা বোধ হয় খেতে চায়। পয়সাও যোগাড় করেছে দেখছি। দাও না ওর পয়সায় যা কুলায় তা খেতে।'

তখন চায়ের দোকানের হেড-ছোকরা বেরিয়ে এসে মোন্নাতের হাতের টাকা পয়সা গুণে নিয়ে বলল, 'ভালোই হবে রে খাওয়া। আয় ভিতরে আসি বইস।'

তিন্নির তুরুককাটা শহরে পৌছাতে এক বছর লেগে গেল। পথে সে আরও দু-একটা শহর দেখে এসেছে। মাস ছয়েক আগে তার একবার গর্ভপাত হয়েছে। কারণ সে ভৈষী ছুটোর মতই যদি শুকনো দিনে গাছতলাতেই থাকো, অথবা বর্ষা-বাদলের দিনে মূল্য কমে যাওয়া রেল স্টেশনের পরিত্যক্ত পার্শেল গুদামের ছাগলের নাদ ছড়ানো বারান্দাতেই থাকো, অথবা ভিখারী হও, উন্মাদ হও, রোয়াগাড়া কামলা হও, বাড়ির দাসী হও, অসুস্থ হও, এক বোধ হয় কুষ্ঠী হওয়া ছাড়া রেহাই নেই। বোধহয় কুষ্ঠীরও রেহাই নেই। ভাগ্যে সে সময়ে সেই রেলের জমাদারনি পার্শেল গুদামের পাশে জমে থাকা রেলের ইস্পাতের টুকরোটাকরা সরাতে এসে তাকে রক্তে ভেজা অবস্থায় দেখে ফেলেছিল। দুটো মোষের মধ্যে ধাড়ীটাকে বিক্রি করেছিল জমাদারনী পরে। হয়ত সেই তিনশ চারশ টাকার প্রকাণ্ড ভৈষীটাকে দুশতে বিক্রি করেছিল। কিংবা হয়ত একশ লাভ রেখেছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের সেই বিপদে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কাজ করেছিল। তিন সপ্তাহ ডাক্তারি চিকিৎসার খরচ করেছিল। একটা মোষ আছে। সেটা গাবুর হয়ে উঠেছে। তিন চার বছর হল। কিন্তু তার দুবছরের ছেলেটা নেই। খোলা আকাশের নীচে জল বৃষ্টির দিন। কি হল কে জানে। আর তার সেই কোমরে গোঁজার কাটারীটা নেই। কি হয় তার ধারে। কিছু ঠেকাতে পারে না শহরে।

আর এই শহরে আসতে হবে তার কি কথা? এখন সে শুনেছে এই শহরের নাম

তুরুককাটা, যেমন নাকি শিলিগুড়ি নাম আছে এক শহরের, কৈলকাতা নাম আছে আর এক শহরের। তার বাড়িউলি ভাটিয়া সেই মাসী ইতিমধ্যে একদিনে বলেছে তাকে শিলিগুড়িতে গেলে মেয়েদের আরও লাভ, কৈলকাতায় তার চাইতেও বেশি। আর তার তো এই চার হাত লোহার শরীর···। শহর খুঁজে দক্ষিণে চলতে থাকলে চলতে থাকলে এই শহরে পৌঁছাবেই। ছেলেটা না থাকলেই বা কি, কাটারীটা না থাকলেই বা কি? এই শহরে সে থেকে যাবে তা কি সে জানত? শহরে ঢুকবার মাইল খানেক আগে সে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিল—এদিকে কোনো শহর আছে কি না। সে বুঝতে পারে নি দূর থেকে তাকে দেখেই সেই ভদ্রলোক সেই লালরঙের ফটফটিয়া গাড়ি থেকে নেমেছে। দূর থেকে বোঝা যায় নি, সেই ভদ্রলোকের গালে একটা বেশ স্পষ্ট কাটা দাগ, আর এক হাতের কয়েকটা আঙুল নেই।

আর সেই থেকেই বাড়িউলি সেই ভাটিয়ার বাড়ির পাশে তারও ঘর হয়ে গেছে। তা ছাড়া সবই ভাগ্য, সবই যোগাযোগ। কেনবা সেই এক কুড়ি তিনচারি ছোকরা বলে শহরৎ যাও, কেন বা সে তার কথা শুনে শহরেই আসতে থাকে, কেন বা সেই জমাদারনী লোহা কুড়াতে এসে তাকে দেখতে পায়, আর কেনই বা সেই রেলের জমাদারনী আবার ছোট হাসপাতালেরও জমাদারনী, শেষ কথা কেনই বা সে বিটিছাওয়া। সব সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু একি কারও কাছে বলা যাবে, কোনো পুরুষ স্ত্রীলোকের শরীরের বদলে মুখটাকে ব্যবহার করে।

পৌষের শীত, বিষম শীত। মোল্লাত-ইটালু তার নীলচে সবুজ সোয়েটার এনে পরেছে। আর তার ইট ভাটায় এখন কাজ হচ্ছে বটে নতুন ইট বসানোর চাইতে ইট বিক্রি বেশি। মোল্লাতের তাতে আবার শহরে যাওয়ার সুবিধা হয়েছে। সে কখনও কখনও ইটের ট্রাকের কুলির কাজও করছে। ইট তোলে ট্রাকে, সাজায়, ইটের ডেলিভারি দিতে চলে যায় ট্রাকে। ইট নামায় সেখানে। দু-একদিন আদালত পাড়ায় চলে যায়। চায়ের দোকানে ঢুকে গল্প শোনে। কথা বলে না এখনও। বাজারে চলে যায়, এটা সেটা কেনে। কোন কাজ না থাকলেও শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন সে বাজার আদালতের মাঝখানে খুব হৈচৈ গণ্ডগোল শুনতে পেল। মাইকে গান বাজছে। সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দাঁড়াল। পাশের একজন বলল, 'কি রে, পাগলা, আসছিস?' মোল্লাতের অবাক লাগছে গমগম করা মাইকের গল্পটা শুনে, কামতাপুরী পার্টি নাকি এই জায়গাটায় কোনো এক কামতাপুরী রাজার নামে বেদী স্থাপন করতে চেয়েছিল, বেদীর উপরে একটা স্তম্ভও। অন্যেরা তাদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথের একটা মাটির স্ট্যাচু বসিয়েছে। পরে পাথরের স্ট্যাচুও হবে। সেই

স্ট্যাচুর উদ্বোধনের গান। কে একজন আর এক কবির লেখা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবিতা পড়ল। তারপর গান শুরু হল নতুন করে। 'এবার দেববত বসুর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত —'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু—।' হঠাৎ মোন্নাত নড়ে চড়ে উঠল। সোয়েটারের গলার কাছে আঙুল ঢুকিয়ে বুকের উপরে বুলাতে লাগল, গান চলতে থাকলে ফোঁপাতে শুরু করল। মোন্নাত নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, থেমে যাও, থেমে যাও। সে চেষ্টা করল যেন কান্নার শব্দ না বেরয় ফাঁক হয়ে যাওয়া ঠোঁট থেকে। চোখ দিয়ে ত জল পড়ছেই। জোর করে ফাঁক হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটোকে এক করতে গিয়ে যেন চোয়াল আটকে যাবে তার। একজন বলল, 'দুর পাগলা ইটা কান্নার গান না হয়। আচ্ছা, খানেক বাহার থাকি ঘুরি আয়। পরে কান্নার গান হয় কাঁদি নিস।'

মোন্নাত বাইরে চলে এসেছিল। সে সোয়েটারের গলার কাছে হাত বুলিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। সুপ্রিয়র গান। আদালত থেকে ফিরবার পথে পুলিশ জিপ থেকে লাফিয়ে পড়ার আগের বিকেলে করেছিল। ওয়ার্ডাররা, দণ্ডিতরা, হাজতের লোকেরা সে গান শুনতে ভিড় করে এসেছিল। আবার গাইতে বলেছিল তাকে। সে গান কি ওয়ার্ডার আর সান্ত্রীদের তারা স্ফূর্তিবাজ বলে তাদের কড়াকড়ি শিথিল করতে?

পরপর কয়েকদিন মোন্নাত সকালে কুয়াশা থাকতে সেই নীল নীল কুয়াশার মধ্যে বেড়াল। নীল ছিল সুপ্রিয়র আকাশ।

কে যেন মরে প্রমাণ করেছিল সে মরে নি। মোন্নাত কি পাগল হয়ে প্রমাণ করবে সে পাগল হয় নি? সে ত কুয়াশার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে রোজই অনুভব করছে বাড়ি ঘর, গাছপালা, রাস্তাঘাট যে যেখানে থাকার ঠিকই থেকে যায়। সব সময়ে একই কথা মনে থাকে না, তার অর্থ এটা নয় যে কথাটা মনের থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে চিরকালের জন্য। আরও কৌতুক আছে, কুয়াশার আড়ালে গাছগুলো যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না? কারও চোখে না পড়লেও ফুল ফুটতে থাকে। যেমন কালই মোন্নাত দেখেছিল রাস্তার ধারে ক্যাশিয়া গাছে একটু একটু ফুল ফুটতে শুরু করেছে। এই শীতে ফোটা উচিত নয়। এমন হতে পারে, হয়ত সেই ক্যাশিয়াগুলোর ছিম আর লাঠি পাহাড়ের সেই অংশ থেকে নেয়া যেখানে বসন্তের তাপমাত্রা এই সমতলের পৌষের শীতের মত। গোলাপি, হলুদ—

কয়েকদিন থেকে সে বাজারে গিয়ে কোনো দোকানের সামনে ফাঁকা বেঞ্চটেঞ্চ পেলে অনেকক্ষণ ধরে সেখানে বসে থাকে।

'আচ্ছা রে, পাগলা, এই শীতে তুই ভালই থাকিস, না?'

'আচ্ছা রে, পাগলা, গরমে যা করিস ভাবিস, এই শীতে কি তোর মনে থাকে?'

'তোর নাম তো ইটালু। তুই সকলকে বলছিস, তুই ভাতিজা। মনে আছে ?'

বলত, রসগোল্লা ভাল, না বিস্কুট ভাল।'

'বিস্কুট।'

'আচ্ছা, ইটালু, তুই বলির পারিস কাঁয় জিতে ভোটত ? কামাতাপুরী ? না—'

'সগায় জিতবে।'

'আচ্ছা রে, ইটালু, পৌষর শেষত ঝরি হইবে কি না হইবে, কবার পারিস ?'

'মাঘের শেষত হইলে ভাল হইবে।'

বাজারের এ দোকান সে দোকান থেকে যে দোকানদার কয়েকজন মোন্নাতের সঙ্গে কথা বলছিল তারা তার এই শেষ কথাটায় অবাক হয়ে গেল। এই রকমই ত প্রবাদেও বলে।

সেদিন তাকে বোধ হয় অনেকে অনেকবার পাগল বলেছিল। কুয়াশায় নয়, ভরদুপুরে চলতে চলতে হঠাৎ তার মনে হল—আরে, সে কি সত্যি পাগল ? সে কি পাগলের ভান করছে না ? এই শহরটা কি তা হলে কিছু না ? দূর, সে পাগল হবে কেন। সে একটা পথের ধারের গাছকে জড়িয়ে ধরল। হে গাছ, হে আকাশ, হে পৃথিবী আমাকে পাগল হতে দিও না। সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। যা হবে, তা ত এই শহরেই হবে। তার আগে তাকে সব প্রবেশপথ, সব প্রস্থানপথ চিনে রাখতে হবে না কি ?

একদিন সে বাজারে বসেছিল, বাজারের মধ্যেকার এক চায়ের দোকানের সামনে। এরকম সময়ে তার অনুভব হল কেউ যেন তার খুব কাছে এসে ডাকছে তাকে, কিংবা কথা বলছে। মোন্নাত ফিরে দেখল স্কুলের ছাত্রীর মত ফ্রক পরা, রক্তলাল ঠোঁট সেই বেশ্যাটি কিছু বলছে তাকে।

'পাগলাটা না-হইস ? চিনির পাইস ? বাপুরে, ভাল জামা পিধছিস ? কাঁয় দিল তোক জামা।' খিলখিল করে হাসল সে। মোন্নাত বলল, 'কাঁয় দিবে ? মুই কিনছং।

বেশ্যাটি সারা গা দুলিয়ে হেসে উঠল। 'মোক চিনির পারলু ?'

মোন্নাত বলল, 'মোক না তুঁই ভাত রাঁধি খোয়াছিস রে, দিদি।'

'হয় তো।'

মোন্নাত ভাবতে চেষ্টা করছিল, আর ভাবতে গিয়ে মিট মিট করে হাসছিল ! সে আর এই বেশ্যাটি একই রকমের হতভাগা, আর পাগলও বোধ হয় পাগল না হয়ে যায় না।

কিন্তু দৃশ্যটাই বদলে গেল। মোন্নাত হাঁ হয়ে গেল। চার হাত লম্বা একজন শ্যামল-সবুজ স্ত্রীলোক যার পরনে সূক্ষ্ম গোলাপি শাড়ি, যার কোমরে দস্তার তৈরি চওড়া বিছে

হার, গলায় কানে গিলটির গহনা, গায়ে জামা দেয় না বলে বুক আঁচলের তলায় যেন শিশু খেলা করছে। চরাচর যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মোন্নাতের মনে হল সেগুলো চোখ ওঠে নি এমন দুটো কালো কুকুর ছানা। গা গুটিয়ে ওঠে।

সে যদি স্বাভাবিক পঁচিশ ছাব্বিশের এক যুবক হত হলে ব্যাপারটার তুলনা দিতে সহজ হত। সে, তা হলে, নিরন্ন হতভাগ্য পরিবারে এমন এক ভাই হত যার বোন যে ভাত রেঁধে খাওয়ায় তার দিকে দৃক্‌পাত নেই, নিজের আর্ট নিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অথবা সে এক এমন কবি যে ধনী ও বলবানের প্রেমিকা এক বিপুলদেহী বেশ্যার মত নোংরা শহরকে কিশোরী প্রেমিকা মনে করে। কিংবা মোন্নাত ত তেমন একজন যুবকই যে, দুঃস্থ পিতা যখন ভাবছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ফেরৎ ছেলে এসে তার ব্যর্থশ্রমে ভাঙা জীবনটার অবলম্বন হবে, সব কিছু ছেড়ে কি এক আদর্শের পিছনে বেরিয়ে গেল।

মোন্নাত অদ্ভুত কাজ করে বসল। সেই অদ্ভুত চেহারার, ভত লম্বা, তত বেঁটে, বেশ্যা দুজনের পিছনে সম্ভর মত মুখের চেহারা নিয়ে কিন্তু স্পাই এর মত সতর্ক ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল—যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হল তারা তার পূর্বপরিচিত বেশ্যা পল্লীতেই ঢুকছে সড়ক থেকে নেমে। স্পাইএর মত চারিদিকে চোখ রাখতে রাখতে চলছিল বলে সে দেখতে পেল পথের ধারে লাগানো ছোট ছোট ক্যাশিয়া গাছগুলোতে কুঁড়ি আসছে শীত হলেও। এদিকে বোধহয় রাধাচূড়া বলে লালগুলোকে আর হলুদগুলোকে সোঁদাল।

শহরে ফিরে এল মোন্নাত। বাজারের কাছে পৌঁছাতে ভক্‌ করে গন্ধটা পেল সে। তার ভয়ঙ্কর সন্দেহ হল সে পচে যাচ্ছে। হাত, বাহু, এক এক করে গোপনে নাকের কাছে তুলে সে শুঁকে দেখল। তা হলে পথের ধারের পুকুরটা থেকে আসছে পচা গন্ধটা? ছোট পুকুরে নীলচে সবুজ জল। কি এক রকম ছত্রাক, যার এই গন্ধ। সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। বেলা হয়ে যাচ্ছে। আবার একটা পচা গন্ধ পেল সে। সব পচে যাচ্ছে। আশ্চর্য! সে চারদিক চেয়ে দেখল। যে পয়সা-হোটেলে মাঝে মাঝে সে বাসি ভাত আর ডাল এক দেড় টাকায় পেয়ে যায়, তার পিছন দিকে এসে পড়েছে সে। এটা নিশ্চয় হোটেলের ফেন, মাছের ভুতুরি, বাসি তরকারি-টরকারি ফেলে দেয়ার ড্রেন। সে ভাত না খেয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

আর সে সময়ে দেখতে পেল। হোস্টেলে মোদনাথের ঘরে তখন রাত আটটা। জনতা স্টোভের কাছে নিচু হয়ে বসে কালি চায়ের জল ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। তেল না থাকার মত। মোদনাথও নিচে নেমে বসেছে, হাওয়া আটকে জনতার তাপ বাড়াবে যেন। দুজনের মত চায়ের জল হয়েই গিয়েছিল। তৃতীয় জন আসতে খানিকটা কাঁচা জল আবার কেটলিতে দেয়াতে দুর্ভোগ। সেই তৃতীয় জন, সুহাস যে মোদনাথের

বিছানায়, বলল, 'আরে ফুঁ দে না, আপনি জল ফুটবে।' কালি বলল, 'শ্লা, এটা তোমার কাঠের উনান পেয়েছ?' মোদনাথ কেটলির ঢাকনা তুলে উৎসাহে বলল, ধোঁয়া হচ্ছে রে। এক কাজ কর, চাব পাঁচ কাপের মত পাতা দে, তা হলে আধাগরম জলেও লিকার হবে।' সুহাস বলল, 'তোদের ধৈর্যের বড অভাব।' কালি বলল, 'কে তোকে আসতে বলেছিল, শ্লা। যা ঘব থেকে চিনি নিযে আয। চিনিও কম পডবে দেখছি।' সুহাস মন্তব্য করল, 'জানতাম। মোদু চিরকালই তালকানা।' চা হযেছিল। দুটো কাপে, আর একটা গ্লাসে তিনজনেই চা নিয়েছিল। সেই লাল টকটকে চাযে প্রথম চুমুক দিয়েই সুহাস গা ঝাঁকিযে বলেছিল, 'খুন করলি, শ্লা, এ চেরতার, মাইরি, জবাব নেই। একটু দুধ দে না।' কালি তেড়ে বলল, 'আরে আমার মানিকরে, তোমার জন্য দুধ আনতে এই মাঝরাতে গার্লস হোস্টেলে যাবো।' তারা চা খাচ্ছে এমন সমযে হুড়মুড় করে রতন এসেছিল চেঁচাতে চেঁচাতে, 'সুখবব, সুখবর, কই মোদনাথ, খাওয়া-টাওয়া, শালা কি কিপটেরে।' সুহাস বলেছিল, 'কি খবর রে? খোকা, না খুকু? ঠিক, জানতাম। সিক্সথ্ ইয়ারের সেই খাশিয়া চেহারার আল্লাদি মেয়েটা ত। মাইরি, মোদু, শালা ছোটবেলা থেকে সোনা খেয়ে যে রং বাগিয়েছিস!'

রতন বলল, 'বা, একি বে ভাই, আমার চা কই? মোদু এই সেমস্টারে সিক্স্টিটু পার্সেন্ট পেয়েছে।' 'বলিস কি? সকলেই সমস্বরে বলেছিল, আগের দুটোতে ত ফরটি পার্সেন্ট ছিল কোনোরকমে।' 'সুপ্রিয় খবর পেয়েছে।' রতন জেতেযুতে বসে বলল, 'আরে সেই ত করিয়েছে। সেই কমরেড প্রফেসর আর কমরেড রিডারের কাছে বলে এসেছিল মোদনাথ আর নিরপেক্ষ নেই, দস্তুরমত আমাদের দলে, জেনারেল সিটে দাঁড়াবে এবার। সে রকম পোস্টারও দিয়েছে দু-চারখানা, ওই সুপ্রিয়ই।'

সকলেই যেন চুপ করে গিয়েছিল। মোদনাথ চা খাচ্ছিল না। তার পেয়ালাটা নিয়ে রতন খেতে শুরু করে রসিকতা করল, 'বড্ড এনেমিক হয়ে গেছি, দে একটু রক্ত খাই, মাইরি। সুপ্রিয় দেখগে, বই বাজিয়ে রবীন্দ্র গান করছে।' কিন্তু তাতে সেই নীরবতা দূর হল না। অনেকটা পরে সুহাস বলল, 'কি নোংরা, মাইরি। আমেরিকার মেয়েদের শুনেছি যোনিমূল্যে 'এ' ক্লাস পেতে হয়। আর এখানে? কোনটা যে বেশি নোংরা!' কালি বলল, 'এটা কি হঠাৎ দেখছ? আর একবার ভেরিফাই মাত্র করা গেল। কোথাকার কোন কলেজের বাংলার মাস্টার যখন ভি সি হয়ে আসে তখন বোঝ নি?' অনেক পরে মোদনাথ বলেছিল, 'তা হলে বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কি উপায় আছে? কি নোংরা একটা জাতের সাহিত্যবোধ, রুচিবোধ, রূপবোধ রাজনীতির জন্য—'

বেরিয়ে তারা পড়তই। এক মাস আগেই সুবল আর রাতুল একদিন বেরিয়ে

গিয়েছে। একসঙ্গে সকলে খসে পড়বে না বলেই একটু দেরি করে করে একে দুয়ে বেরিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। শুধু এই নোংরামি মাত্র দেখেই তারা বেরিয়ে পড়ে নি। তা হলেও সেটা যেন সুন্দরের, শোভনতার, ন্যায়ের শেষ টিকা।

হন হন করে হোটেলটাকে আর তার দুর্গন্ধকে ছাড়িয়ে এসে মোন্নাত একটা মনোহারী দোকান দেখে যেন বুদ্ধি পেল। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, ব্লেড আছে, বেলেড ?' দোকানি বলল, 'দেখো কাণ্ড! তোমরাও দাড়ি কামান? ঐটা না করেন, পাগলা। নাউ, নাপিত, দেখি নেন। এত দাড়ি বেলেডে বনে না।'

তা সত্ত্বেও সিকি ডজন ব্লেডের পয়সা এগিয়ে দিয়ে ব্লেড কিনল মোন্নাত।

কিন্তু···রাতুল, কালি, শ্যামল, সুবল, রতন, সুহাস···

মোন্নাতের আঙুলের ফাঁক গলে গলে ব্লেডগুলো মাটিতে পড়ে গেল।

আর কর্নিহারের সেই অ্যাকশনের বাতে জঙ্গলের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে সুপ্রিয় বলেছিল, 'আর মোনু, তোকে আগে থেকে বলি আমার সম্বন্ধে মনে রাখতে হলে মনে রাখিস—আজকের এই জোতদারও আমার শত্রু নয়, আমার শ্রেণীর শত্রুও নয়, আমাদের আর সকলের মতই একটা উদ্দেশ্য মাটার। মহাভারতে কেউ কারও শত্রু ছিল ?'

কিন্তু পরদিন যখন ভোর হচ্ছে, চারিদিকে কুয়াশা, মোন্নাত তৈরি হয়ে নিল। ইটভাটার ইট সাজিয়ে তৈরি ঘরের মেঝে খুঁড়ে সে টিনের কৌটাটা বার করল। তার মধ্যে প্লাস্টিকের একটা চ্যাপ্টা বাক্সে তার সঞ্চয়। এসব ত অন্য কুলিদের কাছে দেখেশুনে শিখেছে। হাঁপানির কষ্টের ভয়ে একটা কম্বল কিনেছিল সে। টাকার প্লাস্টিকের বাক্স থেকে কিছু টাকা সোয়েটারের নীচে জামার পকেটে, কিন্তু বেশিরভাগ টাকা সমেত প্লাস্টিক বাক্সটা গামছায় শক্ত করে বেঁধে গামছাটাকে সোয়েটারের নীচে কোমরে বাঁধল। কম্বলটায় তার আর এক প্রস্থ ছেড়াখোঁড়া জামা প্যান্ট রেখে এমন পুঁটুলি বাঁধল যাতে বাঁধনের ফাঁক দিয়ে একটা হাত গলিয়ে পিঠের উপরে রাখা যায়। তার ঘরে মাটি কাটা যায় না কিন্তু কাদা মাখতে সুবিধা হয়, ফলাটা ছোট হয়ে গেছে এরকম একটা কোদাল ছিল। পুঁটুলি পিঠে, কোদাল কাঁধে পৌষের কুয়াশায় সে বেরিয়ে পড়ল।

তিন্নিক সে আগের দিনই তার নিজের ঘরে ঢুকতে দেখেছিল। ঘরখানা অন্যগুলো থেকে কয়েক ফুট দূরে। কুয়াশার মধ্যে থেকে তখন রোদ উঠে পড়েছে। পূর্বমুখো ঘর বলে দরজার উপরেই রোদ। মোন্নাতের আর একটু সুবিধা এই হল, সে দেখতে পেল ঘরটার সামনে একটা বেশ বড় চেহারার মোষ বাঁধা। বড় সড়কের নীচে ধান কেটে নেয়া খেতে আরও গরু মোষ চরছে বটে, এটা কিন্তু চেহারায় তার থেকে পৃথক।

মোন্নাত বড় সড়ক থেকে নেমে সোজাসুজি তিন্নির ঘরের দরজায় প্রথমে টোকা

তারপরে ধাক্কা দিতে সুরু করল। মরাখাওয়াগুলোর কোনো লজ্জা নাই, এখন দিন তা বোঝে না, ঘুমাতে দেয় না, এরকম সব বলতে বলতে তিন্নি দরজা খুলে মোন্নাতকে দেখে হকচকিয়ে পিছিয়ে গেল। খানিকটা রোদ, খানিকটা কালো, আর মোন্নাত সেই অসম্বৃত, পর্যুষিত ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারল।

'তিন্নি রে, তিন্নি।'

'কাঁয় তিন্নি?'

'ওহো। আচ্ছা। তা তোর ছাওয়া বা কোটে? নাই দেখং, মইরছে বা?'

'তুই কাঁয়? যাবু।'

'ওহো। আচ্ছা। চকোং নাই দেখং।'

'যা। যা। মুই এলাই ঘুমাং।'

'ওহো। আচ্ছা। মদ খাইস দেখং। ওহো। আচ্ছা তো চল্।'

'কোটে কাঁয় যায়।'

মোন্নাত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কথা বলার সুবিধা হবে যেন এইজন্য সে তিন্নির সেই ঘুমন্ত ভৈষী বকনাটার কোমরের উপরে বসল। তিন্নি বলল 'উঠ। যা। ভাগি যা।' সে দরজা বন্ধ করতে গেল। মোন্নাত যেন চলে যাওয়ার জন্যই উঠল। পাকা সড়কটায় পৌঁছে গেল। কিন্তু পথের ধারের একটা গাছের ফুলকুঁড়ি সমেত একটা দু-তিন হাত ডাল লাফ দিয়ে ধরে ভেঙে নিয়ে ফিরে এসে, সেই ভৈষী বকনাটার গলার দড়িটা খুলল। সেটা এইসব কথাবার্তা চেঁচামিচিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে এদিকে ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলে তার গলার কাঠের ঘণ্টাটা বাজল। মোন্নাত সেটার কোমরে কয়েকটা চাপড় দিল—যা, যা। তারপর হাতের সেই ডাল দিয়ে হুড়ড়, ঝ্যা ঝ্যা, বলে বাড়ি দিল সেটার পিছনের পায়ের এপাশে ওপাশে। বকনা ভৈষীটা গদাই লস্কর চালে চলে উঁচু পাকা সড়কে উঠল। আর তখন মোন্নাত সেটার কোমরের এপাশে ওপাশে, দুই পিছন পায়ের মধ্যে সেই ডাল দিয়ে মেরে, লেজ মুলে, তাকে হুড় ড় ড় ড় ঝ্যা ঝ্যা ইত্যাদি বিকট শব্দে তাড়া করলে, ভৈষীটা ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করল। এরকম ব্যবহার সেটা তার এই তিন-চার বছরের জীবনে নিশ্চয় দেখে নি।

যোয়ালে অভ্যস্ত মোষকে তাড়া করলে সেটা তাড়াতাড়ি চলার চেষ্টায় তার অসহায় মাথাটাকে উঁচুতে রেখে ডাইনে বাঁয়ে নড়াতে নড়াতে পিছনের টেনে রাখা ভারটাকে এড়ানোর ভঙ্গিতে চলে। এই এই বকনাটা যার কাঁধে তখন যোয়ালের দাগ পড়ে নি, যার পালান ঝুলে পড়ে নি, যার চেহারা প্রকাণ্ড হলেও থলথলে আলগা হয়ে যায় নি, সেটা সত্যি ছুটতে শুরু করল। তার মাথাটা ছোটার গতিতে এপাশে ওপাশে না

চলে বরং উঁচুতে নিচুতে নাবছে। তার নিশ্চয়ই আশ্চর্য লাগছে! অদ্ভুত লাগছে, ভয় করছে।

হুড় ড় ড় ড় ঝ্যা ঝ্যা ঝ্যা, আঁ-ড় আঁ-ড় আঁ···ড়ড়।

তিম্নির কাণ্ডজ্ঞান ফিরতে দু-তিন মিনিট লেগে গেল। ঘর না ভৈষী সামলাবে, তা ভেবে নিতে আরও দু-তিন মিনিট। সড়কটা সোজা হওয়ায় ছুটন্ত ভৈষী আর তার পিছনে ছুটন্ত মোম্লাতকে সে দেখতে পাচ্ছিল। সে যেন একবার বাতাসে ভেসে আসা 'আঁ···ড়' শব্দটাও শুনতে পেল। 'হায় রে, পাগলাটা খেপি গেইছে রে, মারি ফেলবে বকনাক' বলে সেও তার অসম্বৃত অবস্থাতেই ছুটতে শুরু করল।

কেউ পাঁচ সাত মিনিট আগে ছুটতে শুরু করলে যত লম্বা পায়েই ছোটা যাক তাকে ধরা সহজ হয় না। দুপক্ষই ছুটতে থাকলে কি হত বলা যায় না। সড়কটা বাঁক নিয়েছে তিম্নির ঘর থেকে তিন পোয়া মাইল গিয়ে। সেখানে পৌঁছে মোম্লাত আস্তে চলছিল। ভৈষী বকনাটা দৌড় থামিয়ে রাস্তার ধারে ঘাসের দিকে মুখ নামিয়ে চলছে, ঘাসে মুখ দেবে কি না ভাবতে ভাবতে। এরকম সময়ে মোম্লাত ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে লক্ষ্য করেছিল, আর তখন তার মনে হল দূর থেকে মো-ম্লা-ত এরকম একটা শব্দও ভেসে এল। সে পথের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তিম্নি যখন সেখানে পৌঁছাল, তার চুল উড়ছে, অসম্বৃত শাড়ি উড়ছে, সে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সেই শীতে তার গাল বেয়ে ঘাম, চোখের দৃষ্টিও আচ্ছন্ন যেন। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুঁই মানষি না-হইস। তুঁই ডাকু। তুঁই বন্নয়া। তুঁই ডাকু বন্নয়া।'

'আঃ হব্। বসি পড্লু।'

'মারি ফেলছিস।'

'ওহোঃ। আচ্ছা, আস্তো আস্তো চল।'

'না যাং। এটেই মরি যাং।'

'রস মুই ধরি তোলং তোক। না-হয় ভৈষীর পিঠত চড়ি নে। আস্তো আস্তো চল।'

তিম্নি উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাতে চুল জড়িয়ে খোপা এঁটে বলল, 'আমার ঘর থাকিল, বিছানা থাকিল কাপড়া থাকিল পড়ি।'

'থাইকবে তো।'

'আমার টাকা থাকিল পড়ি।,

'আঃ হবা। থাকি যাউক। আস্তো আস্তো চল।

পথের ধারের ঘাসে মুখ নামিয়ে নামিয়ে ভৈষীটা সেরকম চলছে বলেই তারা পিছন

পিছন চলছে যেন তার। মিনিট দশেক পরে তিন্নি বলল, 'কোটে বা যাং? কাঁয়বা কি কইবে! কি বা পুছ করে!'

'আচ্ছা, তুই ভৈষীত চড়ি নে তো। এলাও হাঁপাইস? এলাও তোর কাপড়ার নিচক বুক ত্বখান থরথর করি কাঁপি উঠে।'

'মোন্নাত।'

'হেই। মোন্নাত কবু না।'

'তো?'

মোন্নাত একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'হইছে। আচ্ছা, কবু তোর মইষাল।'

'মইষাল?'

আরও মিনিট পাঁচেক পরে মোন্নাত বলল, 'তিন্নি, মোর কথা রাখ্। ভৈষীত চড়ি নে। কেন বা থাকি থাকি কাঁপি উঠিস। জার লাগে বা? আচ্ছা ভাল করি কাপড়া জড়ায়া নে।'

তখনই মোষের পিঠে চড়ুক বা না চড়ুক তিন্নি কোমরের নীচের শাড়ির ফেরতা আঁচলটা তুলে গায়ে জড়িয়ে নিল। 'আচ্ছা রে, মোক ওঠে তো জিন্নি, জিন্নং কইছে। এটে এলা কও কি, কাঁউ যেহ্ পুছে।' মোন্নাত ভাবল। তিন্নি, জিন্নি, এসব না বলাই ভাল। শব্দটা হঠাৎ মাথায় আসায় সে হেসে ফেলল।

সে বলল, 'কবু মহিসঁসতী।'

'মইসঁতি?'

মোন্নাতের নিজের গায়ে ত সোয়েটার। সে তিন্নিকে মোষের পিঠে উঠতে রাজি করল। সে তার কম্বলের পুঁটুলি খুলে তার ছেড়াখোঁড়া বাড়তি জামাপ্যান্ট ফাটা কাপড়ওয়ালাদের মত কাঁধে নিয়ে, কম্বলটা জড়িয়ে দিল তিন্নির গায়ে। যদিও তখন শীতের রোদ গায়ে পড়ছে। তাও যদি কম্বলের নীচেও তিন্নির বুক থর থর করে কাঁপে, সে কি করবে? তার চাইতে পরামর্শ দরকার। মোষের পাশে পাশে চলতে চলতে সে এরকম পরামর্শ করল: পথে পথে ঘুরতে গেলে মানুষের সঙ্গে দেখা হবেই। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলা যাবে মইষাল আর মহিষমতী। কিন্তু গন্তব্য জিজ্ঞাসা করলে সব সময়েই বলতে হবে হাটে যাচ্ছে ভৈষীটাকে বিক্রি করতে। যদি এমন হয় যে তারা কোনো হাটের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে হাটে না ঢুকে, তখন বলতে হবে এ হাটে ভৈষীর দাম উঠল না।

এই পরামর্শে আর এক সুবিধা। শীতকালে গাছতলায় রাত কাটানো যায় না। সব হাটেই কিন্তু একটা দুটো দেয়াল-ছাড়া স্থায়ী ছোট চৌচালা থাকে, যা হাটের সময় দোকান হয়, হাটের পরে সন্ধ্যায় আর এক হাট পর্যন্ত খালি থাকে। সে সব চৌচালার

নীচে রাত কাটানো সুবিধা। একদিকে মোষ, অন্যদিকে মোন্নাত, একজনের শিং, অন্য জনের কোদাল, মাঝে তাদের গায়ের ওমে কম্বল চাপা তিন্নি রাতভোর ঘুমাতে পারে।

যদি বা দুপাশে ভোস ভোস উস্‌খুস্‌ শব্দ হয়।

পৌষ, মাঘ গেল, ফাল্গুন এসে গেছে। এখন দুখানা কম্বল না হলেও চলে। একখানা ছিল, আর একখানা কম্বল কিনতে হয়েছে মোন্নাতকে পৌষ শেষ হওয়ার আগেই। না কিনে উপায়? পরে মোন্নাত ভেবে দেখেছে দোষটা হয়ত তারই। সূত্রপাত সেই করেছিলে পালানর প্রথম দিনের বিকেলে। তখন তারা একটা গ্রামের শেষ সীমায়, একটা হাটের কাছে, একটা দল ছাড়া দোকানের কাছাকাছি। দোকানের সামনে একটা চালু টিউবকল দেখে বোধহয় পিপাসা অদম্য তখন। দোকানদার বলেছিল চূড়া আর গুড় আছে। সে বলেছিল হাট কালি লাগবে। তবে হাটে একটা দুটো ছোট চৌরি আছে যার বেড়া দেয়াল না থাকলেও তার তলায় রাত কাটানো যাবে। তা হলে প্রথম হাট ধরা যাবে। দোকানদার সন্ধ্যার আগেই দোকান বন্ধ করে দিল। দোকানের খানিকটা দূরে একটা জলা। বর্ষায় নদী হয় বোধহয়। তারপরে তারা চূড়াগুড় নিয়ে বসেছিল। আর তখন মোন্নাতই তিন্নির সেই চন্দ্রহারটাকে তিন্নির কোমর থেকে খুলে জলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর চূড়াগুড় খেল তারা, জল খেল। যখন ফিরে এসে আগের জায়গাটায় বসতে যাবে আবার হাটের দিকে হাঁটার আগে, তিন্নি ঝপাৎ করে সেই অন্ধকারে কালো জলে নেমে গিয়েছিল। আট দশ মিনিটের ডাকাডাকিতে তিন্নি যখন উঠে এল স্নান করে, তখন? মোন্নাত হায় হায় করে বলেছিল, এই পৌষের শীত, এই রাত করে, বদ্ধ জলে স্নান, এই ভিজে শাড়িতে সারারাত কাটান, কাল সকালে তুই আর থাকবি না। বোঝা উচিত ছিল তোর একটাই শাড়ি সঙ্গে। কি বুদ্ধি, 'ভিজা শাড়ি চিপি নিস।' অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সেই ভিজে শাড়ির উপরে কম্বলটা জড়িয়েছিল তিন্নি। সারারাতে কম্বলের ওমে ভিজে শাড়ি শুকনো শুকনো দেখালেও গায়েও কিন্তু সারারাত জল বসে। সকালের দিকে হাট বসতে না বসতে সে জন্য একটা 'হোলদিয়া' শাড়ি কিনতে হয়েছিল মোন্নাতকে। জামা, ব্লাউস? কি? না—লজ্জা করে। পরের দিন তখন দুপুর। বালি চিক চিক করে এমন নদী দেখে সেই হোলুদ শাড়ি-পরা তিন্নি বলল সে স্নান করবে। স্নান করে গ্রামে ঢুকে চূড়াগুড় আর টিউবকল আছে কিনা দেখবে। আচ্ছা, তা কর। কিছুক্ষণ পরে মোন্নাত দেখেছিল সে হোলুদ ভিজে শাড়ি পরে তিন্নি কূলে উঠেছে। শাড়ি ছাড়, শাড়ি ছাড়। সকাল থেকেই তো সর্দি। কিন্তু কোথায় দ্বিতীয় শাড়ি। যে গোলাপী শাড়ি পরে সে ঘর ছেড়েছিল, হলুদ শাড়িটা কিনে কাল দুপুরে যখন সে ঝোপের আড়ালে গিয়ে হলদিয়া হয়েছিল, তখন

সেই ঝোপেই সেই ঘর ছাড়ার শাড়ি রেখে এসেছে। সেদিন চলতে চলতে আর একটা হাট পেয়ে আরও একখানা 'হোলদিয়া' শাড়ি কিনতে হল মোন্নাতকে স্নানের চোট বাঁচাতে।

কিন্তু মেয়েমানুষকে, তা এক কুড়ি পাঁচ ছয় হক আর তিন কুড়ি দশ হক, কখনও মানুষের জাত বলা যায় না, যেমন নীল আকাশ আর মেঘ এক নয়, যেমন যে প্রজাপতি আর পাতাকে একই মনে হয় সে প্রজাপতি কখনই পাতা নয়, আর বিজ্ঞানও বলে দুটো অ্যাসিডকে যতই অ্যাসিড বল কখনও তারা এক নয়। ছ-সাত দিনের মধ্যে এক গ্রামের হেলথসেণ্টারের বারান্দায় সর্দি-কাশি জ্বরে বেহুঁস তিন্নিকে শুইয়ে রেখে—সেখানে না ওষধ, না ডাক্তার—কম্পাউণ্ডারের কথা মত তার ফর্দ নিয়ে ইনজেকশন আর 'ঔষধ' আনতে সেই তুরুককাটা শহরেরই দিকে ছুটতে ছুটতে এসব মনে হয়েছিল মোন্নাতের। সে কি ম্যারাথনবীর যে যেতে আসতে বিশ মাইল পথ তিন-চার ঘণ্টায় আসবে? সে শাসিয়েছে বটে, যদি ফিরে দেখে মরে গেছে, তা হলে একেবারেই মেরে ফেলবে। কি বিশ্বাস? স্ত্রীলোক বল, মেয়েমানুষ বল, বিশ্বাস নেই। কথা শোনে? কত বার মোন্নাত বলেছে, কাশি হয়েছে স্নান করা কি ভাল? শহরে বাস করে খুব সাবান মাখা শেখাও হয়েছে। বাতিক। কত মযলা তুই, যে প্রত্যেকবার সাবান মাখতে হবে এই পৌষের ঠাণ্ডায—মাথা ঘষতে হবে। নিজের গায়ে জ্বর তা নিজে বোঝা যায় না? আমি কি তোর গা ছুঁই যে বুঝব জ্বর?

কিছু লাভ নেই বকে। মোন্নাতকে সেই হেলথ সেণ্টারে সাত দিন থাকতে হয়েছিল। বাড়তি কম্বল, এমনকি সব সময়ে গায়ে রাখার একটা চাদর, এলুমেনের হাড়ি কাচের গ্লাস, হেলথ সেণ্টারের জল টকটকে লাল বলে, জল আনার, রাখার জন্য এই এত বড় প্লাস্টিকের বোতল এসবই কিনতে হয়েছিল। দুধ বার্লি ফোটাতে হয়, জ্বর ছাড়লে খিচড়ি রেঁধে দিতে হয়। তার একটা দোষ দিতে পার বটে। এক হাটে বেশ হালকা কিন্তু মজবুত, ধারালো, মোটরগাড়ি স্প্রিং-এর ইস্পাতে তৈরি, বড় একটা কাটারী দেখে তা কিনে দিয়েছে তিন্নিকে। কারণ 'বনের বেটি ছাওয়ার কোমরত কাটারী নাই-থাকে তো নাঙ্গা' মনে হয়। আর যদি সেই এক মাথায় প্লাস্টিকের ফুল, পাখি, এসব বসানো সেই লোহার শলাগুলোর কথা ওঠে, তা হলে বলতে হবে হেলথ সেণ্টারে চিকিৎসার জন্য হক, কিংবা সাবান ঘষার জন্য হক, মাথার চুল এত বেড়েছে যে প্রকাণ্ড খোঁপাটা মাঝে মাঝেই ভেঙে পড়ে। তাকে ধরে রাখার জন্য কাঁটা লাগবেই।

কিন্তু ঘর না থাকতেও ঘরোয়ানি কেন তিন্নিদের তা মোন্নাত কেন কেউ বলতে পারে না। হেলথ সেণ্টার থেকে বেরনোর পর সেই 'এলুমেনে'র হাঁড়ি, জলের বোতল, কাচের

গ্রাস ফেলে না এসে, কুড়িয়ে নিয়েছে। আর তারপর এক হাট থেকে দুটো ছোট বস্তা কিনে দুটোরই খোলামুখের এক পাশটা করে সুতলি দিয়ে জুড়ে মোষের পিঠের দুদিকে ঝোলে এমন দু খোপের ব্যাগ তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে এখন সংসার। একদিকে যদি শাড়িগুলো, কম্বল দুটো, গামছায় বাঁধা 'চাল, ডাল, অন্যদিকে তাহলে হাঁড়ি, জলভরা জলের বোতল, মুখ আটকানো তেলের শিশি, নুনের ঠোঙা, গামছায় বাঁধা চুড়াগুড়, মরুচ, চৈ, কাটারীখানা, এমনকি আলু। শুধু মোন্নাতের কোদালখানা, আর এক ছড়া মোষ বাঁধার দড়িই বাইরে, কারণ মইষাল হয়ে চলতে কিছু কাঁধে রাখতে হবে লক্ষণ হিশাবে।

আর মাস কয়েক শহরে বাস করে মুখরাও হয়েছে তিন্নি। যদিও এই তিনমাসে আবার তার রং সবজে-শ্যামল বনের মত, চোখের কোলে কালি নেই বলে সেই বড় বড় বাদামী কালো মণিদুটো কোনো এক পাখির চোখের মত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, মুখরাই। এখন আর সে চুপ করে মন হাতড়ায় না। যখন তখন জল পেলেই স্নান করে না সে এখন। কিন্তু আগের সেই স্নান করা নিয়ে ঠাট্টা করলে সে পালটা কিছু বলে, যেমন চার পাঁচদিন আগে সে বলেছিল, 'তোরই বা কি কম? পাঁচ-সাতদিন বাদ বাদ তোরই বা শহরত যাওয়া লাগে কেনে? যাইস না মোক একা রাখিয়া।' যেমন এই এক দেড়শ একরের এ বনটায় পৌঁছে সে কাল বলে বসল, 'একটা রাতি থাকিবার দে। জীবনের সোয়াদ মিটায়ে নিম্।'

কাল বিকেলে এই ছোট বনটায় তারা পৌঁছেছিল। এটা বনই নয়। নদীতে ভেঙে যাওয়া গ্রাম যা নদী সরে যাওয়াতে বন হয়ে গিয়েছে। কাল তখন রোদ পড়ে যাওয়ায় দূরে নদীর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল না। দক্ষিণের উঁচু বাঁধ, যার উপরে এখন পাকা চওড়া সড়ক, তার এ পারের ঢালু শ্যাওলা সবুজ গা থেকে শুরু করে এই বনটায় উত্তর সীমায় ফাল্গুনে গেরুয়া রংধরা বড় বড় ঘাসের রেখার মধ্যে গত ছ-সাত বছরে তৈরি হয়ে ওঠা এই বন। মরুচমতী নদী এখন এপার থেকে একেবারে ওপারে চলে গেছে যেন মানুষ বাঁধ দেয়ার ঘৃণাতে। গেরুয়া রং ধরা সেই ঘাসের সীমার পরে সে জন্য শাদা চিকচিকে বালি অনেক দূর। তারপরে পড়ন্ত আলোয় নীল জলের রেখা, তারপর ওপারের কালচে সবুজ রং ধরা গাছপালা। কিংবা ওপার থেকেও শুরু করা যায়। সবজে কালো ওপারের গাছপালার কোলে নীল জলের রেখা, তারপরে বাদামী-শাদা চরের বালি, তার এদিকে গেরুয়ার রং ধরছে এমন ঘাসের রেখা, তার এপারে একশ রকমের সবুজ বাঁধের গোড়া পর্যন্ত গিয়ে, শ্যাওলা সবুজ হয়ে বাঁধের গা বেয়ে উঠেছে। কালচে সবুজ, কলাপাতা সবুজ, হরিয়াল সবুজ, টিয়া সবুজ, পান্না সবুজ। ডান হাতের দিকে কয়েকটা শিশু শাল, গোটা দু-এক তেমন শিমুল, একটা ছোট কদম, কিন্তু পর পর

এক সারি সোঁদাল, সব ছাড়িয়ে একটা কলার থোপ। বাঁ-এর দিকে চার-পাঁচটা কদম। সবই শিশু বয়সের। পাঁচ ছ বছরে আর কত বড় হবে? এসবেরই বীজ, পোয়া, ফল, লাঠি নদীই পাহাড় থেকে ভাসিয়ে এনে জমা করে গিয়ে থাকবে। তা হলেও শালের পাতায় একরকম লাল, কলার থোপে সবুজের মধ্যে একটা মোচায় আর একরকম লাল। সামান্য শিমুল ফুল কিন্তু তাও অন্য লাল। আর সোঁদালের ছোট গাছগুলোতে অজস্র সোনা হলুদ ফুল। একটা লাঠি ভেঙে তৈরি হয়েছে বলেই গাছগুলো এত কাছাকাছি। সবুজ, লাল, হলুদ।

একটা শুধু বাদামী-খয়েরির ছোপ। কাল বিকেলে এই বনে পৌঁছে মোল্লাত যখন চর ভেঙে নদী পার হওয়ার ঠিক জায়গাটা খুঁজতে গিয়েছিল, তখন তিন্নি এই বাদামী-খয়েরি ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছে। এই বর্ষায় কিংবা তার আগের বর্ষায় নদী নিশ্চয় এ কূলে ছিল, আর ঘাটিয়ালদের ঘাঁটি ছিল সেটা। মসৃণ শক্তপোক্ত বাখারি মাচার উপরে খুব বড় একটা গরুর গাড়ির ছই যেন। ভিতরে পাটাতনের উপরে মানুষ সোজা হয়ে বসতে পারে। দু-চার জন মানুষ ঘুমাতে পারে। পুরু করে খড় দিয়ে ছাওয়া ছই। বর্ষায় খড় খয়েরি-বাদামী।

সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল যাত্রার। বালির রং শেয়াল রং ধরলেই তিন্নি রওনা হবে। চরটা হেঁটে গিয়ে জল। সেখানে ছোট বাঁশের সাঁকো থাকায় পথ ভুল হবে না। জলটা বড় জোর এক মানুষ আর ত্রিশ চল্লিশ হাত চওড়া। অনায়াসে সন্ধ্যা অন্ধকারে সাঁতরে পার হয়ে, ও পারের বাঁধ ধরে চলতে থাকবে তিন্নি। বাঁধ ফুরালেও নদী ঘেঁষে। রাতে নদীর ধারে কে বা থাকে? আর তখন তিন্নি মোষে চড়ে নেবে। মোষ ঘাসবন দিয়ে রাতেও ঠিক পথ চিনে চলবে। যতক্ষণ না কোনো ছোটখাটো বন পায়। রাত কাটিয়ে আবার নদীর পার ধরে। গ্রাম নয়, গঞ্জ নয়, শহর নয়, এখন সেখানে মানুষ ভোটের উত্তেজনায় কি করে বা বসে? যতক্ষণ না উত্তরে সেই পাহাড়ী বন আসে, যেখানে লম্বা লম্বা ঘাসবনে ঝর্ণার এপারে ওপারে বাইসন। তখন এমনকি যাত্রার আগে তিন্নি একবার তার এলুমেনের হাড়িতে চাল, ডাল, লঙ্কা, নুন, আলু দিয়ে খিচড়ি বানালে, শেষ বারের মত তারা সেই হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে খেয়েও নিয়েছে। যেন নদী এত কাছে কেন রান্না হবে না? তখনই তিনি বলল, সেই এক রাত এই বনে কাটানোর কথা, জীবনের সোয়াদ একবার পাওয়ার কথা। ছই ঘরটা দেখেই তার মনে হয়ে থাকবে।

আর আজ এখনও সে দেরি করছে। আজ সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত দেরি করাও যাবে না। এখনই রওনা হতে হবে, এখনই। মোষটার পিঠে সেই দু খোপের বস্তা উঠেছে। সেটা ঘাস খাচ্ছে। সোনালি হলুদ সোঁদালের সারির কাছে তারা পাশাপাশি বসে।

পান্না সবুজ ঘাস ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে চারদিকে। তিন্নির সবুজ শরীরে হলুদ শাড়ি। কি করে যাবে তিন্নি, কালই সব বলা হয়েছে। তিন্নি উঠে দাঁড়ালেই হয়। কিন্তু উঠতেই যেন পারছে না। দেরি করা যায় না। ভোটের সময় এখন। কি বা হয়! তা ছাড়া চাপা চিৎকারটা এখন স্পষ্ট। মোন্নাত কিছুক্ষণ আগেই বাঁধের সড়কে উঠে লুকিয়ে দেখে এসেছে ভোটের মানুষরাই আসছে। সামনে মোটরবাইক। তার পিছনে গায়ে গায়ে লাগা জনতা। তাদের আগে ঢোল, পোঁ পোঁ করে সানাইবাঁশি। মোটা মোটা বাঁশের মাথায় ছোট ছোট ফেস্টুন। চিৎকারে সেই লাঠিগুলো কালো বল্লমগুলো, কালো কালো রামদা-গুলো, সাপের জিভের মত, ফলার মত উঠছে নামছে। সবার পিছনে পুলিশের জিপে পুলিশ। আর দেরি নয়। তার সেই টাকা রাখার প্লাস্টিকের চ্যাপ্টা বাক্সটাকে গামছায় বেঁধে গামছাটা নিজের হাতে তিন্নির কোমরে বেঁধে দিয়ে মোন্নাত বলল, 'উঠ উঠ। শুধু এই একনা ভাব। তোর এই বকনার চারি বছর হয়্যা যায়। দিন চলি যায়। উটাক বিয়াও দিবি তো।'

'তুঁই কেনে যাবু না?'

এই একই কথা সেই কতবার হল।

মোন্নাত উঠল। সবচাইতে কাছের সোঁদাল গাছটা থেকে এক থোকা সোঁদাল ফুল পেড়ে এনে তিন্নির পাশে বসল। তিন্নির খোপায় সে ফুল পরাতে গেলে, তিন্নি মাথা সরিয়ে নিল। 'না। পরাবু না।'

কাল রাতের সেই অভিমানই। আমি যদি বনে যাই, গাঁ, শহর যদি বাসের অযোগ্য হয়, তবে মোন্নাত কেন তার সঙ্গে যাবে না। আসলে 'মুই তোর কাঁউএ না। শহরটা তোর সব। উমরাই তোর মহিস্থ্যতি।'

'না। পরাবু না ফুল। তোর চোখ্ অমন কেনে?'

'কেমন?'

'বুনা আঁড়িয়ার চোখু হইছে।'

মোন্নাত হেসে বলল, 'হইবে তো। তোক বউ মানছি কি না-মানছি ক।'

'না হয়। সে চোখ্ না-হয়। বকনাটার বাপ আসছে বন থাকি। শিঙের গুঁতায় সব ভাঙিচুরি তছনছ করছে, তেমন কেনে তোর চোখ। মোন্নাত, মোর বুক ছুঁয়্যা ক। তুই শহরৎ কেন যাবু? কি করবু বা সেটে!' 'এই না কইলং। নে। হইল্। এলাও দেরি আছে রে। নাই-করং এলা কিছু। কিছু কাম থাকি গেইছে শহরৎ।' তিন্নি কেঁদে ফেলল।' সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'মোন্নাত। এক রাত্তিত জীবনের সোয়াদ মিটে?'

ফুলের গুচ্ছটাকে খোপায় পরিয়ে দিল মোন্নাত। হাত ধরে টেনে তুলল তিম্নিকে। বলল, 'এই না মোর মহিস্‌মাতি। যাও। এলা যাও। দেখ গোলমাল বাড়ি গেইছে।'

তিম্নি আঁচলে চোখ মুছে রওনা হল। একবার ফিরেও দাঁড়াল। বলল, 'কাম হয়্যা গেইলে আসবু তো?'

মোন্নতা সোঁদাল গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাল।

কিন্তু তখন দক্ষিণের সেই সাঁধের উপরে পাকা সড়কটায় গোলমাল খুব বেড়ে উঠেছে। সেই শোভাযাত্রা জুলুশ সোজা আসছিল না। পাকা সড়কে চলতে গ্রাম পেলে, গ্রামের পথে ঢুকে গ্রামটাকে পাক দিয়ে আসছে। সে জন্যই জুলুশটা তিম্নির সেই রঙীন বনটাকে তখনও পার হয়ে যায় নি। দেরি করছে বলেই অগ্রবর্তী মোটরবাইক দুটোয় খোকনেন্দ্র দাস ও তার সঙ্গী অনেকটা এগিয়ে পড়ায়, বনটার কাছাকাছি সড়কের উপরে মোটর বাইক থেকে নেমে সিগ্রেট ধরিয়ে আলাপ করছে।' খোকনেন্দ্রর পিঠে টেলিস্কোপিক রাইফেল। সেটাই আলাপের বিষয় হয়েছে। তাদের আলাপে বোঝা যাচ্ছে, স্টেন ইত্যাদিতে তারা অভ্যস্ত হলেও, টেলিস্কোপিক রাইফেল তাদের কাছেও নতুন বিষয়। খোকনেন্দ্র নিজেও তা কখনও ব্যবহার করে নি, খোকনেন্দ্রর সঙ্গী ত সেটাকে হাতে নিয়েও দেখে নি। তাতে কিছু এসে যায় না। স্টেটেন ত এখন গা সওয়া। তোমার কাছে টেলিস্কোপিক আছে এটা গোপন না করে, প্রকাশ্যেই সকলকে জানান উচিত। কারণ ভয় ধরানোই ত উদ্দেশ্য। অবশ্য খোকনেন্দ্র ভিউফাইণ্ডার অ্যাডজাস্ট করতে সেপটিক্যাচ তুলতে, শূন্যে ফায়ার করতে জানে। তার বন্ধু ত হাতে করেও দেখে নি। এখানে দূর থেকে মারা যাবে, তেমন মানুষ কোথায়? সবই ত হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড। কাজেই তার সঙ্গীকে রাইফেলটা হাতে দিতে, ভিউফাইণ্ডারের ক্রশওয়্যারে কি করে লক্ষ্য ধরা যায় তা দেখতে দিতে খোকনেন্দ্রর উৎসাহ দেখা দিল। সে রকম দেখতে গিয়ে খোকনেন্দ্রর সঙ্গী বলে উঠল, আরে দেখ। হলুদ সোঁদালের নীচে নীল সোয়েটার পরা একটা মানুষকে হাতের কাছে যেন এমন দেখা যাচ্ছে। গুলি ভরা নেই ত। আরে সেই পাগলাটা নাকি। খোকনেন্দ্র রাইফেলটা নিয়ে চোখ লাগিয়ে বলল, সত্যি ত। আশ্চর্য। দুজনেই বদলা বদলি করে বার দুয়েক দেখল। খোকনেন্দ্রর সঙ্গী বলল, বা এরকম স্পষ্ট মানুষ দেখা গেলে কি ফায়ার করা যায়? খোকনেন্দ্র ভেবে ভেবে বলল, দেখলে হয় এখন একবার ট্রাই করে। এখানে টার্গেট পাওয়া কঠিন।

'কিন্তু মানুষ ত!' দূর দূর।

'দূর। একটা পাগলা। গেলেই বা কি। তুই ওয়ান টু থি বলবি। আচ্ছা আগে আমি ট্রাই নিই। পরে তুই।'

যোয়াভ দেখতে পাচ্ছিল বালুর শাদা রঙ আর নদীর নীল যেখানে মিশেছে সে রেখাটাকে আড়াল করে কালো খোঁপাটা, সবজে কালো মেয়েটা আর তার পরনের সোঁদাল শাড়িটা নড়ছে যেন। এখন খোঁপার সোঁদাল, শাড়ির সোঁদাল আলাদা করা যাচ্ছে না। আর একটু ভাল করে দেখতে সে উঠে দাঁড়াল। তখনই—

কিছু টের পাওয়ার আগেই সে কয়েকগজ ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল। সে যেন তিন্নিকে দেখতেই শেষবারের মত মাটি থেকে ঘাস থেকে মাথাটা তুলতে গেল। দু নাক দিয়ে, হা হয়ে যাওয়া মুখের দু কশ দিয়ে তাজা অজস্র রক্ত গড়াচ্ছে। সে কি শেষবারের মত বাতাস গিলবে? অথবা কিছু বলে যেতে চায়? তখন কি ভাষার কিছু ঠিক থাকে? সারাজীবনের সব কিছু একসঙ্গে জমাট বাঁধে। মনে হতে পারে, মুখ খোলা বন্ধ করা দেখে সে তিন্নিকে কিছু বলছে বা। সে তখন বাংলায় মহিসমোতি কিংবা ইংরেজিতে মাই ওয়াইফ বলল বা।

॥ সমাপ্ত ॥